বারোদুয়ারীর ভিতর ও বাহির, গৌড়

ফটো : লেখক ও
ডঃ শীতাংশু মিত্র

কদম রসুল ও লুকোচুরি গেট, গৌড়　　　　ফটো : লেখক

পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ; (নিচে) মসজিদের ভিতরের দৃশ্য

ফটো ঃ লেখক

গৌড় পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ ঃ কলিকাতা-১২

RAMYANI BEEKSHYA :
GAUR PARVA

A Bengali Travelogue

Subodh Kumar Chakravarti.

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী : সুধীর মৈত্র
প্রচ্ছদ-পট মুদ্রণ : লিওনার্ড কার্ডবোর্ড

মুদ্রাকর :
শ্রীপশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ২

বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে,
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

—রবীন্দ্রনাথ।

এই লেখকের লেখা

কয়েকখানি উপন্যাস

রূপম্? মণিপদ্ম তুঙ্গভদ্রা আয় চাঁদ আরও আলো
মৌন মন তারার আলোর প্রদীপখানি
একজন লামা ও মানস সরোবর

রম্যাণি বীক্ষ্য

দক্ষিণ ভারত পর্ব

শাশ্বত ভারত

১. দেবতার কথা ২. ঋষির কথা ৩ অসুরের কথা
৪. উপদেবতার কথা

রম্যাণি বীক্ষ্য

১. দ্রাবিড় পর্ব ২. কালিন্দী পর্ব ৩. রাজস্থান পর্ব
৪. সৌরাষ্ট্র পর্ব ৫. মহারাষ্ট্র পর্ব ৬. উৎকল পর্ব
৭. মগধ পর্ব ৮. কোশল পর্ব ৯. হিমাচল পর্ব
১০. কাশ্মীর পর্ব ১১. কামরূপ পব

ভ্রমণকাহিনীব সংকলন গ্রন্থ

১. শতবর্ষের পথযাত্রা ২. শতাব্দীর অভিযান

ছোটদের জন্য লেখা

আমাদের দেশ

১. উড়িষ্যা ২. অন্ধ্র ৩. মহিসুর
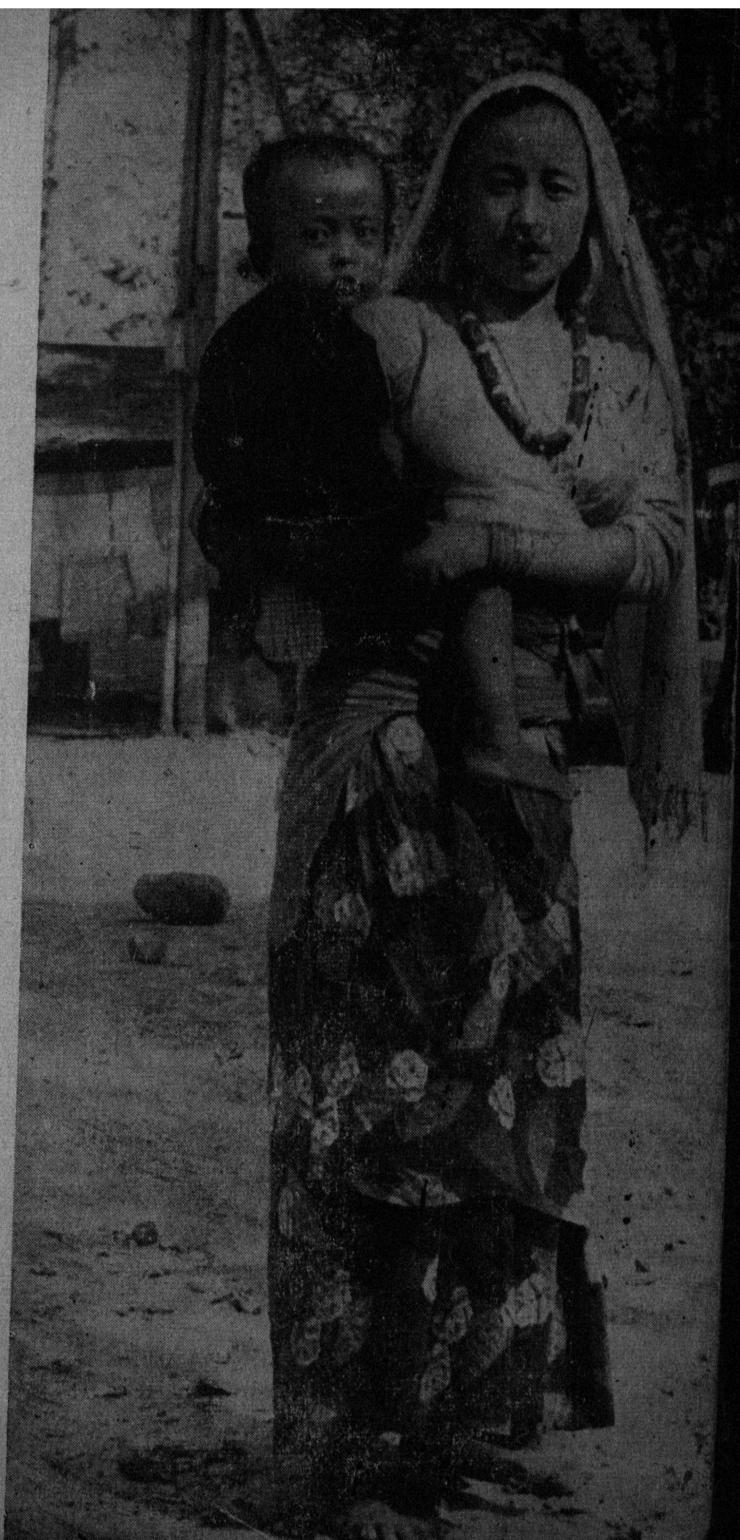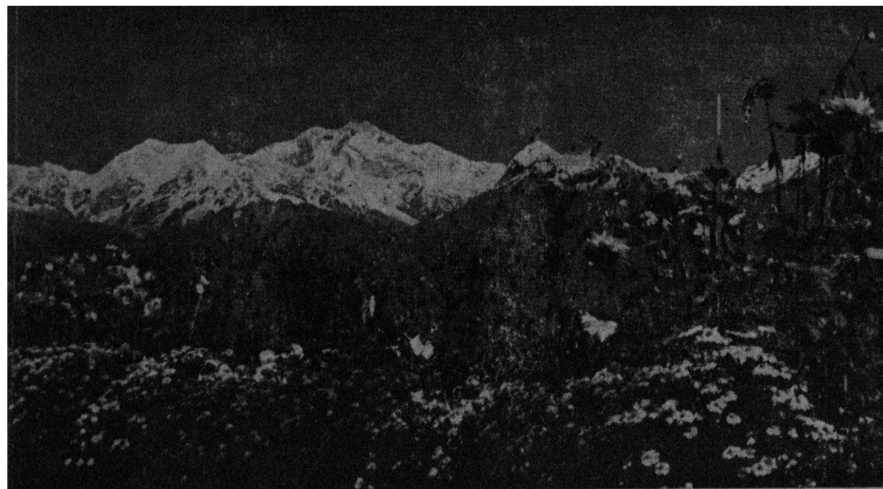
উপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিচে রাজভবন, দার্জিলিঙ
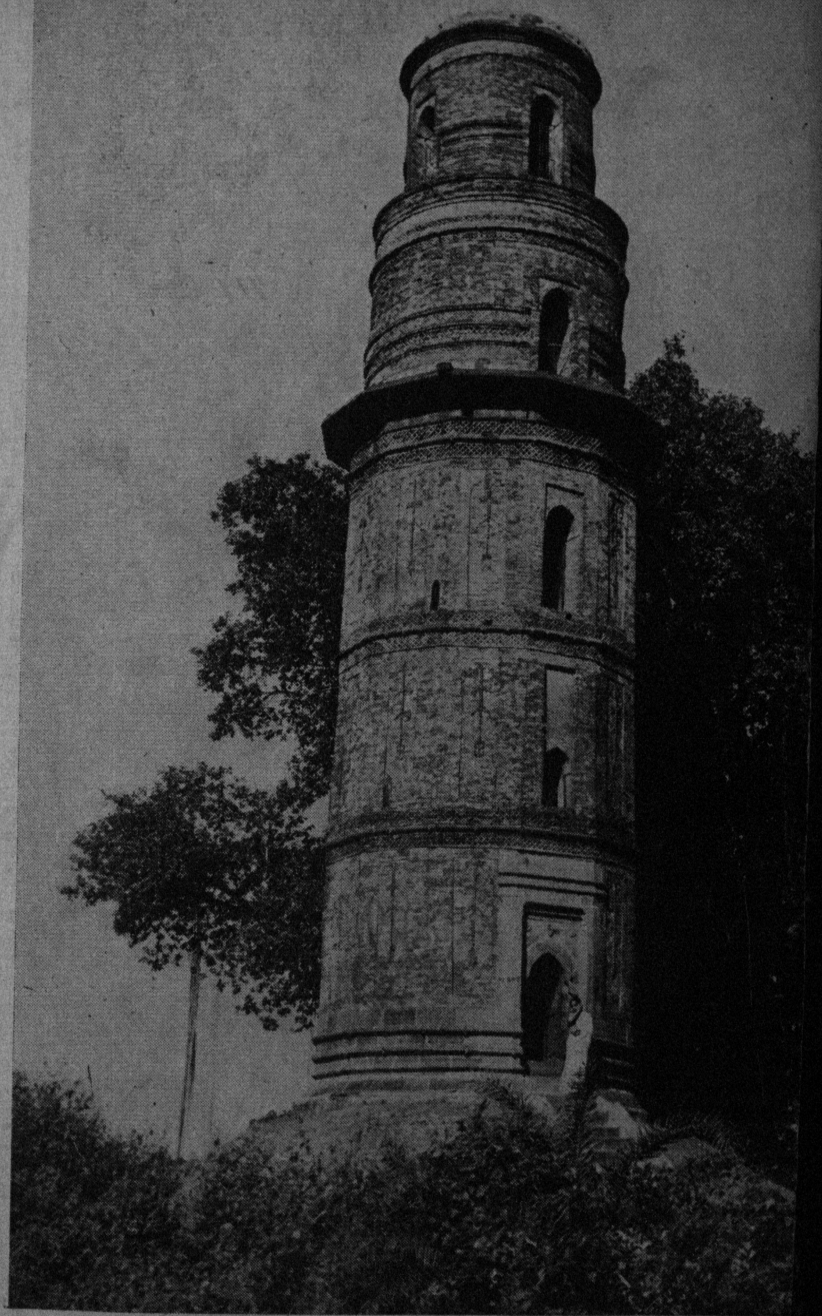
ফটো ঃ ডঃ শীতাংশু মি

ফিরোজ মিনার, গৌড় ফটোঃ লেখক
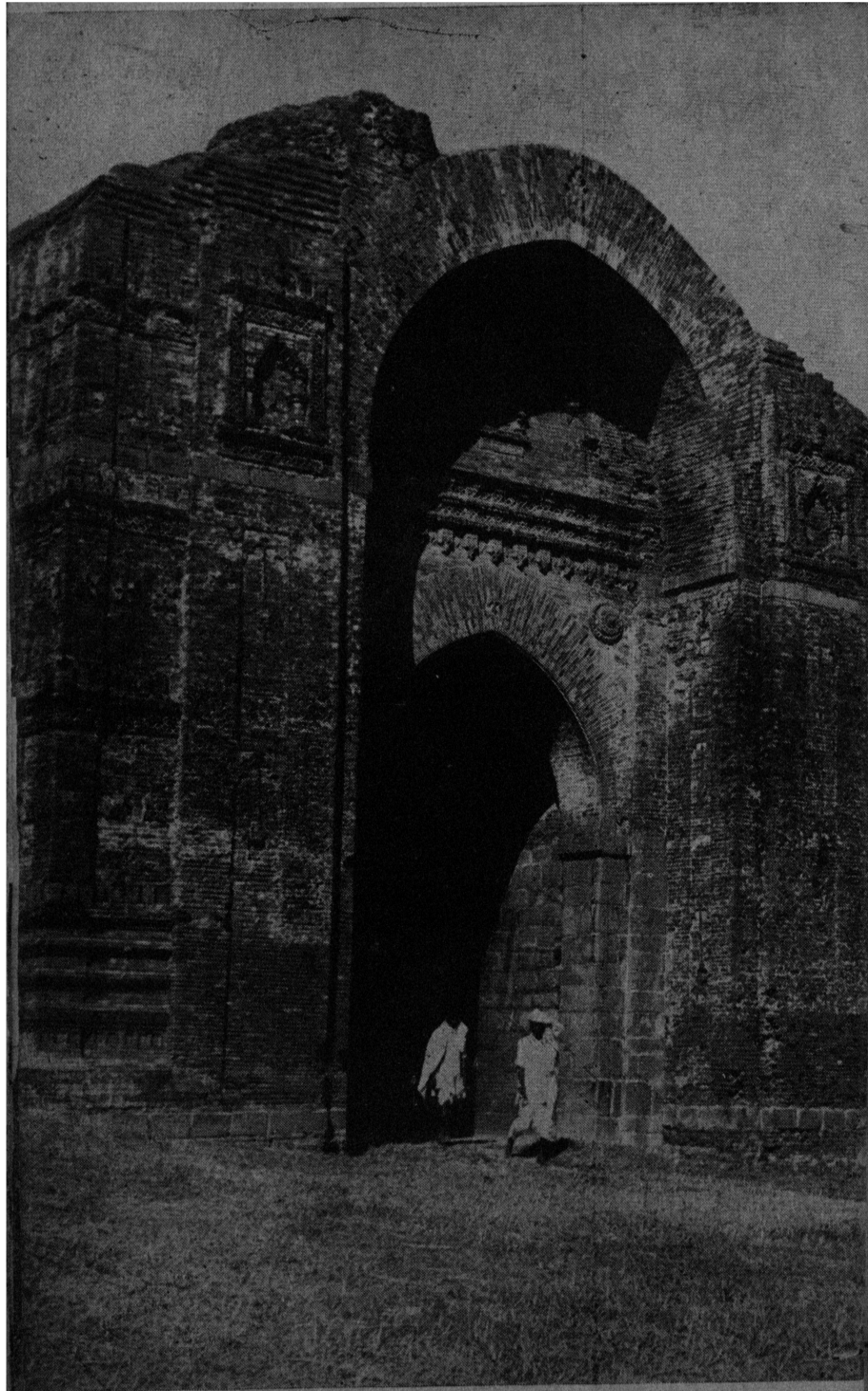
দাখিল দরওয়াজা, গৌড় ফটো : লেখক

ফটো: লেখক

টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও পরে

ফটো: ডঃ শীতাংশু মিত্র

গ্যাংটকের পথে

কালিম্পঙ হো
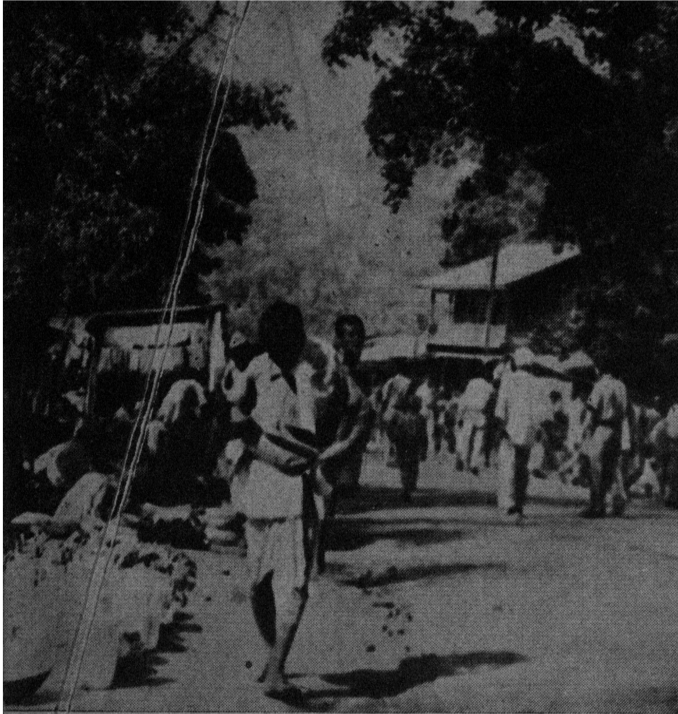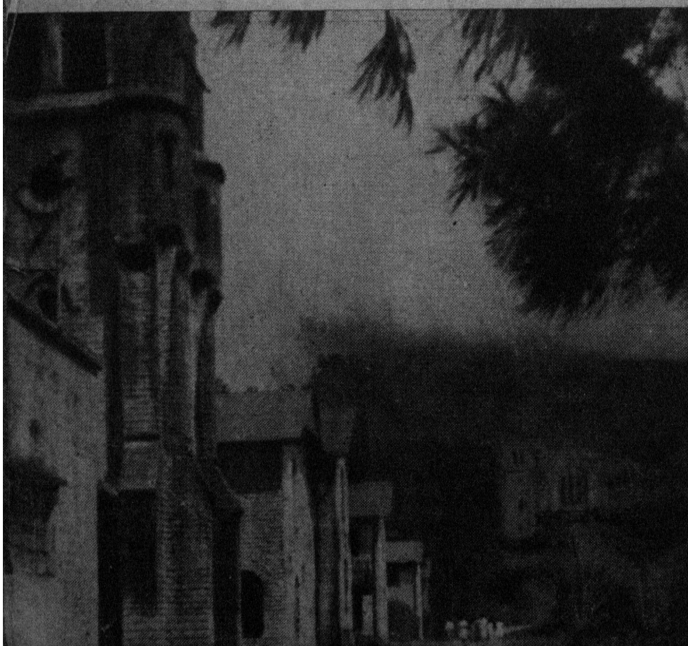
ফটো : লেখ

বৈরাগী দীঘির তীরে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, কুচবিহার ফটো : লেখক

(উপরে) কুচবিহারের সাগরদীঘি ; (নিচে) তোর্ষায় সূর্যাস্ত
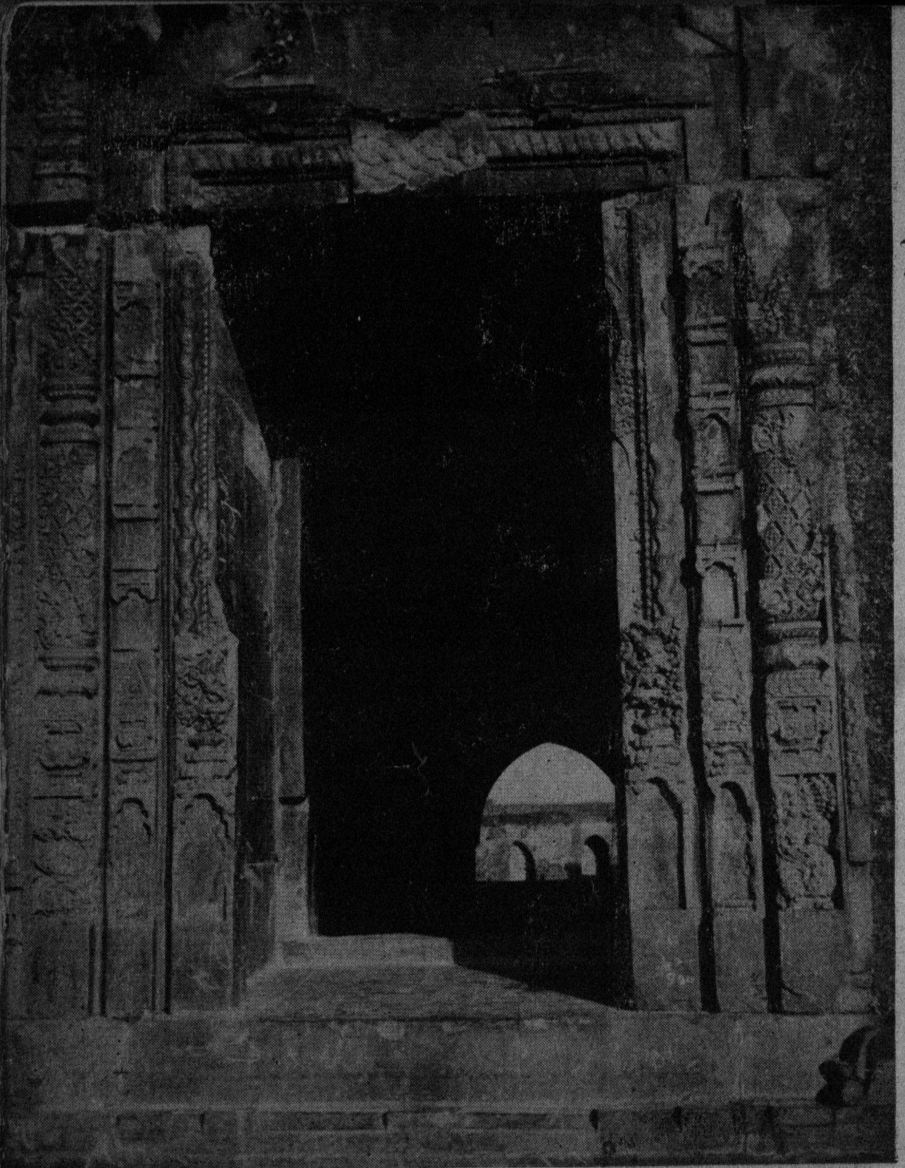
ফটো : লেখ

আদিনা মসজিদের দরজায় হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন

ফটো : লেখক

১

বিকেল বেলায় ডাক্তার আমাকে আর একবার পরীক্ষা করলেন, বললেন ঃ কেমন বোধ হচ্ছে এখন ?

আমি সংক্ষেপে বললুম ঃ ভাল।

ডাক্তার বললেন ঃ মিথ্যে আমরা ভয় পেয়েছিলুম।

কিসের ভয় !

কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন হাসপাতালে এসেছিলেন তখনও আপনি অজ্ঞান ছিলেন, আর মাথায় ছিল একটা ক্ষত। তারপরে যখন দুএকটা এলোমেলো কথা কইলেন, তখনই আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। মাথার আঘাত মাঝে মাঝে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

এবারে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এখন কী রকম দেখছেন ?

ডাক্তার হেসে বললেন ঃ ভয়ের কিছু থাকলে কি আর ভয়ের কথা বলতুম ! আপনি নিজেও একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন !

আমি বললুম ঃ বুকের কাছে এখনও একটা ব্যথা বোধ হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন ঃ কাল আপনাদের ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়েছে, তিন জনেরই ছবি নেওয়া হবে।

বলে অন্য রোগীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ছে। কালিম্পঙ শহরে আমাদের ফার্মের নূতন শাখা উদ্বোধনের পর আমরা একখানা ল্যাণ্ড-রোভারে দার্জিলিঙ আসছিলুম। জীপের মতো এই গাড়িগুলিই আজকাল ট্যাক্সির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামনে দুজন ও পিছনে চারজন যাত্রী অনায়াসে বসতে পারে। গাড়ির পিছনের দিকটা

বাড়িয়ে অতিরিক্ত মালপত্রও নেওয়া যায়। সকালেই আমাদের কাজ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা যাত্রা করেছিলুম বিকেলের চা খেয়ে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের বড়সাহেব মিস্টার ইনিস বসে ছিলেন সামনে ড্রাইভারের পাশে। সামনে আর একজনের বসবার জায়গা ছিল, কিন্তু তাঁকে স্বচ্ছন্দে বসবার সুযোগ দেবার জন্য আমি পিছনে বসেছিলুম। মিস্টার জয়সুখলাল আমার সহকর্মী, তাঁর উপরে পশ্চিমবঙ্গের শাখাগুলি তত্ত্বাবধানের ভার। তিনি আমার সামনে মুখোমুখি বসেছিলেন। দার্জিলিঙের শাখা অফিসটি পরিদর্শনের জন্য আমাদের সেখানে একদিন থাকার কথা ছিল। বড়সাহেবকে আপ্যায়িত করবার জন্য মিস্টার লালই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাকেও তিনি জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে যা হয়, ঘুম-এ সেই দুর্ঘটনা ঘটল।

কালিম্পঙ পাহাড় থেকে নেমে আমরা তিস্তা নদীর পুল পেরিয়েছিলুম অন্ধকার হবার আগেই। তারপর দার্জিলিঙ পাহাড়ে উঠবার সময় ধীরে ধীরে অন্ধকার নামল। পেশক রোড ধরে আমরা ধীরে ধীরে উঠছিলুম। ঘুমের কাছাকাছি পৌঁছে চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পথের সামনে কিছু দেখা যায় না, পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে সাদা চুনের চিহ্ন দেখে আমরা উঠতে লাগলুম। বাহিরে তাকালেই ভয় করে, অথচ আমাদের পাহাড়ী ড্রাইভার নির্ভীক চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছিল।

মিস্টার ইনিসও যে ভয় পেয়েছিলেন তা বুঝতে পারলুম তাঁর কথা শুনে। ড্রাইভারকে তিনি ধীরে ধীরে চলবার নির্দেশ দিলেন। ড্রাইভারের উত্তরও আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। সে বলেছিল, এ আমাদের কাছে চৌরঙ্গীর মতো রাস্তা।

পরের মুহূর্তেই ঘটেছিল দুর্ঘটনা। পাহাড়ের একটা বাঁকে সাড়াশব্দ না দিয়ে উল্টোদিক থেকে আর একখানা গাড়ি ঘাড়ে এসে পড়েছিল। আমরা পাহাড়ের দিকে ছিলুম, আত্মরক্ষার জন্য তাই

পাহাড়ের সঙ্গেই ধাক্কা খেতে হল। তারপরে কী হল তা আর বুঝতে পারলুম না।

সকাল বেলায় দার্জিলিঙের এই হাসপাতালে চোখ খুলেছি। মাথায় আমার চোট লেগেছিল, আর ব্যথা করছিল বুকের উপর দিকটায়। মিস্টার ইনিসের কব্জিতে আঘাত লেগেছে, আর মিস্টার লাল পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। শুনে আশ্চর্য হয়েছি যে আমাদের ড্রাইভারের কোন আঘাত লাগে নি। তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু ইঞ্জিন বেগড়ায় নি। অন্য গাড়িটাও খাদের ভিতর গড়িয়ে পড়ে নি, নির্বিঘ্নে পালিয়ে গেছে। আমাদের এই হাসপাতালে এনেছে আমাদেরই ড্রাইভার। মিস্টার ইনিসের আদেশেই সে আমাদের এখানে এনেছে।

দার্জিলিঙে এখন বেশ শীত পড়েছে। দুখানা কম্বল চাপা দিয়েও শীত যাচ্ছে না। অথচ বাহিরে সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি। যতক্ষণ এই আলো পৃথিবীতে থাকে ততক্ষণ মনে কোন ভয় থাকে না, এই আলো নিবলেই অন্ধকারের সঙ্গে ভয়ও ঘনিয়ে আসে। ঘরের ভিতরের আলো বাহিরের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, আই বাহিরের ভয় এসে ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। বুক ভরে সাহস সঞ্চয়ের জন্য আমি রূপোলি রোদের দিকে চোখ মেলে তাকালুম।

মনোরঞ্জনের কথা আমার মনে পড়ল। কলকাতা ছাড়বার আগে সে আমার হাত দেখেছিল। বলেছিল যে আমার ভালো সময় আসছে, আর একটা কথা বলতে গিয়েও বলে নি। সে কি এই দুর্ঘটনার কথা! সে কি আমার হাতে এই দুর্ঘটনার আভাস দেখেছিল! মনে যখন বল থাকে তখন আমি এই সব দুর্ঘটনার কথা মানি নে। মন দুর্বল হলেই ভক্তি আসে সব কিছুতে। সকলের আগে মার কথা মনে পড়ে, তারপরে দেবতার কথা। বিপদের সময় আমরা শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি একটা

অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করি। দুর্বল মানুষের আঙুল আংটিতে যায় ভরে।

একা একা আমার আরও একটি ভাব মনে এল। মানুষের দুঃখের কথা আমি ভাবতে লাগলুম। না-পাওয়ারও একটা দুঃখ আছে, কিন্তু সেই দুঃখ মানুষকে তার মহৎ হবার চেষ্টা থেকে বিরত করতে পাবে না। সমস্ত দর্শনের মূলেও একটা গভীর দুঃখবোধ। কিসের দুঃখ, কেন দুঃখ, দুঃখের কি নিবৃত্তি নেই! জীবনে একটা গতি এসেছে মনে করে এই দুঃখের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। জীবনযাত্রায় সাফল্য তো মানুষকে বড় করে না, ভোগের অধিকাবে নেই মহত্ত্বের সূচনা। মানুষকে মানুষ করে দুঃখ, মহত্ত্ব আছে ত্যাগে, প্রেমে আছে জয়ের শক্তি। মানুষকে বড় হতে হলে শুধু নিজেব দুঃখ নয়, অপরের দুঃখও নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে হবে, ত্যাগে ও প্রেমে জীবনকে করতে হবে ফুলের মতো পবিত্র।

জানালার সার্সিগুলোয় উজ্জ্বল আলো আর ঝলমল করছে না, আর একটু পরেই বাহিরের পৃথিবী আমার চোখের উপব থেকে মুছে যাবে। অন্ধকার নামবে, আর তারই সঙ্গে আসবে একটা বিষণ্ণ ভয়, নিঃসঙ্গ জীবনের মতো বেদনায় নিবিড়। এ তো দুঃখ নয়, এ কিছু না-পাওয়ার যন্ত্রণা। আমি একখানা হাত আমার বুকেব উপরে রাখলুম। না, এ যন্ত্রণা বুঝি আমার বুকের ভিতরের নয়, বুকের উপরটাই ব্যথা করছে, একেবারে গলার কাছটায়। এই যন্ত্রণার জন্যেই বোধহয় মানুষের যন্ত্রণার কথা মনে আসছে।

সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তার আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, উজ্জ্বলমুখে বললেন : কাল বোধহয় তিনি এসে পৌঁছবেন।

আমি মুখ তুলে বললুম : কে?

স্বাতি দেবী।

স্বাতি !

আমি চমকে উঠেছিলুম, বিস্ময়ের আমার আর অন্ত রইল না।

ডাক্তার বললেন ঃ দিল্লী থেকে টেলিফোন করেছিলেন, কেমন আছেন জানতে চাইলেন, তারপর বললেন যে প্রথম প্লেনেই তিনি রওনা হচ্ছেন।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে জট পাকিয়ে উঠল। স্বাতি আমার কথা জানল কী করে, কে খবর দিল তাকে, সে কি একা আসছে, না মামা মামীও সঙ্গে আসছেন! কিন্তু মামা আসবেন কী করে, তিনি তো সুস্থ নন, প্লেনে তিনি আসবেন কেমন করে! আব তিনি না এলে মামীমাই বা তাঁকে ফেলে কেমন করে আসবেন! তবে কি স্বাতি একা আসছে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার ভয় পেলেন, বললেন ঃ আপনার কি কোন যন্ত্রণা হচ্ছে?

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না, কোনমতে প্রশ্ন করলুম ঃ স্বাতি আমার খবর কী করে পেল?

ডাক্তার বললেন ঃ আমরাই খবর দিয়েছি। আপনার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে মিস্টার ইনিস আমাদের তার করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বললেন ঃ আপনার পকেটে দুখানা চিঠি ছিল, একখানা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া, আর একখানা চিঠি তাঁকে লেখা, আপনি বোধহয় পোস্ট করবার জন্যে পকেটে রেখেছিলেন।

এই চিঠি দুখানার কথা আমার মনে পড়ে গেল। গৌহাটি ছাড়বার ঠিক আগে আমি স্বাতির একখানা চিঠি পেয়েছিলুম, আর তখনি তার উত্তরটাও লিখেছিলুম। কিন্তু সে চিঠি কি আমি ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম! কিন্তু এমন ভুল তো আমার হয় না। অভিভূতের মতো আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালুম।

ডাক্তার বললেন ঃ ভালই হল, আমাদের আর ভাবনা রইল না।

বলে নিজের কাজে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারের সঙ্গে মিস্টার ইনিস এলেন আমাকে দেখতে। কুশল জিজ্ঞাসার পরে বললেন ঃ শি ইজ কামিং টুমরো।

আমি বললুম ঃ তাইতো শুনলুম।

শি ইজ ইওর—

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম ঃ শি ইজ মাই—

কথাটা আমি শেষ করতে পারলুম না, ভেবে পেলুম না কী বলব। তার আগেই সাহেব বললেন ঃ বুঝেছি।

মুখে তাঁর সরল প্রসন্ন হাসি। ডাক্তারও হাসছেন।

আমি আরও লজ্জা পেলুম।

২

সত্যিই এ এক কঠিন সমস্যা। লোকের কাছে স্বাতির আমি কী পরিচয় দেব জানি নে। বোন বলাই নিরাপদ ছিল। সাহেব সহজে বিশ্বাস করতেন, আর ডাক্তারও নিতেন মেনে। কিন্তু মিথ্যা যে মুখে আটকে গেল, অবলীলায় তা বলতে পারলুম না। সাহেব যে ভুল বোঝেন নি, তাঁর হাসি দেখে আমি তা সন্দেহ করেছি। ডাক্তারও মনে মনে একটা সম্পর্কের কথা ভেবে নিয়েছেন।

স্বাতিব সব কথা আমার মনে একসঙ্গে ভিড় করে এল। তাকে প্রথম দেখবার দিন থেকে তাকে ছেড়ে আসবার দিন পর্যন্ত যত আনন্দ ও বেদনার কথা, যত মধুব-যন্ত্রণার কথা। তাকে কাছে পেয়েও যেন পাই নি, তাকে ফেলে এসেও যেন হারাই নি। কাছে গেলে সে দূরে সরে গেছে, আর দূরে এসে তাকে কাছে পেয়েছি। এই স্বাতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, অথচ সে আমার সমস্ত চেতনাকে জুড়ে আছে।

স্বাতিকে আমি প্রথম দেখেছিলুম কিঞ্চিদধিক দু'বছর আগে। তারা দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিল। মামা, মামী ও স্বাতি। আমার সঙ্গে দেখা হল হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। আমি ফিরছিলুম উত্তরপাড়ায়। জানি না কী যোগাযোগ হল, সেই থেকে এই পরিবারের সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখলুম।

প্রথম পরিচয়ের দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভিড়ের ভিতর মামা আমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন, গোপাল কোথায় যাচ্ছ? বছর কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যখন দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে, তিনি আমাকে চিনতে

পারেন নি। না পারবারই কথা। মাকেই ভাল করে চিনতেন না। নিজের বোনকেই লোকে আজকাল ভুলে যাচ্ছে তো পাতানো বোন! মামার মুখেই আমি শুনেছিলুম যে আমার মা তাঁর পাতানো বোন। দুজনের মা পুরনো প্রথায় সখী সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন।

মামা সেদিন বিপদে পড়েছিলেন। যে চাকর তাঁদের সঙ্গে যাবে সে গিয়েছিল হারিয়ে। মামা ভয় পাচ্ছিলেন একা যেতে, অথচ গাড়ি থেকে নামতেও মামী রাজী হচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না গোপাল?

থই পেয়ে মামা আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন, তুমি রাজী হয়ে যাও বাবা, তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সেদিন মামাকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। জানালার ভিতব মামীর চোখদুটো দেখেছিলুম ছলছল করছে বেদনায়, আর দরজায় দাঁড়িয়ে স্বাতি আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল উজ্জ্বল চোখে। ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই আমি চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়েছিলুম।

তারপরে মামী ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন। বললেন: তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল?

মামীর ইঙ্গিত আমি বুঝতে পেরেছিলুম। যাত্রার প্রারম্ভেই তিনি আমাদের পবিত্র সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আর মামা আড়ালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথাও আমার কানে এসেছিল। তিনি তাঁদের বলেছিলেন, বেশি লাই দিয়ো না এদের। খরচা করে নিয়ে যাচ্ছি সেই যথেষ্ট।

কিন্তু স্বাতি আমার দারিদ্র্যকে অসম্মান করে নি কোনদিন। কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় সে আমার পাশে এসে বসেছিল। একটার পর একটা ঢেউ এসে পায়ের উপরে আছড়ে পড়ছিল, আর সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল বিরামহীন বৈচিত্র্যহীন। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে নক্ষত্রের নৃত্যসভা বসেছিল, আর ঝড়ের মতো দুরন্ত

বাতাসে বেশবাস বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। এত জল, এত আলো, এমন অসীম আকাশ আর উদার পরিবেশেও স্বাতি আমার কথা ভুলতে পারে নি, বলেছিল, একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে, দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট কোরো না।

স্বাতির এই অনুরোধের কথা আমি আজও ভুলি নি, ভুলতে পারব না কোন দিন। সে আমার আত্মসম্মানকে শ্রদ্ধা করেছে, আর আমি শ্রদ্ধা করেছি তার সহানুভূতিকে। জীবনে এই আদর্শের বিনিময় তো সবচেয়ে বড় পাওয়া, তবে কেন না-পাওয়ার দুঃখ মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়!

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম এলো না। বুকের যন্ত্রণায় নয়, বোধহয় একটা তীব্র তৃপ্তির আনন্দে। কাল স্বাতি আমার কাছে আসছে। দিল্লী থেকে দার্জিলিঙ। নিশ্চয়ই সে একা আসছে। এ যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ, আমি কি তা বুঝি না! যেদিন রাতে সে কন্যাকুমারীর ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে একা এসেছিল আমার কাছে, সেদিনই আমি তাকে বলেছিলুম, একা বেরিয়ে এসেছ তুমি! অনুমতি পেয়েছ তো?

স্বাতি হেসে বলেছিল, অনুমতি! না পেয়ে আদেশ অমান্য করার চেয়ে না চাওয়াই তো ভাল। নিজের কর্তব্য যেখানে স্থির করতে পারি নে, সেইখানেই অনুমতির দরকার।

আজও কি সে অনুমতি না নিয়ে আসছে! বোধহয় না। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই না। এত দূরের পথে স্বাতি নিশ্চয়ই না বলে আসবে না। কিন্তু মামা-মামী তাকে অনুমতি দিলেন কী করে! সমাজের কথা কি একবারও তাঁদের মনে এল না!

অথচ এই সমাজের ভয়ে মামীর কত অশান্তি ছিল মনে। হালদার মশায়ের ভয়ে তিনি কাঁটা হয়ে থাকতেন। রামেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়ে স্বাতিকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ক্লান্ত দেহে। স্বাতি একা ফিরতে পারে নি,

পাণ্ডার লোকেরা তাকে খুঁজে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার জন্য মামী আমার উপরে বিরূপ হয়েছিলেন। আমার দায়িত্বহীনতার জন্য নয়, দেশে একটা কলঙ্ক রটবার ভয়ে, কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন।

এর পরে দু বছরের বেশি সময় কেটে গেছে। হালদার মশাই আমাদের দুজনকে একত্র দেখেছেন আরও কয়েক জায়গায়। আর প্রতিবারেই মামী নানা আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছেন। এই মামীর কথা ভেবেই আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। সহসা আজ কোন্ সাহসে তিনি তাঁর মেয়েকে ছেড়ে দিলেন একজন অনাত্মীয় পুরুষের সেবার জন্য! হালদার মশাই কি মরে গেছেন, না তাঁর সমাজের আতঙ্ক হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেল!

মামার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি। নিজের আভিজাত্যের গর্বকে তিনি অনেক আগেই জয় করেছেন। স্বাতি তাঁর কাছে বাধা পাবে না। বরং উৎসাহ পাবে তার স্বাধীনতায়। তবে কি মামাই স্বাতিকে পাঠালেন!

সকাল বেলায় আমাদের যন্ত্রণার স্থানের ছবি তোলা হল। যথা-সময়ে তার ফলাফলও জানা গেল। মিস্টার ইনিসের ভেঙেছে বাঁ হাতের কব্জি, মিস্টার লাল খোঁড়া হয়েছেন—তাঁর ডান পায়ের অ্যাঙ্ক্‌ল্ সরে গেছে, আর আমার গলার হাড়ে চিড় খেয়েছে—বুকের হাড় নয়, ক্ল্যাভিকল বোন। এই খবর নিয়ে মিস্টার ইনিস নিজেই এলেন হাসতে হাসতে, বললেন: চিকিৎসার ব্যবস্থাও সব করে এলাম।

সাহেবের পিছনে ছিলেন দার্জিলিঙ অফিসের ম্যানেজার মিস্টার গিরি। তাঁর সঙ্গে গতকাল আমার পরিচয় হয়েছে। খবর পেয়ে তিনি পরশু রাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তখন অজ্ঞান

ছিলুম বলে আমার সঙ্গে একদিন পরে পরিচয় হয়েছিল। খাস নেপালী, কিন্তু চেহারায় ও কথাবার্তায় তাঁকে বাঙালী বলেই ভ্রম হয়। ইংরেজীতে তিনি বললেনঃ আমি থাকতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

মিস্টার ইনিস বললেনঃ এঁদের দুজনকে আমি আপনার জিম্মাতেই রেখে যাব। তবে দুজনের চিকিৎসা হবে দু জায়গায়। মিস্টার লাল এখন হাসপাতালেই থাকবেন। কিন্তু এঁর জন্যে একটা ভাল হোটেলের ব্যবস্থা করুন। টাকা-পয়সার কোন অসুবিধা যেন না হয়, ফার্ম সব খরচ বহন করবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুমঃ আপনার কী ব্যবস্থা হবে?

আমার!

বলে সাহেব প্রথমে হাসলেন। তারপর ডান হাতে একটা চুরট বুকপকেট থেকে বার করে দাঁতে কেটে ঠোঁটে আটকালেন। পরে অন্য পকেট থেকে লাইটার বার করে সেই চুরট ধরিয়ে লাইটারটি যথাস্থানে রাখলেন। আমি এই কাজে তাঁর কুশলতা দেখছিলুম। সাহেব একমুখ ধোঁয়া নিয়ে বাঁ হাতের কব্জিটা দেখিয়ে বললেনঃ এ হাতটা আজ বেঁধে নিচ্ছি, আর আজকের প্লেনেই ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়।

আমি বললুমঃ ব্যথা বেদনা?

সাহেব এ কথার উত্তর দিলেন না, ডান হাতে একমুঠো কাগজের পুরিয়া পকেট থেকে বার করে দেখালেন। বুঝতে পারলুম যে ওর ভিতরে এ. পি. সি. পাউডার আছে। প্রয়োজন মতো ঐ পাউডার খেয়ে যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা করবেন।

যাবার আগে মিস্টার গিরিকে বললেনঃ এঁর বুকে বোধহয় ফিগার অফ এইট বাঁধবার দরকার হবে না, বাঁ হাতটা মনে হচ্ছে কাপড়ের স্লিঙ দিয়ে টেনে রাখবেন। কাজেই ওঁর হাসপাতালে থাকবার দরকার হবে না। আজকেই ওঁকে একটা ভাল হোটেলে নিয়ে যাবেন। বাট্—

বলে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, আর মিস্টার গিরিকে বললেন: নট্ বিফোর শি কাম্স্। দুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা পাকা করবেন।

মিস্টার গিরি সবিনয়ে বললেন: সিওরলি স্যার।

তারপরে দুজনে মিস্টার লালের কাছে চলে গেলেন। বেচারা মিস্টার লাল! তিনি আমাদের দিল্লীর কর্তাদের নিকট-আত্মীয়, কলকাতায় তাঁব পরিবার আছে। মিস্টার ইনিস বোধহয় কলকাতায় ফিরে তাঁকেও সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কববেন।

এবাবে একে একে সকলের ব্যবস্থা হল। আমার বাঁ হাতখানা একটা তিনকোনা কাপড়ে জড়িয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল, স্বচ্ছন্দে আমি এবারে চলাফেরা করতে পারব। মিস্টার ইনিসও তাঁর বাঁ হাতের কব্জিটা একটুকবো কাঠ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। কিন্তু মিস্টার লালকে শুয়ে থাকতে হল, কাঠ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় তাঁকে মাসখানেক শুয়ে থাকতে হবে।

আমিও তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন। বললেন: শীতে এখনি আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি, একমাস এখানে থাকতে হলে জমে বরফ হয়ে যাব।

মিস্টার ইনিস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: ব্যস্ত হয়ো না, একটু সুস্থ হলেই তোমায় কলকাতায় নিয়ে আসব।

তারপরে আমাকে বললেন: একেবাবে সেবে না উঠে কাজে যোগ দিও না, এখানকার শীতে কষ্ট হলে কলকাতায় এসে বিশ্রাম কোরো।

হাসিমুখে মিস্টার ইনিস হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন। আজই একখানা প্লেন ধরে তিনি কলকাতায় ফিরতে চান। তা না পেলে ট্রেন আছে।

কলকাতা থেকে প্লেন কখন আসে সেকথা আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

৩

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তারপর অন্ধকার নামল সন্ধ্যার। কিন্তু স্বাতি এল না। তার বদলে এলেন মিস্টার গিরি, পরিষ্কার বাঙলায় বললেনঃ আমাদের হিসাবে একটু ভুল হয়েছে, আজ তো এখানে তিনি পৌঁছতে পারবেন না।

আমার আর সঙ্কোচ ছিল না। প্রশ্ন করলুমঃ কেন?

মিস্টার গিরি বললেনঃ কাল সন্ধ্যা বেলায় তিনি দিল্লী থেকে কথা বলেছিলেন। তার মানে আজ সকালে রওনা হবেন দিল্লী থেকে। সে-প্লেন কলকাতায় পৌঁছবার আগেই বাগডোগরার প্লেন কলকাতা ছেড়ে চলে আসে। দিনে তো একখানাই প্লেন। আজ তিনি কিছুতেই এখানে পৌঁছতে পারবেন না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুমঃ তাই নাকি!

মিস্টার গিরি বললেনঃ বড়সাহেবের জন্যে আমি সব খবর সংগ্রহ করেছি। তিনিও আজ কলকাতা ফিরবার জন্য কোন প্লেন পাবেন না। ট্রেনে গেলে কালকের দিনটাও তাঁর নষ্ট হবে। তাঁকে শিলিগুড়িতে রাত কাটিয়ে সকালের প্লেন ধরবার পরামর্শ দিয়েছি।

আমি এই সংবাদ শুনে দমে গেলুম, বললুমঃ কিন্তু তার যে আজ এখানে পৌঁছবার কথা ছিল।

তবে একটু অপেক্ষা করুন, খবরটা ভাল করে নিয়ে আসি।

কী খবর?

ডাক্তারবাবুকে কাল কে টেলিফোন করেছিলেন এবং ঠিক কটার সময়। তাঁর রওনা হবার খবরটা যদি অন্য কেউ দিয়ে থাকেন তো সে স্বতন্ত্র কথা।

দু পা এগিয়েই ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন, বললেন : তাহলে তো এতক্ষণ তাঁর পৌঁছে যাবার কথা। বাগডোগরায় প্লেন আসে সকাল নটা নাগাদ। তারপর দার্জিলিঙ পৌঁছতে ধরুন ঘণ্টা চারেক। এখানে এসেই লাঞ্চ খেতেন।

বিমর্ষভাবে আমি বললুম : আপনার হিসেব তো ভুল বলে মনে হচ্ছে না।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : ভুল হবার তো উপায় নেই। এ যে সোজা যোগ বিয়োগের অঙ্ক। দাঁড়ান তাহলে, ডাক্তারবাবুকে কথাটা জিজ্ঞেস করেই আসি।

মিস্টার গিরি এবারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কী মনে করে আবার ফিরে এলেন। বললেন : আপনাদের জন্যে হোটেলের খবর আমি নিয়ে রেখেছি। আপনারা কি বাঙালী হোটেল পছন্দ করবেন, না যে কোন ভাল হোটেল হলেই চলবে?

বললুম : একটু পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন জায়গা হলেই আমাদের পছন্দ হবে।

ভদ্রলোক বললেন : স্টেশনের কাছে আমাদের জানাশুনো একটা হোটেল আছে। ব্যবস্থা ভাল, সস্তাও বটে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে সেখানে আপনাদের নিজের লোকের মতো যত্ন করবে। হোটেলে আছেন এ কথা আপনার মনে হবে না।

আমি বললুম : কতদিন থাকতে হবে জানি নে তো, সেই রকম জায়গাই ভাল।

খুশী হয়ে ভদ্রলোক এবারে ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন।

জানি না কেন আমি বড় অশান্ত বোধ করছিলুম। বুকের বেদনা আজ কম, বাঁ হাতখানি গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা বলে খাটের উপরে হেলান দিয়ে বসেছি। কানের উপরে একটু কেটে গিয়েছিল বলে মাথায় একটা পটি বেঁধে দিয়েছে। বেশ খানিকটা আহত হয়েছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শারীরিক কষ্টের জন্য যে অশান্ত

বোধ করছি না তাতে সন্দেহ নেই। নানা অসম্ভব কথা আমার মনে আসছিল। স্বাতি কি সত্যিই আসছে, না ভুল শুনেছে এই হাসপাতালের ডাক্তার! দিল্লী থেকে কাল রওনা হয়ে থাকলে এতক্ষণ তো তার এসে পৌছনো উচিত ছিল! মিস্টার গিরি হয়তো ঠিকই বলেছেন যে স্বাতি যদি সত্যিই আসে তো কাল দুপুরে আসবে, আজ নয়। আরও একটা রাত আমাকে বিনিদ্র কাটাতে হবে।

তারপরে আরও একটি অদ্ভুত সমস্যা আমার সামনে বড় হয়ে উঠল। স্বাতি যদি একা আসে তাহলে হোটেলে আমাদের দুটি ঘর চাই, পাশাপাশি হলেই ভাল, তা না হলে কাছাকাছি হলেও চলবে। কিন্তু মিস্টার গিরি কি এই প্রয়োজনের কথা বুঝবেন! যে ভাবে তিনি কথা কইছেন তাতে আমার এই প্রস্তাব শুনলে হয়তো আকাশ থেকে পড়বেন। এই প্রয়োজনের কথা আমি হয়তো তাঁকে বোঝাতেই পারব না। সত্যি কথা বললে হয়তো মিস্টার ইনিসের মতো হাসবেন না, কোন কদর্থ করে বসতেও পারেন। এ কথা মনে হতেই আমার গরম বোধ হতে লাগল। মনে হল যে কম্বলের ভিতরে আমি ঘেমে উঠছি।

ডাক্তারের কাছে খবরাখবর নিয়ে মিস্টার গিরি ফিরে এলেন, বললেন: আমি ঠিকই বলেছি। দিল্লী থেকে দ্বিতীয় প্লেনখানা ছাড়ে বিকেল সাড়ে চারটের পরে। ডাক্তারবাবু তাঁর টেলিফোন পেয়েছিলেন এই রকম সময়ে, মানে তখন সন্ধ্যা হচ্ছিল। তার মানে কাল তিনি প্লেন ধরতে পারেন নি। আজ সকালে প্রথম প্লেন ধরেছেন প্রায় সাড়ে আটটায়, তার মানে সাড়ে দশটার পর কলকাতায় পৌছেছেন। প্লেন না পেয়ে যদি ট্রেনে চেপে থাকেন তাহলেও কাল দুপুরের আগেই এসে পৌছবেন। দার্জিলিঙ মেলে চেপে থাকলে ফরাক্কায় গঙ্গা পার হয়ে নিউজলপাইগুড়ি পর্যন্ত বড় লাইনের ট্রেনে আসবেন। তারপর ছোট লাইনের ট্রেনে, অথবা ট্যাক্সিতে। হরেদরে সমান, প্লেনেও যা ট্রেনেও তাই।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন : এ ভালই হল, এখান থেকে রাতে কোন হোটেলে গিয়ে ওঠার চেয়ে দিনের বেলাতে যাওয়াই ভাল। আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভদ্রলোক মিস্টার লালের কাছে চলে গেলেন।

কিন্তু মিস্টার গিরির সান্ত্বনায় আমার মন শান্ত হল না। নানা উদ্বেগ ও আশঙ্কায় মন আমার উদ্বেল হয়ে উঠল। দু ঘণ্টায় স্বাতি দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছল, আর বাকি পথটুকু আসতে তার একদিনেরও বেশি সময় লাগবে! এ কী রকমের যোগাযোগ ব্যবস্থা! ট্রেনের মতো কি প্লেন বদলের ব্যবস্থা নেই! নাগপুরেব কথা শুনেছি—দিল্লী কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ থেকে বাতের প্লেন এসে সব এক জায়গায় নামে, তারপব যাত্রী বদল হয়ে আবার সেই সব প্লেন ছাড়ে। কলকাতায় কেন এমন হয় না! দিল্লীব প্লেন কলকাতায় এসে পৌঁছবার পরেই তো দার্জিলিঙেব প্লেনখানা ছাড়তে পারত। তাহলে মিস্টার ইনিসকেও হয়তো শিলিগুড়িতে এক রাত পড়ে থাকতে হত না।

আমি দরজার দিকে তাকিয়ে বসেছিলুম। মনে হচ্ছিল যে আজকের অন্ধকার যেন ঝপ করে নেমে পড়েছে। গতকালের মতো ধীরে ধীরে একটু একটু করে নামে নি। জানালার সার্সি-গুলো আজ হঠাৎ কালো হয়ে গেছে। নিচে থেকেও বোধহয় আজ মেঘ উঠেছে বেশি। তাইতেই এই অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমেছে।

সহসা আমার সমস্ত স্নায়ুগুলো শক্ত হয়ে উঠল। দরজার আড়ালে যেন রঙীন শাড়ির আঁচল দেখলুম। এ তো সাদা শাড়ি নয়, সাদা শাড়িতে কোন আঁচল থাকে না। বিদ্যুতের আলোয় একখানা রঙীন আঁচল বুঝি ঝলমল করে উঠেছিল। আমি সোজা হয়ে বসলুম।

চোখের পলক আমার আর পড়ল না। আমি কি ঘরের বাহিরে ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসব!

তার পরেই সমস্ত মন আমার পুলকে দুলে উঠল। ডাক্তারের সঙ্গে স্বাতিকে আসতে দেখলুম দরজা দিয়ে। সঙ্গে আর কেউ নেই, সে একা এসেছে। কত দূর থেকে স্বাতি এসেছে, কত কষ্ট পেয়েছে পথে, কত উদ্বেগে উদ্বেল হয়েছে তার মন। স্বাতি এসেছে, আর কারও কাছে নয়, আর কোনও কাজে নয়, আমার কাছে আমাকে দেখবার জন্যেই দিল্লী থেকে দার্জিলিঙে সে ছুটে এসেছে। না এসে সে থাকতে পারে নি, থাকতে পারত না। খাট থেকে আমি লাফিয়ে নামতে চেয়েছিলুম, অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিলুম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। কিন্তু আমার কি হল জানি নে, স্বাতি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়াল, আমি কোন কথা কইতে পারলুম না, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম অপলক দৃষ্টিতে।

স্বাতি সহসা কোন কথা কইতে পারল না, দু চোখ তার ছলছল করে উঠল।

ডাক্তার একবার আমার মুখের দিকে, আর একবার স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন। কী বুঝলেন তিনিই জানেন, কোন কথা না বলে তিনি ফিরে গেলেন।

তারপর স্বাতি আমার বিছানার ধারে বসে পড়ল, আমার ডান হাতখানা টেনে নিল নিজের দু হাতের মধ্যে। আমার ঠাণ্ডা হাতের উপরে যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তা আমি অনুভব করছিলুম। কিন্তু স্বাতিকে আর আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না।

৪

সকাল থেকে স্বাতির কাজের আর অন্ত নেই। সারাক্ষণই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ছুটোছুটি করছে। আমি তাকে ডেকে বললুম: এ তো তোমার কাশ্মীরের হাউসবোটের সংসার নয়, এ দার্জিলিঙের হোটেল। এখানে তোমার সংসারের কী ভাবনা!

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে স্বাতি বললো: সংসারের ভাবনা তুমি কী বুঝবে! যা বোঝ, একা একটু একটু ভাব না।

এই ভাবনার কথাও সে আমাকে বলেছিল, আমার লেখার ভাবনা। তার জন্যে কিছু কাগজ-পত্রও আমার হাতে বার করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু সে ভাবনা এখন আমার মনে আসছে না, আমি এখনও কালকের কথাই ভাবছি। কাল সন্ধ্যাবেলায় স্বাতি কয়েকটা মুহূর্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, তারপরেই সামলে নিয়েছিল। আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছে আমার চোখের কোণও মুছিয়ে দিয়েছিল; বলেছিল: ভারি ছেলেমানুষ তুমি।

কাল এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি নি। মিস্টার গিরি এসে কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, নমস্কার করেছিলেন স্বাতিকে। আমি তাদের পরিচয় করে দিয়েছিলুম। আর মিস্টার গিরি বলেছিলেন কাজের কথা। আজই আমি হোটেলে যাব কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আর আমি বলেছিলুম, এখুনি যাব।

স্বাতি খুশী হয়েছিল আমার উত্তর শুনে, বলেছিল: তাহলে সেই ব্যবস্থাই দয়া করে করুন না, স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে আমি আমার জিনিসপত্র রেখে এসেছি।

বলে হোটেলের একখানা কার্ড মিস্টার গিরিকে বার করে দিল। এই কার্ড দেখে ভদ্রলোক প্রচুর খুশী হলেন, বললেন: আমি তো এই হোটেলেই আপনাদের ব্যবস্থা করেছি।

বলে পরম উৎসাহে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আমাদের হোটেলে আনবার ব্যবস্থা করলেন।

হোটেলে আমাদের ঘর নিয়ে কোন সমস্যার কথা উঠল না, অত্যন্ত

সহজভাবে স্বাতি সব সমাধান করে ফেলল। মিস্টার গিরি হোটেলের সবচেয়ে ভাল ঘরখানির ব্যবস্থা করেছিলেন, এ ঘরে প্রচুর আলো-বাতাস আসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় ঘরের জানালা দিয়ে। ঘরের দুধারে দুখানা খাট ছিল, মাঝখানে একটা ছোট টেবিল আর দুখানা চেয়ার। একপাশে ড্রেসিং টেবল টুল আর আলনা। ঘরে ঢুকেই স্বাতি বলল : ওমা, এইটুকু ঘরে আমরা দুজনে থাকব কেমন করে! অসুস্থ মানুষকে একটু নড়া-চড়ারও জায়গা দিতে হবে তো!

বলে ম্যানেজারের দিকে তাকাল।

ম্যানেজার একটু সঙ্কুচিতভাবে বললেন : পাশের ঘরটা যে আরও ছোট।

বলে মাঝখানের দরজাটা খুলে পাশের ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন।

স্বাতি ও-ঘরে একটা উঁকি দিয়েই বলল : এই তো, খুব চমৎকার ব্যবস্থা হবে। ও-ঘরখানাও আমাদের দিন, আর এই খাটখানা দিন বার করে। তার বদলে একখানা ইজিচেয়ার যদি দিতে পারেন—

মিস্টার গিরি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, এইবারে খুশী হয়ে বললেন : একখানা নয়, দুখানা ইজিচেয়ার আর একটা ছোট খাবার টেবিল। ওঁরা লাঞ্চ ডিনারও এই ঘরে খাবেন।

দেখতে দেখতেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্বাতি ম্যানেজারকে বলল : আর একটু কষ্ট দেব আপনাকে, দিল্লীতে একখানা 'তার' করতে চাই।

ম্যানেজার তাঁর অফিস থেকে নিজেই একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে এলেন। স্বাতি সেই ফর্ম লিখে ম্যানেজারের হাতে দিল, টাকাও দিল ব্যাগ থেকে বার করে। মিস্টার গিরি তখনও উপস্থিত ছিলেন, বললেন : টাকা দেবার দরকার হবে না, ম্যানেজারবাবুই সব হিসেব রাখবেন।

সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের পছন্দমতো হবার পর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

আমি বলেছিলুম : এইবারে একটু স্থির হয়ে বোসো।

স্বাতি বলেছিল : তার কী উপায় আছে!

কেন?

এখনও আমার অনেক কাজ।

ডিনার আসবার আগে স্বাতি শুধু বিছানাপত্রই সুন্দর করে সাজায় নি, নিজেও গবম জলে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। সারাদিনের ক্লান্তি আর উদ্বেগ ধুয়ে মুছে সে যখন কাছে এসে বসল, তখন ভারি ভাল লাগছিল তাকে দেখে। স্বাতি সকৌতুকে বলল : অমন করে কী দেখছ ?

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত না কবে বললুম : দেখছি তোমাকে।

স্বাতি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করল, বলল : বড় হাল্কা হয়ে যাচ্ছ।

বললুম : তাহলে এবাবে ভাবি হয়ে একটা প্রশ্ন করি। কেমন করে এলে ?

স্বাতি বলল : তার আগে তোমাব দুর্ঘটনাব কথা বল।

আমি খুব সংক্ষেপে বলেছিলুম এই দুর্ঘটনার কথা, আব সে আমাকে তার নিজেব কথা বলেছিল। কাল বিকেলে যখন আমাদেব টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল, তখন চাওলা তাদের বাড়িতে বসে ছিল। সে বেড়াতে এসেছিল মিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে। মামা-মামী দুজনেই ব্যস্ত হয়েছিলেন, আর স্বাতি ভেবেছিল যে একখানা টেলিগ্রাম করে আমাব খবর নেবে। কিন্তু গোলমালটা নাকি চাওলাই বাধাল, বললে, অসম্ভব কথা, টেলিগ্রামের কি এই সময়! এখনি কারও যাওয়া দরকার। কিন্তু যাবে কে! মামার প্লেনে ওঠা বারণ, আর কিছুদিন না গেলে ট্রেনে যাতায়াতও করা চলবে না। কাজেই মামা ও মামী বেরতে পারবেন না। চাওলা বলল, তাহলে আমিই যাই। মিত্রা বলল, তোমার তো জরুরী কাজ আছে, তুমি থাক, আমিই ঘুরে আসি। শেষ পর্যন্ত স্বাতিকে বলতে হল, কাউকে কষ্ট করতে হবে না, সেই আমার খোঁজ নিতে আসবে।

আমি হেসে বললুম : বুঝেছি।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : বোঝ নি কিছুই, কোন দিন বুঝবেও না।

আমাকে তুমি অত বোকা ভাব !

চালাকরাই বেশি বোকা হয়।

আমি বললুম : ভারি অদ্ভুত কথা বলছ তো !

স্বাতি বলল : সত্যি কথাই এইরকম অদ্ভুত শোনায়। কোন এক

বিষয়ে বিত্তেবুদ্ধি বাড়লে আর সব বিষয়ে মানুষ বোকা হয়ে যায়। তোমার বোকামিও সবার কাছে জানাজানি হয়ে গেছে।

আহারের পরে স্বাতি আমাকে শুইয়ে দিয়েছিল। গলা অবধি কম্বল টেনে দিয়ে বলেছিল : কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা বোঝবার চেষ্টা কর তো।

আমি বললুম : কষ্ট আবার কী হবে ?

কোন ব্যথা বেদনা ?

সব ভুলে গেছি।

স্বাতি আমার মাথাব কাছে কাচের জগ আর গেলাস রেখে বলল : কাল রাতে তো ঘুম হয় নি, আজ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও।

বলে ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারেই আমি বলেছিলুম : মুখ লুকোবার জন্যেই কি বাতিটা নেবালে !

গল্প কাল হবে।

বলে স্বাতি নিজের ঘরে গিয়ে মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সকালবেলায় স্বাতি বেশিক্ষণ ছুটোছুটি করে বেড়ায় নি। ফিরে এসে আমার কাছে বসল, বলল : দেখে এলাম সব। একতলায় এদের খাবার ঘব, আমরা তেতলায় আছি, রাস্তার ওপরে এদের দোতলা। ব্যাপারটা বুঝলে না তো ?

বললুম : না।

স্বাতি বলল : রাস্তা থেকে এই হোটেলে ঢুকলে প্রথমে দোতলা পাবে, একতলায় নামতে হলে হয় সিঁড়ি দিয়ে নামো, নয় পাশের একটা রাস্তা ধরে নেমে এস। আমাদের হোটেলের সামনে পাহাড়, পেছনে খোলা। মেঘ না থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা আমরা পেছনে দেখব।

তারপর টেবিলের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল : এগুলোর দিকে বুঝি এখনও চেয়ে দেখ নি ?

হেসে বললুম : মন এখন অন্য জগতে কিনা, তাই চোখকে ছুটি দিয়েছি।

স্বাতি বলল : চোখকে ছুটি না দিয়ে মনকে মাঝে মাঝে ছুটি দিও, তাতে আরামও পাবে আর দুর্ঘটনাও ঘটবে না। চোখকে ছুটি

দিয়ে এ বয়সে খানায় পড়া তো উচিত নয়। বুক ভাঙলে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু খোঁড়া হলে সে বড় লজ্জার কথা।

বলে কাগজপত্রগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিল। পশ্চিমবঙ্গের উপরে কয়েকখানি সরকারী পুস্তিকা। কলকাতার সম্বন্ধেই কিছু আছে, কিন্তু বাঙলা দেশের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই।

স্বাতি বলল: এগুলো আমি সংগ্রহ করি নি, মিস্টার চাওলা আমাকে এরোড্রোমে পৌঁছে দিয়েছেন, বলেছেন, এগুলো ভাগীরথী পর্বের জন্যে হয় তো কাজে লাগবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: ভাগীরথী পর্ব!

স্বাতি হেসে বলল: এই নাম শুনে আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম। মিস্টার চাওলা বলেছেন, কালিন্দী পর্বে আমাদের কথা আছে, ভাগীরথী পর্বে থাক তোমাদের কথা। কিন্তু ভাগীরথী পর্ব নামটা কি ঠিক হবে?

ভাগীরথী গঙ্গার নাম, কিন্তু গঙ্গাকে আমরা আর ভাগীরথী বলি না। পাতালবাসী কপিল মুনির শাপে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্যই এই বংশের রাজা ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে এনেছিলেন পৃথিবীতে। হিমালয়ে ভাগীরথী শৃঙ্গ আছে, তারই নিকটে আছে ভগীরথের তপস্যার স্থান বিন্দুসর। সেই খানেই গঙ্গা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল ভাগীরথী। ভগীরথ যখন ভাগীরথী গঙ্গাকে কপিল মুনির আশ্রমের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গঙ্গার প্রবাহে জহ্নু মুনির আশ্রম গিয়েছিল ভেসে, ঋষি গঙ্গাকে পান করে ফেলেছিলেন। তারপর অনুরোধে উপরোধে গঙ্গাকে যখন তিনি কান দিয়ে মুক্ত করে দিলেন, তখন তাঁর নাম হয়েছিল জাহ্নবী। এ সব পুরাণের কথা। এ যুগের ভৌগোলিক এ সব কথা মানেন না। যাঁরা গোমুখ ও গঙ্গোত্রী দেখে এসেছেন তাঁরা বলেন যে সেখানে গঙ্গার আজও ভাগীরথী নাম। এই ভাগীরথীর সঙ্গে অলকনন্দার মিলন হয়েছে দেবপ্রয়াগে। গঙ্গা এই দুই নদীর মিলিত ধারার নাম।

কিন্তু আবার আমরা গঙ্গার ভাগীরথী নাম দেখি বাঙলা দেশে। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে আছে যে ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে গৌড়ের

নিকটে পৌঁছলেন তখন শঙ্খাসুর ভগীরথের রূপ ধারণ করে তাঁকে পূর্বমুখী করেন। কিছু দূর যাবার পরে ভগীরথ এই কথা বুঝতে পেরে গঙ্গাকে আবার দক্ষিণে ফিরিয়ে আনেন। যে গঙ্গা পূর্বমুখে বয়ে গেলেন তাঁর নাম পদ্মা, আর যিনি ফিরে এলেন দক্ষিণে যাবার জন্য তিনিই ভাগীরথী। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী গ্রাম থেকে গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথী প্রবাহিত হচ্ছে বাঙলার বুকের উপর দিয়ে। কলকাতার কাছে ইংরেজরা এই নদীর নাম রেখেছিল হুগলি। কিন্তু এ নাম আমরা মেনে নিই নি, আমরা বলি গঙ্গা, ভাগীরথী গঙ্গা। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমে আজও অগণিত ভক্ত আসেন মকর সংক্রান্তিতে, স্নান করেন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম স্থলে।—ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবারে আমি তার দিকে তাকাতেই প্রশ্ন করল ঃ কী ভাবছিলে ?

বললুম ঃ ভাগীরথীর কথাই ভাবছিলুম। ভাগীরথীই বাঙলা দেশের প্রাণ। হিন্দু যুগের গৌড়, পাঠানদের পাণ্ডুয়া ও মোগলদের মুর্শিদাবাদ ছিল ভাগীরথীর তীরেই। বর্তমান বাঙলার প্রাণও ভাগীরথীর দুই তীরে স্পন্দিত হচ্ছে। বাঙলার কথাকে ভাগীরথীর কথা বললে ভুল বোধহয় হবে না। কালিন্দীর গৌরব যেমন দিল্লী, তেমনি কলকাতা হল ভাগীরথীর গৌরব।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল ঃ আজই মিস্টার চাওলাকে একটা ধন্যবাদ জানাব।

৫

বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গিয়েছিল, এবারে কাশির শব্দও শুনতে পেলুম। স্বাতি বলল ঃ মিস্টার গিরি বোধহয় এসেছেন।

বলে বাহিরে গিয়ে ভদ্রলোককে ঘরে ডেকে আনল। প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল ভদ্রলোকের মুখ, নমস্কার করে প্রশ্ন করলেন ঃ আজ কেমন আছেন ?

প্রশ্নটা কাকে করলেন তা বোঝা গেল না। তার কারণ তিনি স্বাতির মুখের দিকেই চেয়ে ছিলেন। কিন্তু স্বাতি কোন উত্তর দিল না দেখে আমি বললুম: আশা করছি দু-একদিনেই কাজে যোগ দিতে পারব।

ভদ্রলোক যেন আঁৎকে উঠলেন, বললেন: সর্বনাশ, ও কাজও করবেন না। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে এক পাও নড়বেন না এখান থেকে।

স্বাতি তার ঘর থেকে একখানা চেয়ার টেনে আনছিল, তাই দেখে ভদ্রলোক হৈ চৈ করে উঠলেন: আমাকে দিন আমাকে দিন আপনি, আমার জন্যে এ রকম কষ্ট করবেন না।

বলে জোর করেই স্বাতির হাত থেকে চেয়ারখানা কেড়ে নিয়ে নিজে তার উপরে চেপে বসলেন। স্বাতি তার পুরনো চেয়ারে বসবার আগে বাহির থেকে খানিকটা ঘুরে এল। আমি বুঝতে পারলুম যে মিস্টার গিরির জন্যে সে চা কিংবা কফির ফরমাস করে এল।

স্বাতি ফিরে এলে মিস্টার গিরি বললেন: একটা কথা ভেবে ভেবে আমি কাল সারারাত জেগে কাটালাম।

আমরা দুজনেই তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললেন: কাল সন্ধ্যেবেলায় আপনি কী করে এসে পৌঁছে গেলেন, এর হিসেব আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি নে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের টাইম টেবল আমাদের অফিসে আছে, মিস্টার ইনিসের জন্যে আমি খুব ভাল করে সব দেখেছি, কিন্তু বিকেলে কোন প্লেনের সময় আমি দেখি নি।

স্বাতি সহাস্যে বলল: এ দেশের ছড়াটা আপনার মনে পড়ল না!—

আজ শিলিগুড়ি কলকাতাকে
দিনে দুইবার দাদা বলে ডাকে।

মিস্টার গিরির মতো আমিও আশ্চর্য হয়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি আমাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে খুশী হল। বলল: আমি দিল্লীর এরোড্রোমে এই ছড়া শুনেছি এক বাঙালী ভদ্রলোকের মুখে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের টাইম টেবল আমিও দেখেছি, আর উদ্বিগ্ন হয়েছি অপর্যাপ্ত। আমার উদ্বেগের কারণ জেনে সেই ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, শিলিগুড়ি এখন আর আগের শিলিগুড়ি নেই, দেখতে দেখতেই মস্ত বড় শহর হয়ে উঠেছে। তারপরেই বললেন ছড়াটা। শুধু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস নয়, আরও প্রতিষ্ঠান আছে, তারাও যাত্রী আর মালপত্র নিয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি কুচবিহার রূপ্সী বালুরঘাট প্রভৃতি জায়গায় অনবরত যাতায়াত করছে।

মিস্টার গিরির দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছে দেখলুম।

আমি বললুম: আমাদের তো উড়োজাহাজের ব্যবসা নয়, আমাদের এ সব খবরে কী দরকার বলুন!

মিস্টার গিরি লজ্জিতভাবে বললেন: মালপত্র চলাচলের কথা জানি, কিন্তু তারা যে যাত্রীও নেয় এ কথা আমার জানা ছিল না।

বেয়ারা এই সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে এল বলেই রক্ষা পাওয়া গেল। তা না হলে এই প্রসঙ্গ চট করে থামত না। মিস্টার গিরি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনারা এখনও চা খান নি?

স্বাতি বলল: আপনার খাতিরে আর একবার খাব।

ভদ্রলোক এ কথার কী উত্তর দেবেন ভেবে না পেয়ে বসে পড়লেন। চা খেতে খেতে স্বাতি বলল: এই ভদ্রলোককে বেশি দিন এইভাবে বসিয়ে রাখা যাবে না। কুঁড়ে মানুষ তো, আরও কুঁড়ে হয়ে যাবে।

পরম কৌতুকে মিস্টার গিরি বললেন: আমার স্ত্রীও আমার সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলেন। খেটে খেটে মরে গেলেও বলেন, কুঁড়ে লোক, সংসারের জন্যে তোমাকে কী করতে হয়!

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনিই বলুন, আমাদের এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারটা কি সংসারের জন্যে নয়!

আমি হেসে বললুম: সব পুরুষেই তো রোজগার করে।

সব মেয়ে কি ঘর-কন্না করে না?

বললুম: না। আপনি আরও বেশি রোজগার করলে আপনার মেমসাহেব পায়ের উপরে পা দিয়ে খেতেন, সকাল থেকে আপনার জন্যে হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলতেন না।

মিস্টার গিরি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন ঃ কী আশ্চর্য! আপনি যে আমার স্ত্রীর কথাগুলিই বলছেন!

বললুম ঃ এ তো শুধু আপনার স্ত্রীর কথা নয়, এ হল সবার স্ত্রীর কথা।

মিস্টার গিরি সবিস্ময়ে স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন, আর স্বাতি তার লজ্জা ঢাকবার জন্যে বলল ঃ এ ভদ্রলোক তৈরি করে কথা বলতে খুব ভালবাসেন। তার চেয়ে দার্জিলিঙে কী দেখবার আছে আপনি তাই বলুন। অনেকদিন আগে এসেছিলাম, সব জায়গার কথা ভাল মনে নেই।

মিস্টার গিরি সোৎসাহে বললেন ঃ আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি নিজে আপনাদের সব জায়গা দেখিয়ে দেব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ মিস্টার লাল আজ কেমন আছেন?

দেখেছেন! একদম ভুলে গিয়েছিলাম মিস্টার লালের কথা।

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ আমি তাঁর খবর নিয়ে এখুনি আসছি।

আমি বললুম ঃ না না, এখুনি আপনাকে আসতে হবে না। আপনার ফুরসৎ মতো আসবেন।

মিস্টার গিরি গম্ভীরভাবে বললেন ঃ এ আমার কর্তব্য কর্ম, এতে অবহেলা করলে কি চলে!

স্বাতি তাঁকে বারান্দায় এগিয়ে দিয়ে এল।

ফিরে এসে স্বাতি আবার গুছিয়ে বসল, বলল ঃ একটা প্রশ্ন তবু থেকে যাচ্ছে। গৌড় পর্ব বা বঙ্গ পর্ব নাম কেন উপযুক্ত নয়, সেই কথাটি জানা দরকার।

অনেকদিন আগে আমি বাঙলা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছিলুম। এত কথা ও এত রকমের কথা যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যে সেই কথার স্তূপ থেকে সত্যিকার বাঙলা দেশকে বোধহয় আবিষ্কার করতে পারব না। কাছে থাকলে স্মৃতির জঞ্জাল বাড়ে প্রতি দিন, পরে সেই জঞ্জাল সরানোই একটা মস্ত কাজ হয়ে দেখা দেয়। তা না পারলে আসল জিনিসই থাকে নকলের তলায় চাপা পড়ে। এই কঠিন কাজ কোন দিন পারব বলে আমার ভরসা হয়নি। হেসে বললুম ঃ যুদ্ধে নামাতে চাও তো, সে বড় কঠিন কাজ।

স্বাতি বলল : যুদ্ধের জন্যেই যে জীবন, সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না। তোমার শরীরে কি কোন কষ্ট আছে?

বললুম : শরীরের কষ্ট মনের আনন্দে চাপা পড়ে গেছে।

তবে গৌড়ের কথা আগে বল, তারপরে বঙ্গের কথা শুনব।

বললুম : গৌড়ের কথায় আমার কী মনে আসছে জান? বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশের একটা গল্পে লিখেছেন, অস্তি গৌড় বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী। স্কুলে সংস্কৃতের ক্লাসে এ গল্প পড় নি?

স্বাতি বলল : না।

গল্পের নাম আমারও মনে পড়ছে না, তার দরকারও নেই। গৌড় রাজ্যে কৌশাম্বী নামে এক নগরী ছিল, এইটুকু জানলেই চলবে। এই গৌড় বাঙলা দেশে নয়, তার কারণ কৌশাম্বী নগর ছিল এলাহাবাদ জেলায়।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তবে কি গৌড় রাজ্য এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

তা মনে হয় না। বরং গৌড় নামে একাধিক রাজ্য ছিল বলেই মনে হয়। স্কন্দ পুরাণেই আমরা পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ দেখি।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব....পঞ্চ গৌড়াঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

সারস্বত কনৌজ উৎকল মিথিলা ও গৌড়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণদের পঞ্চ গৌড় বলে। কাজেই পণ্ডিতদের বিচারে গৌড় পাঁচটি। রাজতরঙ্গিণীতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। —পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্। কাশ্মীরের রাজা জয়াদিত্য গৌড়ের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তাই তিনি পঞ্চ গৌড়ের রাজাদের জয় করে শ্বশুরকে সেই সব রাজ্যের অধীশ্বর করেছিলেন।

এই সব গৌড় রাজ্য কোথায় ছিল পণ্ডিতরা তাও আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কূর্ম ও লিঙ্গ পুরাণে যে গৌড় দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় তা বর্তমান অযোধ্যার নিকট গোণ্ডা জেলা।—নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ। শ্রাবস্তীর বর্তমান অবস্থান দেখেই প্রাচীন গৌড়ের অবস্থান অনুমান করা হয়েছে। স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে বর্ণিত গৌড় কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে। আর একটি গৌড়ের

অবস্থান জানা গেছে কিছু প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে। চেদি মালব ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে ছিল সেই গৌড় দেশ।

স্বাতি বলল: বুঝেছি। গৌড় বললে কোন্ গৌড়ের কথা তা সঠিক বোঝা যাবে না।

বললুম: ঠিক তাও নয়। একালে গৌড় বললে আমরা বাঙলার গৌড়ই বুঝি। অন্য কোন গৌড়ের কথা আমাদের মনে আসে না।

তবে?

গৌড় বললে সমগ্র বাঙলা দেশ আমরা বুঝি না, বাঙলাব যে অংশের কথা আমাদের মনে পড়ে তার মধ্যে বর্তমান বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতার কোন স্থান নেই। অবশ্য পাণিনির 'অরিষ্ক গৌড় পূর্বে চ' শ্লোক পড়ে মনে হয় যে বাঙলারই সাধারণ নাম ছিল গৌড়। ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তীরই ছিল গৌড়ের অন্তর্গত।

তবু আমি এই গৌড় নাম পছন্দ করি না। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে—

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।

এখানে গৌড় ও বঙ্গ এক রাজ্য নয়। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতাতেও আমরা এমন একটি শ্লোক পাই যাতে বোঝা যায় যে শুধু গৌড় ও বঙ্গ নয়, পৌণ্ড্র ও বর্ধমানও স্বতন্ত্র জনপদ। এই শ্লোকে উপবঙ্গ নামে আরও একটি জনপদ আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে গৌড়ের সীমা আছে—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।

বঙ্গ দেশ থেকে আরম্ভ করে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত গৌড় দেশ। এ কথা মেনে নিলে অঙ্গ ও পুণ্ড্র রাজ্য গৌড়ের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু গৌড় ও বঙ্গকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলেই স্বীকার করতে হয়। আর এই গৌড় রাজ্যকে কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে অনুত্তম পুরী বলে বর্ণনা করেছেন—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।

গৌড় অনুত্তম হলেও এই রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ়াপুরী নিরুপমা। পশ্চিম বাঙলায় রাঢ় নাম এখনও বর্তমান আছে, কিন্তু তাকে নিরুপমা বলা যায় কিনা সে আলোচনা আমরা পরে করব।

স্বাতি এতক্ষণ নিঃশব্দে আমার কথা শুনেছে, এইবারে বলল : আর নয়, গৌড় নাম আমি বাতিল করে দিলাম।

আমি বললুম : কিন্তু গৌড়ের কথা বাতিল করলে চলবে না, তাহলে বাঙলার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গৌড়বাসী বলে বাঙালী এক সময় গর্ব করেছে, কামরূপ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত গৌড়ের খ্যাতি ছিল লোকের মুখে মুখে।

স্বাতি বলল : উত্তর বঙ্গে এই গৌড় ছিল বলে শুনেছি।

আমি বললুম : মালদহ শহরের কাছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ।

স্বাতি বলল : গৌড় তুমি দেখেছ নাকি !

আমি হেসে বললুম : না। তবে এই চাকরিতে এসে শুধু আসাম নয়, বাঙলারও অনেক জায়গা আমার দেখা হয়েছে। সে সব তোমাকে পরে বলব। আজ গৌড়-বঙ্গের কথা বলি।

স্বাতির কৌতূহল তাতে মিটল না, বলল : বঙ্গের কথা তাহলে সংক্ষেপে বল।

আমি প্রশ্ন করলুম : বঙ্গ মানে জান তো ?

মাথা নেড়ে স্বাতি বলল : না।

বঙ্গ মানে রঙ্গ, চলতি কথায় যাকে বলে রাং, সীসাও বলে, সীসার সংস্কৃত নাম নাগবঙ্গ। রাং আর সীসায় সামান্য তফাৎ।

স্বাতি বলল : বঙ্গের এ মানে আমি জানি নে, কে জানে তাও জানি নে।

বঙ্গজ মানে জান ?

পূর্ববঙ্গের লোক।

বললুম : তার আসল মানে হল সিঁদুর, বঙ্গধাতু থেকে তৈরি বলে বঙ্গজ, পিতলকেও বঙ্গজ বলে।

স্বাতি বলল : শুধু এই জন্যেই কি বঙ্গ নামে তোমার আপত্তি !

বললুম : তাহলে মনুসংহিতার একটি শ্লোক তোমাকে শোনাতে হয়—

> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
> তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

স্বাতি বলল : এই শ্লোকটি যেন শোনা মনে হচ্ছে।

হয়তো বলেছি কখনও। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে যাওয়া চলবে না, গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার সহজ মানে হল এই যে সে সব দেশে কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না। ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথা সত্য বলেই মেনে নিতে হবে। মনুসংহিতা যখন রচিত হয়েছে তখনও আর্য জাতি সিন্ধু ও গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা ছেড়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে নি। বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের কথা বোধহয় তখন জানাই ছিল না।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। বঙ্গ নাম শুনলে একটা অনার্য দেশের কথা তোমার মনে পড়ে।

আরও একটি শ্লোক মনে পড়ে—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঅন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥

স্বাতি বলল : আজকাল বড় শ্লোক আওড়াচ্ছ।

আমি হেসে বললুম : বলেছি তো, বাঙলা সম্বন্ধে এক সময় অনেক কিছু পড়াশুনো করেছিলুম, কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারি নি।

এইবারে বুঝি কাজে লাগাবে ?

এই তো কাজে লাগছে।

স্বাতিও হেসে বলল : তোমার শ্লোকের মানেটা তাহলে বল।

এটি ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের শ্লোক। এর আগে আমরা বঙ্গ নামের উল্লেখ কোথাও পাই নে। ঋগ্বেদ সংহিতায় কীকট নামে অনার্য আবাসের নাম আছে, কীকটের পরবর্তী নাম মগধ বা বগধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র নামও পাই। যে শ্লোকটি বললুম, তা নিয়ে ভাষ্যকারদের নানা মত আছে। বঙ্গ বগধ ও চেরপাদ নিয়ে নানা অর্থ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন বৃক্ষ ওষধি ও সর্প, কেউ আবার পিশাচ রাক্ষস ও অসুরও বলেছেন। কিন্তু সাধারণ অর্থ অন্য রকম। তাতে বঙ্গ মগধ ও চেরপাদ জনপদের অধিবাসীদেরই বোঝায়। এই তিন দেশের প্রজাই দুর্বলতা দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক চটক ও পারাবতের সদৃশ।

স্বাতি হেসে বলল ঃ দেশের অবস্থা কি এখন কিছু ভাল? এখনও তো আমরা কাক চটক আর পারাবতের মতো বাস করছি।

আমি বললুম ঃ চেরপাদ বললে আমার চের রাজ্যের কথা মনে পড়ে। চের হল বর্তমান কেরালা, আর মগধের নাম হয়েছে বিহার। ভারতবর্ষে এই তিন রাজ্যের প্রজাদের অবস্থাই যেন বেশি খারাপ, দুবাহারের অবস্থা এখনও ঘোচে নি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ পুণ্ড্র কোন্ জনপদ?

পদ্মার উত্তরে বর্তমান পাবনাতেই ছিল পুরাকালের পুণ্ড্রবর্ধন শহর। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রজনপদবাসীদেরও 'দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা' বা দস্যুদের জনক বলে নিন্দা কবা হয়েছে। এই সমস্ত প্রাচীন উক্তি দেখে মনে হয় যে অনার্য অধ্যুষিত ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চল আর্যদের ঘৃণার স্থান ছিল, সেখানে গেলে আর্যদের পুনষ্টোম বা সর্বপ্রস্থ যজ্ঞ বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বঙ্গ নামে তাই আমি সম্মানের কিছু পাই নে।

স্বাতি বলল ঃ বুঝেছি।

এ কথার উত্তরে আমি বললুম ঃ বোঝ নি এখনও। বঙ্গ নামে বাঙলা দেশের কতটা অংশ বোঝা যায় তা না জানলে আমার কথা পুরোপুরি বুঝবে না। বরাহমিহিরের কথা আগে বলেছি, তাঁর মতে গৌড় পৌণ্ড্র বঙ্গ ও বর্ধমান স্বতন্ত্র জনপদ। আদিশূর যখন পঞ্চগৌড়ের রাজা তখন বঙ্গ ও রাঢ়দেশ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু পালবংশীয় রাজাদের শেষ সময়ে এ সব কোন রাজ্যই গৌড়ের অন্তর্গত ছিল না। তিরুমলয় গিরিতে দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের এক শিলালিপি পাওয়া গেছে। তার থেকে জানা যায় যে বঙ্গ ও পুণ্ড্রভুক্তি ছাড়া রাঢ় রাজ্য দুভাগে বিভক্ত ছিল এবং রাজারা ছিলেন স্বাধীন। বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র পুণ্ড্রভুক্তিতে ধর্মপাল এবং উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে যথাক্রমে মহীপাল ও রণশূর নামে রাজাকে রাজেন্দ্র চোল জয় করেছিলেন। আজকের মতো সমগ্র বাঙলাকে কখন্ বঙ্গ বলা হত আমি জানি নে, বরং পূর্ব-বঙ্গকেই বঙ্গ বলা হত বলে শুনেছি।

স্বাতি বলল ঃ শেষ কথাটা তোমার মনগড়া নয়তো?

আমি বললুম : মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের কথা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে সেকালে বঙ্গ ছিল ভাগীরথীর পূর্বাংশে, মালদহ ও বগুড়ার নাম ছিল পুণ্ড্র, হুগলির নাম কৌশিকীকচ্ছ, রাঢ়ের নাম সুহ্ম ও প্রসুপ্ত তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের নাম। নিম্নবঙ্গের ভূভাগ তখনও সমুদ্রগর্ভে ছিল, যশোহর খুলনা ফরিদপুর বরিশাল চব্বিশ পরগণা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশের অস্তিত্বই ছিল না।

স্বাতি যেন চমকে উঠল, বলল : তুমি অবিশ্বাস্য কথা বলছ।

বললুম : হতে পারে অবিশ্বাস্য, কিন্তু এ আমার নিজের কথা নয়। এ কথা আমি বিশ্বকোষে পড়েছিলুম। সে যুগের পণ্ডিতরা যত্ন করে বিচার-বিবেচনা না করে কোন মত প্রকাশ করতেন না।

পর্দার নিচে দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছিল ঘরের ভিতরে। স্বাতি একবার এই রৌদের দিকে তাকাল, তারপর বাহিরের উজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আমি বললুম : হাসলে যে ?

স্বাতি বলল : হালদার মশায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : সোমনাথের কথা তোমার মনে আছে ? দূর থেকে আমরা পূর্ণিমার গরবা নাচ দেখেছিলাম, তারপর মন্দিরের পিছনে গিয়ে শুকনো সাদা বালির উপরে বসেছিলাম দুজনে। সেখান থেকে মেয়েদের গান আর শোনা যাচ্ছিল না, সমুদ্রের দুরন্ত গর্জনে সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

আমি আস্তে আস্তে বললুম : শুধু সমুদ্র ছিল, আর ছিলুম আমরা দুজনে।

স্বাতি বলল : জোরে জোরে বাতাস বইছিল, আর চাঁদ উঠছিল ধীরে ধীরে। পোড়া মাটির মতো লাল চাঁদ সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। কিন্তু তুমি—

সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়েছিলুম বুঝি ?

প্রায় তাই। ইতিহাসের গল্প শুনিয়েছিলে। আর পিছন থেকে হালদার মশাই বলে উঠেছিলেন, এখানে বসেও শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে !

সেদিনের মতো আজও আমি লজ্জা পেলুম, বললুম : সত্যিই এ আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি গল্প করবে, আর আমি শুনব।

পরম আনন্দে স্বাতি আমার এই লজ্জাটুকু উপভোগ করল।

৬

কিন্তু স্বাতি আমাকে নীরবে থাকতে দিল না। হোটেলের বেয়ারা একখানা বাঁধানো খাতা এনে তার হাতে দিতেই বলে উঠল : তোমার ভাগীরথী পর্বের ভূমিকা এই বারে বল।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

বললুম : নিজেকে যে আরও রহস্যময় করে তুলছ!

স্বাতি বলল : এ কোন রহস্য নয়, বাস্তবকে সম্মান করছি। এমন করে কোন হোটেলে না থেকে ছোট একখানা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যেত, মিস্টার গিরি একটি কাঞ্ছী আর একজন বাহাদুর যোগাড় করে দিতে পারতেন। কিন্তু আমি হেঁসেলে ঢুকলেই তুমি আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে।

এখন বুঝি তোমার দিকে চেয়ে থাকবার সুযোগ দেবে!

স্বাতির চোখে ভর্ৎসনা দেখা গেল : খাটিয়ে নেব। যত দিন নিজে লিখতে না পার, তত দিন আমি তোমার হয়ে লিখব। যা বলবে তা সব টুকে রাখব এই খাতায়। বঙ্গের পুরাবৃত্ত দিয়েই শুরু কর, তারপরে বইএর পরিকল্পনা করা যাবে।

আমার মনের ভিতর একটা অদ্ভুত ভাব উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কোনরকমে তা গোপন করে আমি বললুম : জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—

স্বাতিও একমুহূর্ত চিন্তা না করে গুনগুন করে গেয়ে উঠল : তোমারে বাঁধতে পারে, সেই বাঁধন কি সবার আছে!

গানের কথাগুলো সে নিজের সুবিধা মতো বদলে নিয়েছিল। তাই দেখে আমি যোগ করলুম : আমি যে বন্দী হতেই সন্ধি করি তোমার কাছে।

সহসা গম্ভীর হয়ে স্বাতি বলল : বল এই বারে।

বঙ্গ দেশের কথা বলতে হলে প্রথমেই আর্য সভ্যতার বিস্তারের কথা বলতে হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণে আমরা দেখি যে খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগেও আর্য সভ্যতা ভারতের সপ্তসিন্ধব ও ব্রহ্মাবর্তে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী দুশো বছরে বিস্তৃত হয়েছিল গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকায়। পশ্চিমে অবন্তী ও সুরাষ্ট্রে এবং পূর্বে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গে এই সভ্যতা পৌছতে আরও পাচ ছশো বছর সময় লেগেছিল। খ্রীষ্টের জন্মের শোয়া তিনশো বছর পূর্বে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মেগাস্থিনিস যখন এ দেশে এসেছিলেন, বাঙলার তাম্রলিপ্তি ও বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণে মহারাষ্ট্র ও বিদর্ভে তখনও অনার্য অধিকার ছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে যাঁদের বিশ্বাস নেই, এ তাঁদের কথা। যাঁরা তা উপেক্ষা করতে পারেন না, তাঁরা অন্য কথা বলেন। রামায়ণের যুগেই যে বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতা প্রবেশ করেছিল এবং মহাভারতের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তা বিশ্বাস করার মতো উপকরণ এই গ্রন্থদ্বয়েই খুঁজে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে আমরা দেখি যে মিথিলায় আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদেঘ মাধব। আর রামায়ণে পাই যে অমূর্তরজা নামে চন্দ্রবংশের এক রাজা ধর্মারণ্যের নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। বর্তমান গৌহাটিতে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, আর এই রাজ্য উত্তর বঙ্গেও বিস্তৃত ছিল। পণ্ডিতেরা তাই অনুমান করেন যে শুধু মিথিলা আর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নয়, এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলেই আর্যসভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল।

শুধু এইটুকুই নয়, বঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে রামায়ণে। অযোধ্যাপতি দশরথ এক দিন তাঁর রাণীকে বলেছিলেন, সসাগরা পৃথিবীতে তুমি যা চাও, তাই আমি তোমাকে দেব—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশী কোশলাঃ॥

তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
তেতো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি ॥

অন্যান্য দেশের সঙ্গে বঙ্গেরও ঐশ্বর্যের উল্লেখ দশরথ করেছিলেন। বঙ্গ অনার্য দেশ হলে কি তিনি এ কথা বলতেন!

মহাভারতের কর্ণ পর্বে আমরা পৌণ্ড্র নামের সম্মানসূচক উল্লেখ দেখি। পৌণ্ড্র প্রভৃতি দেশের মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত ধর্ম সবিশেষ অবগত আছেন। পৌণ্ড্রদেশ ছিল উত্তরবঙ্গে, কাজেই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে উত্তরবঙ্গে আর্যসভ্যতার সঙ্গে বৈদিক ধর্ম আরও প্রাচীনকালে প্রবেশ করেছিল।

স্বাতি তার বাঁধানো খাতাখানা টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিল, এইবারে সেখানা আবার কাছে টেনে নিল। বলল : দাঁড়াও একটুখানি, একটা কলম নিয়ে আসি।

বলে তার নিজের ঘরে গিয়ে একটা কলম নিয়ে এল। খসখস করে আপন মনে লিখল অনেক কিছু, তারপরে বলল : বল।

কী বলব?

যা বলছিলে সেই কথাই বলবে।

বলে আবার সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকাল।

এবারে তাহলে বলি রাজার কথা বলতে হয়। ইনি অসুররাজ বলি নন, ইনি রাজা যযাতির অধস্তন ত্রয়োবিংশ পুরুষ, একজন পরম ধার্মিক ক্ষত্রিয় রাজা। তপস্যায় তিনি ঊর্ধ্বরেতা, কিন্তু তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই। একদিন গঙ্গায় স্নান করবার সময় তিনি দেখতে পেলেন যে নদীর স্রোতে এক অন্ধ ঋষি ভেসে যাচ্ছেন। ধার্মিক রাজা তাঁকে জল থেকে তুলে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর পরিচয় পেলেন। ঋষির নাম দীর্ঘতমা, গোধর্মে অনুরাগের জন্য ঋষির স্ত্রী ও পুত্রেরা তাঁকে ভেলায় বসিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। রাজা ভাবলেন, এ ভালই হল। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার পর থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ঋষিকে নিয়োগ করে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের রীতি সসম্মানে চলে আসছে। রাজাও অন্ধমুনি দীর্ঘতমাকে অন্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার কাছে পাঠালেন। একে একে রাণীর পাঁচটি পুত্র হল, তাদের নাম হল

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম। রাজা এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে নিজের রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের নামে এক একটি রাজ্য হয়েছিল। বলি তারপরে যোগমার্গ অবলম্বন করেছিলেন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই কাহিনী দিয়ে ভারতের পূর্বপ্রান্তে আর্যসভ্যতা বিস্তারের ইতিহাসই বলা হয়েছে। এ কথা মেনে নিলেই কাল নির্ণয়ের প্রয়োজন ওঠে। তারও একটি সূত্র আছে। রামায়ণের যুগে অঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন দশরথের সখা লোমপাদ, তিনি বলি-পুত্র অঙ্গের ষষ্ঠ পুরুষ। লোমপাদের প্রপৌত্রের নাম চম্প, তাঁর নামে রাজধানীর নাম হয়েছিল চম্পা। চম্পের প্রপৌত্র-পৌত্রের নাম বৃহন্নলা, তাঁর পুত্র বিজয় হরিবংশে ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর নামে বিখ্যাত। এই বিজয়ের প্রপৌত্র-পুত্র অধিরথ সূতবৃত্তি গ্রহণের জন্য ক্ষত্রিয় সমাজে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর কথা আমরা মহাভারতে পেয়েছি। কুমারী কন্যা কুন্তীর পুত্র কর্ণকে তিনি প্রতিগ্রহ করেছেন। বীর কর্ণ তাই সূতপুত্র বলে চিরকাল ধিক্কৃত হয়েছেন।

স্বাতি আমাকে বাধা দিয়ে বলল: রামায়ণের রাজা লোমপাদের সঙ্গে মহাভারতের অধিরথের সম্বন্ধ আছে জেনে আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু তোমার কথায় সময়ের ব্যবধান খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল না।

বললুম: সম্বন্ধটা তাহলে অন্যভাবে বলতে হয়। কথায় বলে চোদ্দপুরুষ, কর্ণে আর লোমপাদে সেই চোদ্দপুরুষের ব্যবধান। তার মানে, এ যুগের হিসাবে প্রায় পাঁচশো বছর। বলি রাজা আরও ছ-পুরুষ মানে দুশো বছর আগে। সাধারণ হিসাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল যদি সাড়ে চার হাজার বছর আগের ঘটনা ধরা হয় তো অঙ্গ-বঙ্গে পাঁচ হাজার বছর আগেও আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীম বেরিয়েছিলেন পূর্ব ভারত জয়ে। মগধ জয়ের পর এসেছিলেন অঙ্গে, তারপর পরাক্রান্ত পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজাকে যুদ্ধে নির্জিত করে বঙ্গরাজকে আক্রমণ করেছিলেন। রাজা সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করে তাম্রলিপ্ত কর্বট ও সুহ্মরাজকে জয় করেন। তিনি সাগরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছকেও জয় করেছিলেন।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। বর্তমানের বাঙলা দেশ তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাই বঙ্গ বললে গোটা বঙ্গদেশটাকে বোঝাবে না।

আমি বললুম : আরও একটু আপত্তি আছে।

আরও !

সবিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : এই শতাব্দীর গোড়ার কথাই ধর। বিহার ও উড়িষ্যাও বাঙলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাঙলা দুভাগ হয়েছিল বলে ১৯০৫ সালে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীন হলাম, তখন আবার বাঙলা দেশ দুভাগ হয়ে গেল। বাঙলা দেশ বললে এই খণ্ডিত বাঙলার দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে নাকি !

স্বাতি এ কথার কোন উত্তর দিল না। কোন উত্তর নেই। অনেক দিন আগে সেই রক্তপাত হয়েছিল। তখন তার বয়স কম ছিল, সেই রক্তাক্ত দিনের কথা আজ তার ভাল মনে নেই। বাঙলার বুক থেকে রক্তক্ষরণ আজও বন্ধ হয় নি। কোন দিন হবে কিনা তাও আজ অনুমান করা যাচ্ছে না। বললুম : যে বাঙলা এক দিন সারা ভারতকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, সে বাঙলা আর নেই। ভারতবাসীও আজ বাঙালীর ত্যাগের কথা ভুলে গেছে।

আবেগমুক্ত হবার জন্য স্বাতি আমাকে সময় দিল খানিকটা, তারপরে বলল : বাঙলার এই গৌরবময় অতীতকে যদি সবার চোখের সামনে তুলে ধরতে পার, তবেই তোমার লেখা সার্থক হবে।

বললুম : সে বড় কঠিন কাজ।

কঠিন বলেই দামী। বাঙলার অধঃপতনের কথা এখন সবার মুখে শুনতে পাই। সবাই বলে, কী ছিল আর কী হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল সে কথা কেউ বলে না। বাঙলা দেশ তো ডুবে যায় নি, বাঙালীও যায় নি মরে। আবার এ দেশ কেন সোনার বাঙলা হবে না !

নিশ্চয়ই হবে। দুর্দশা চরমে পৌঁছবার পরেই নূতন যুগের সূচনা হয়, সবাই সেই সুদিনের অপেক্ষাতেই আছে।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : এ তোমার থিওরির কথা। সত্যকে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজনকে মানুষ এইভাবে এড়িয়ে যায়।

হয়তো তাই।

হয়তো নয় গোপালদা, এইটেই সত্যি। ফাঁকি দিয়ে জীবন উপভোগ করা যায়, কিন্তু প্রাণ জাগানো যায় না ; একটা দেশ ধ্বংস করা যায়, কিন্তু কোন দেশ গড়া যায় না। ফাঁকি দিয়ে কোন বড় কাজই হয় না।

আমি হেসে বললুম : তুমি কি আমাকে দেশ গড়ার দায়িত্ব নিতে বলছ !

স্বাতি তৎপরভাবে উত্তর দিল : না। আমি তোমাকে নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার নিজের কাজ করতে বলছি। বাঙলা দেশ সম্বন্ধে যদি কিছু লিখতে হয় তো বাঙালীর সুখ-দুঃখ উত্থান ও পতন অতীত ও ভবিষ্যৎ যেন তোমার লেখায় সজীব হয়ে ওঠে। বাঙলার পাঠক যেন একটা দর্পণে তার আসল রূপটা দেখতে পায়।

স্বাতির আবেগ দেখে আমি হেসে ফেললুম, বললুম : বুঝেছি।

স্বাতি বলল : এ তো বোঝবার জিনিস নয় গোপালদা, এ অনুভবের জিনিস। বেদনার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নেই, আছে হৃদয়ের। সেইজন্যই তোমাকে সতর্ক হতে বলছি।

স্বাতি থামল খানিকক্ষণের জন্য, বোধহয় নিজেকে সংযত করে নিল এই সময়টুকুতে, তার পরে বলল : বঙ্গ নাম বাতিল করে দাও তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাঙালীর প্রাণের কথা বোলো।

বললুম : তাহলে তোমাকে আমি প্রথম বাঙালীর কথা বলি। শুধু হরিবংশে নয়, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁর নাম আছে। একটি স্মরণীয় নাম, যাঁর বীরত্বের জন্য বাঙালী আজও গৌরব করতে পারে।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে, বলল : অত প্রাচীনকালেও বাঙালীর নাম ছিল !

ছিল বৈকি ! বাঙালীরা যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও যোগ দিতে গিয়েছিল তার উল্লেখ আছে মহাভারতে। দুঃখের বিষয় এই বাসুদেব তখন জীবিত ছিলেন না। থাকলে তাঁর নামেও একটা মহাভারতের পর্ব হত, দুর্যোধন তাঁকেও সেনাপতি নির্বাচন করতেন।

স্বাতি বলল : বাসুদেব তো কৃষ্ণের নাম।

আমি পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা বলছি। পুণ্ড্র-দেশের রাজা বলে সে যুগে তাঁকে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলত। পুণ্ড্র ছিল উত্তরবঙ্গের মালদহ ও বগুড়া জেলা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বাসুদেব রাজা ছিলেন কিনা জানি নে, ভীম ঐ রাজ্য জয় করেছিলেন। কিন্তু তার অল্পদিন পরেই বাসুদেব এই অঞ্চলে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রায় সমগ্র বাঙলা দেশ জয় করে সমস্ত রাজাদের পদানত করেন। তারপরে বন্ধুতা করেন পূর্বভারতেব কয়েকজন প্রতাপশালী রাজার সঙ্গে। তাঁবা হলেন মগধের জরাসন্ধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরক ও নিষাদরাজ একলব্য। এঁদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল বলে মনে করা হয়।

কৃষ্ণ-বাসুদেবের কৌশলে জরাসন্ধ নিহত হয়েছিলেন, তারপরে তিনি নবককে বধ করেন। এই বন্ধু বিয়োগেব জন্য পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি এত ক্রুদ্ধ হন যে বাঙলা থেকে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণ-বাসুদেবেব রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিষাদরাজ একলব্য।

এই একলব্যের সম্পূর্ণ জীবনের কথা আমরা জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে ব্রাহ্মণবীর দ্রোণাচার্য তাঁকে অদ্বিতীয় বীর হবার সুযোগ থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বীর বালক মনে মনে দ্রোণাচার্যকে গুরু বলে বরণ করেছিলেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি বালকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চেয়ে নিয়েছিলেন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ। দ্রোণাচার্য চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্য অর্জুন হবে বিশ্বের অদ্বিতীয় বীর, একলব্যকে তাই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হবার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সম্যক পরিচয় আমরা পাই নে। কৃষ্ণ-বাসুদেবের চরিত্রে তখন দেবত্ব আরোপ করা হয়ে গেছে। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, এবং এই ভক্তি দিয়েই তিনি ব্রাহ্মণদের হৃদয় জয় করেছিলেন। পুরাণ-কারেরা তাই কৃষ্ণ-বাসুদেবকেই বড় করেছেন, পৌণ্ড্রক-বাসুদেবকে দেননি তাঁর প্রাপ্য সম্মান। তাঁরা বলেছেন যে তিনি কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন এবং সকলের সামনেই কৃষ্ণের নিন্দা করতেন, বলতেন, গোপের ছেলে কৃষ্ণ আবার কোন্ সাহসে বাসুদেব নাম নিয়েছে! শুনতে পাই, সে নাকি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বলে গর্ব করে। আমারও আছে শঙ্খ চক্র ধনু

খড়্গ ও গদা—এই অস্ত্রেই আমি তাকে জয় করব। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নাকি তাঁর অধীনস্থ রাজাদের এও বলতেন যে তাঁকে শঙ্খচক্রগদাধর না বললে, তাঁদের শত-ভার স্বর্ণ ও ধান্য দণ্ডবিধান করবেন।

পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নিজেকে বিষ্ণুর অবতার মনে করতেন, না সেযুগের বাঙালী রাজা ও প্রজারা তাঁকে কৃষ্ণ-বাসুদেবের চেয়ে বড় মনে করতেন, তা নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নয়। দেবতার দোষ যেমন আমরা দেখি নে, তেমনি দেবতাদের সঙ্গে যারা বিরোধ করেছে তাদের গুণও আমাদের চোখে পড়ে না। কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ না হলে বোধহয় পৌণ্ড্রকের চরিত্র যথাযথ চিত্রিত হত। তবু তিনি অসাধারণ বীর ও ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলে হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে প্রশংসা পেয়েছেন।

স্বাতি বলল ঃ তারপরে কী হল বল।

প্রাগজ্যোতিষপুরে নরককে বধ করে কৃষ্ণ তাঁর ষোল হাজার অন্তঃপুরিকা নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যাবার পর পৌণ্ড্রক এই সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে আট হাজার রথ অযুত হাতি ও প্রায় অর্বুদ পদাতিক বীর বাঙালী সেনা নিয়ে কৃষ্ণকে ধ্বংস করবার জন্য ভারতের আর এক প্রান্তে গিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করলেন। যে দুঃসাহসের সঙ্গে বাঙালী বীরেরা সেদিন যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল তার অপূর্ব কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যাদবেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পৌণ্ড্রকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃতবর্মা উগ্রসেন উদ্ধব অক্রূর নিশধ সারণ প্রভৃতি মহারথীরা পরাজিত ও আহত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তখনও যুদ্ধ করতে আসেন নি, সকলের শেষে এসেছিলেন সাত্যকি। দিনের শেষে সাত্যকির সঙ্গে পৌণ্ড্রকের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সাত্যকিও আহত হলেন। তখন এলেন কৃষ্ণ। সারাদিন একা যুদ্ধ করে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন। তবু লড়েছিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে। আর কৃষ্ণ তাঁর বীর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন তাঁর দুঃসহ ধৈর্যের। দুই বাসুদেবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল, আর এই যুদ্ধেই নিহত হয়েছিলেন বাঙালী বাসুদেব। দ্বারকার লোকে বাঙালীর বীরত্বের কথা অনেকদিন মনে রেখেছিল।

৭

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন দার্জিলিঙের গৃহ-দেবতা। কখনও মেঘাবৃত, কখনও রৌদ্র-করোজ্জ্বল। সারাক্ষণ সকলে এই দেবতার দর্শনের জন্য লালায়িত। পিছনের বারান্দায় বসে আমরাও কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখছিলুম।

স্বাতি কী ভাবছিল সেই জানে, হঠাৎ বলে উঠল : তোমার সঙ্গে যে এখানে এমন করে দেখা হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি ভেবেছিলে ?

আমি স্বপ্নে ভাবি নি, কিন্তু সত্যিই ভেবেছিলুম।

স্বাতি চমকে উঠল, বলল : কেন ?

বললুম : দেখা আমাদের হতই, কিন্তু আমাদের এই দেখাটা একটু অন্য রকম হবে বলে জানতুম। ভাল করে দেখা হবার পর সবাই পাহাড়ে আসে, কিন্তু পাহাড়েই আমাদের ভাল করে দেখা শোনা হল দেখছি।

স্বাতি বলল : তোমার হেঁয়ালি আমার ভাল লাগে না।

আমি বললুম : সোজা কথায় বললে যে তোমার কাছে অশ্লীল মনে হবে।

স্বাতি আমাকে থামিয়ে দিল, বলল : এ আলোচনা থাক, তুমি তোমার নিজের কথা বল। কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার পর কোথায় কী করেছিলে সেই কথা।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : প্রথমে কেঁদেছিলুম।

খিল খিল করে স্বাতি হেসে উঠল, বলল : কেন ?

মনে হয়েছিল যে তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

তাই মনে হলে তো তুমি অনেক বড় কাজ করে ফেলতে। আমরা কেঁদেছিলাম তুমি কাঁদছ না দেখে।

আমি হেসে বললুম : তবে এসো, এবারে আমরা সুর মিলিয়ে কাঁদি।

স্বাতিও হেসে বলল : তার আগে তোমার গল্প বল। তত্ত্বকথা অনেক শুনেছি, এবারে হাল্কা কিছু বল।

সহসা আমার ইভার কথা মনে এল। গৌহাটিতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমাদের অফিসেই সে কাজ করত, আর

অফিসের ম্যানেজার মিস্টার বড়ুয়া তাকে আমার কাছে এগিয়ে দিয়েছিলেন। শিলঙেও সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল, কয়েকটা দিন কাটিয়েছিল আমার সঙ্গে। কামরূপের কথা বলতে হলে তার কথা কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না। গৌহাটি ছাড়বার সময়েও সে আমাকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিল। বললুম : তোমার সঙ্গে দেখা হল বলেই এখনও স্থির হয়ে আছি। তা না হলে ইভার জন্যে মন আমার ছটফট করত।

ইভা কে সে কথা স্বাতি জিজ্ঞাসা করল না, বলল : শম্পার কথা বুঝি ভুলে গেছ!

শম্পা!

বলে আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। তারপরেই শম্পার কথা মনে পড়ে গেল। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কাশ্মীরে, কিন্তু সে পরিচয় অন্তরঙ্গ হয় নি, আমি তার কাছ থেকে দূরে থাকতেই চেয়েছিলুম।

স্বাতি বলল : এত শিগগির তার কথা ভুলে গেলে!

আমি বললুম : ইভা আমাকে সবার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

কোন পাহাড়ী মেয়ে তো! ওরা ঐ রকমই। এখানে একটা কাঞ্চীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, দুদিনে তুমি ইভার কথাও ভুলে যাবে।

বলে স্বাতি প্রসঙ্গান্তরে চলে এল, বলল : গৌহাটি থেকে কোথায় এসেছিলে সেই কথা বল।

আমি সংক্ষেপে বললুম : কুচবিহারে।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি তার প্রশ্ন জানি, কিন্তু সে আমাকে তার প্রশ্নের কথা জানাতে চায় না। মামা উপস্থিত থাকলে আমাকে ধমক দিয়ে বলতেন, চুপ করে রইলে কেন, বল কী দেখেছ সেখানে। আর স্বাতি সকৌতুকে হাসত এই কথা শুনে। আজ আমি বললুম : কুচবিহারের কথা বলতে হবে বুঝি!

স্বাতি বলল : তোমার সঙ্গে কুচবিহারের একটা সম্পর্ক আছে বলে শুনেছি।

আমি চমকে উঠলুম : কে বলেছে! মামাবাবু!

স্বাতির হাসি এখন রহস্যে ভরা, বলল : বল এইবারে।

কুচবিহারের নামে আমার আজও রোমাঞ্চ হয়। আমার জন্মভূমি,

মাতৃভূমি নয়, পিতৃভূমি। কনৌজ থেকে এসে আমার পিতৃপুরুষেরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। আমার সঙ্গে কুচবিহারের সম্পর্ক বোধহয় ঘুচে গেছে, কিন্তু নাড়ির সম্পর্ক যে ঘোচে না তা এই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলুম।

দীর্ঘ দিন পরে এসেছিলুম কুচবিহারে। কিন্তু শৈশবের স্বপ্নের কুচবিহার আর নেই। বাঙলার আর পাঁচটা শহরের সঙ্গে তার প্রভেদ গেছে কমে। শহরের বৈশিষ্ট্য আর চোখে পড়ে না, তার বদলে জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে পড়েছে। ভালো লাগে নি কুচবিহারকে, একদিন বেশি ভাল লেগেছিল বলেই বোধহয় এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে মনে একটা বেদনা বোধ করেছিলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, বলল: চুপ করে রইলে যে!

আমি বললুম: লোকে বলে তোমার সঙ্গেও আমার একটা সম্পর্ক আছে। কী সম্পর্ক বলতে পার?

স্বাতি এক মুহূর্ত ইতস্তত করল না, বলল: যে সম্পর্ক সব চেয়ে মধুর তাই, সম্পর্ক না থাকার সম্পর্ক।

অথচ কিছুতেই তা ছিন্ন করা যায় না, তাই না!

স্বাতি হেসে বলল: কুচবিহারের প্রসঙ্গটা তুমি বারে বারেই এড়িয়ে যাচ্ছ।

তার যে উপায় নেই তা আমি জানি। ভাবছিলুম অন্য কথা। কুচবিহারের কথা কি হাল্কা হবে!

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল: ঐ দেখ, হাল্কা জমে জমে কেমন ভারি হচ্ছে। বেশ লাগে ঐ ভারি মেঘ দেখতে। কিন্তু হঠাৎ ঐ ভারি মেঘ এসে আকাশটা ছেয়ে ফেললে কি ভাল লাগত।

স্বাতির কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুন। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ধোঁয়ার মতো হাল্কা মেঘ উঠছিল। সে মেঘে যে আকাশ এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তা দেখতে পাই নি। কথায় কথায় উজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘাও কখন্ ঢেকে গেছে। আমি একবার প্রকৃতির এই রূপ দেখলুম, তারপরে ফিরে এলুম নিজেদের কথায়। বললুম: বুঝেছি।

তারপরে তাকে কুচবিহারের কথা শোনালুম।

কুচবিহারে একটা কনফারেন্স ছিল। আমাদের ফার্মের প্রতি-নিধিরা উড়োজাহাজে না এসে বড় লাইনের গাড়িতে এসেছিলেন। নূতন লাইন খোলা হয়েছে। ফারাক্কায় গঙ্গা পার হয়ে দার্জিলিঙ মেলে না চেপে একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়িতে চেপে এলে তুপুর বেলাতেই কুচবিহার পৌঁছনো যায়। এতে আমাদের সুবিধা কত হল, কর্তারা তাও দেখে এলেন। শীঘ্রই এক্সপ্রেস ট্রেন চলবে, তখন পৌঁছনো যাবে সকালবেলায়। আমিও গৌহাটি থেকে ট্রেনে এসেছি। রাতের আহার সেরে ট্রেন ধরেছিলুম, ভোরবেলায় আলিপুরতুয়ার জংসনে গাড়ি বদল করে সকাল দশটায় পৌঁছেছি এখানে। যখন শুনলুম যে কর্তারা তুপুরবেলায় এসে পৌঁছবেন, তখন অফিসে বসে না থেকে শহরটা একবার ঘুরে দেখে নিয়েছিলুম।

প্রথমেই গিয়েছিলুম মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুর বলতে আমরা মদনমোহন ঠাকুরকেই জানতুম। অনেক প্রণাম করেছি এই ঠাকুরের পায়ে। দক্ষিণ-ভারতে বেড়াবার সময় মন্দিরে মন্দিরে যাত্রীদের ভিড় দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম। কিন্তু শৈশবে আমরাও যে বড়দের সঙ্গে এই ঠাকুরবাড়িতে বেড়াতে আসতুম তা যেন ভুলে গিয়েছি। মদনমোহনের মন্দির আমরা বলিনে, দেখতে যেন মন্দিরের মতো নয়। চারিদিকে নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় এলাকায় পাশাপাশি অনেক দেবতা আছেন, মাঝখানে গম্বুজওয়ালা এক গৃহে মহারাজার কুলদেবতা মদনমোহন। কালী আছেন তারা আছেন পাশাপাশি. আর খানিকটা তফাতে এক স্বতন্ত্র মন্দিরে আছেন ভবানী। কোন এক রাজা স্বপ্ন দেখেছিলেন ভবানীকে, সেই মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে এখানে। তুর্গাপূজোর সময় দেবীবাড়িতে মহারাজার যে পূজো হত, সেই বিরাট মূর্তি হত ভবানীর মতো। মহিষাসুরকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছে বাঘ আর সিংহ। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ নেই। সামনে শুধু জয়া আর বিজয়া। আর কী তফাৎ ছিল এখন আর তা মনে নেই। এই মদনমোহন বাড়িতেও তুর্গাপূজো হত, তার জন্য আলাদা মণ্ডপ আছে তফাতে।

মন্দিরে প্রবেশের আগে ফটকের সামনে একবার থমকে দাঁড়ালুম।

লাল সুরকির রাস্তা এখন কালো পিচ দিয়ে বাঁধানো। দুধারের পামগাছগুলো যেন আরও বড় হয়েছে, আরও বেশি ছায়া ফেলেছে পথের উপরে। সামনের বৈরাগী-দীঘির জল কিন্তু আগের মতো টলটলে নয়। স্কুলের মাঠে জলকাদার ভেতর ফুটবল খেলে বাড়ি ফেরার পথে আমরা এই দীঘির বাঁধানো ঘাটে স্নান করতুম। বড শীতল স্বচ্ছ জল ছিল, চারিদিক পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। পথের ওধারে গিয়ে আমি ভাল করে তাকালুম জলের দিকে। না, সেই মনোরম পরিবেশ বুঝি আর নেই, যত্নের অভাব দেখছি সর্বত্র।

ফিরে এসে আমি ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলুম। প্রাঙ্গণে তখন কোন যাত্রী নেই, কোন বাজনা বা ঘণ্টাধ্বনিও নেই। মহারাজার আমলে এখানে প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজত, দূর থেকেও আমরা সেই সুর শুনতে পেতুম। এখন নহবতের সময় নয়, নহবৎ এখন বাজে কিনা তা জানি নে।

একটি উৎসবের কথা আমার মনে পড়ল। মদনমোহনের রাস। এই উৎসব উপলক্ষে মেলা বসত লাইনের মাঠে। এত বড় উৎসব আমরা দেখি নি, ভাবতুম এর চেয়ে বড় উৎসব আর হতে পারে না, দশ দিন ধরে উৎসব হত, তারপরে বাড়ানো হত কয়েক দিন। নানা জায়গা থেকে নানান জিনিসের দোকান আসত, সার্কাস বায়স্কোপ মীনাবাজার। দুধার থেকে স্পেশাল ট্রেন যযাতায়াত করত, গরুর গাড়িতে পায়ে হেঁটে আসত গ্রামান্তরের লোক। উৎসবের কয়েক দিন এই রাজ্যের কারও চোখে যেন ঘুম নেই। রাত জেগে আমরাও যাত্রা দেখতুম এই ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে।

চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, পাঁচিলের ধারে ছোটে ঘরগুলি আজও আছে আগের মতো, মাঝে মাঝে পুরনো পুতুল আজও দুএকটা দেখতে পাচ্ছি। রাসের অনেক আগে থেকে সাজ-সজ্জা শুরু হত। মহারাজার আশ্রিত শিল্পীরা লেগে যেত পুতুল গড়ার কাজে, পুরনো পুতুলও রঙ করে নতুন করা হত। রামায়ণ মহাভারত আর শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী নিয়ে এক একটি সুন্দর দৃশ্য সাজানো হত এই সব ছোট ঘরগুলির ভিতর। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতুম। পুরনো পুতুল সব কিনতুম,

আর নতুন পুতুল দেখলে আনন্দে লাফিয়ে উঠতুম। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পুকুর ছিল, সেখানে প্রতি বছর নতুন পুতুল সাজানো হত জলের উপরে, আর এই নতুন জিনিসটি দেখবার জন্যে ভিড় হত সবচেয়ে বেশি। যা কোন দিন বদলাত না তা হল একটি বিরাট পুতনা রাক্ষসী আর একটি সাদা কাগজের তৈরি উচু 'রাস'। আমরা তার হাতল ধরে ঘোরাতুম, সবাই ঘোরাত, আর সারাক্ষণ তার শব্দ হত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। সেই শব্দটিও যেন আমি শুনতে পেলুম।

আমি মদনমোহনকে প্রণাম করলুম, প্রণাম করলুম কালী তারা ভবানীকে। এই ঠাকুরবাড়ির পিছনে আছে ব্রহ্মচারী কালীবাড়ি। সেখানে গিয়েও কালীকে প্রণাম করলুম। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে কুচবিহারে রাসের উৎসব এখনও হয়, তবে তার জাঁক-জমক ও আনন্দ কোলাহল আগের চেয়ে কমে গেছে। উৎসবের সময় এ রাজ্যের প্রজাদের প্রাণের স্পন্দন আর শুনতে পাওয়া যায় না।

শহরে দোকান পাট বেড়েছে অনেক, বাজার আগের চেয়ে ঘন হয়েছে, হোটেল রেস্টরেণ্ট হয়েছে, পাকা সিনেমা হাউসও হয়েছে। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা বাড়ে নি, পরিবেশে যে শান্তি ছিল তা নষ্ট হয়েছে।

আমাদের প্রিয় বেড়াবার জায়গা সাগর দীঘির ধারে গিয়ে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। জলে আর সে স্বচ্ছতা নেই, চারিদিকের ঘাস বড় হয়ে উঠে একটা গভীর অযত্নের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এমন সুন্দর একটা সরোবর আর কোথায় আছে আমি জানি নে। মস্ত বড় দীঘি, চারিদিকে সুন্দর সরল রাস্তা, তার ধারে ধারে সরকারী অফিস আদালত ট্রেজারী কাউন্সিল ছাপাখানা আর পাশাপাশি দুখানা সুন্দর দোতলা বাড়ি—প্রিন্স ভিক্টরের বাড়ি আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। একটায় রাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ থাকতেন, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাঙালী ঘরের মেয়ে, আর একটায় মহারাজার লাইব্রেরি ছিল আর হলঘরে সভা-সমিতি কলানুষ্ঠান হত। এখানে সেখানে নতুন বাড়ি হয়েছে অনেক, কিন্তু পুরনো বাড়ির সঙ্গে মিল রেখে হয় নি বলে বেয়াড়া বেমানান দেখাচ্ছে। ঠিক এমনি বেয়াড়া দৃশ্য দেখলুম জেনকিন্স স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজ এলাকায়। একটা বিরাট

এলাকায় এই বাড়ি দুটি দেখলে একই প্রতিষ্ঠান মনে হত, স্কুল কলেজ সংলগ্ন দুটি ফুটবল খেলার ময়দানও ছিল। প্রয়োজন বোধে স্কুল ও কলেজের ঘর বাড়ানো হয়েছিল, পাকাবাড়ির উপরে টিনের ছাদ। কিন্তু আগন্তুকের দৃষ্টিকে তা কখনও পীড়া দেয় নি। এবারে যে নূতন গৃহ নির্মিত হয়েছে তা নিতান্তই আধুনিক। এই পরিবেশে যে ঐ রকমের গৃহ নিতান্তই বেমানান হবে সে কথা কেউ চিন্তা করেন নি।

জয়পুরের কথা আমার মনে পড়ল। পুরনো জয়পুরে সমস্ত ঘর-বাড়ি একটা বিশেষ ধরণে নির্মিত, তার রঙ লাল, তার আবেদন একরকম। জয়পুর বাড়াবার প্রয়োজন যখন হল তখন সরকার পুরনো জয়পুরের সৌন্দর্য নষ্ট হতে দিলেন না, নতুন ঘরবাড়ি নতুন কায়দায় তৈরি হল স্বতন্ত্র পাড়ায়। সে এলাকাও সুন্দর হয়েছে।

স্কুলের পিছনে আর একটি দীঘি আমাদের প্রিয় ছিল, তার নাম চন্দন দীঘি। এই দীঘির একপাশে সুন্দর হাসপাতাল, আর এক পাশে পোস্ট অফিস। আর একটু এগিয়ে লালদীঘি, তার অপর পারে বাজার এলাকা শুরু হয়েছে। এই শহরে ছোট বড় আরও অনেক দীঘি আছে, তার জল সারা বছর টলটল করত।

একটি সুন্দর উদ্যান ছিল এই অঞ্চলে, তার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ পার্ক। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে বেড়াতে যেতুম। আর একটি বাগান আমাদের প্রিয় ছিল। তোর্ষা নদীর ধারে সেই বাগানের নাম মহারাণীর বাগান, সরকারী নাম কেশবাশ্রম। শুধু উদ্যান নয়, এর ভিতরে ছিল মহারাজাদের সমাধি। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের নামে কেশবাশ্রম। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের মহিষী, বর্তমান মহারাজার পিতামহী তিনি। দেশে ও বিদেশে শিক্ষালাভ করে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁর রাজ্য ও রাজধানীকে নূতন করে গড়েছিলেন। আমরা এই উদ্যানের পাশ দিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম।

নদীর নাম তোর্ষা, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী এখানে অনেক স্থির ও প্রশস্ত, শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে। কয়েক মাইল দক্ষিণে তিস্তার সঙ্গে মিলছে। কিছুদিন আগে এই নদী রাক্ষসীর রূপ ধারণ

করেছিল, শহরের অনেকটা অংশ গ্রাস করে নিয়েছে। অনেক পুরনো ঘরবাড়ি এখন আর নেই। নদী এখন যেন শহরের ঘাড়ের উপর দিয়ে বইছে, তার তীরে উঁচু বাঁধ, লোকে সেই উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। গাড়িঘোড়া চলে না, সে ব্যবস্থা হলে নদীর তীর একটি মনোরম বেড়াবার জায়গায় পরিণত হবে।

আমাদের মাস্টার মশায়ের বাড়ি ঐ বাঁধের ধারে। স্কুলে আমরা আরও অনেকের কাছে পড়েছি, কিন্তু মাস্টার মশাই বলে ভক্তি করতুম একজনকেই। তিনি আমাদের ভালবাসতেন, আর অনেকেরই মনেব মধ্যে সাহিত্য-প্রীতির বীজ বপন করে দিয়েছিলেন অজ্ঞাতসারে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা তাঁর বাড়িতে এসে বসতুম। তখন নদীতে বাঁধ ছিল না, তার স্রোতের ধারা তখন অব্যাহত ছিল। আর মাস্টার মশায়ের বাগানে ছিল নানা জাতের সুগন্ধি ফুল। বাতাস আসত নদীর দিক থেকে, তার সঙ্গে কেশবাশ্রমের ফুলের গন্ধও ভেসে আসত। সেই পরিবেশেই আমরা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের জন্য তাঁরই কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলুম।

স্বাতি এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, এইবার বাধা দিল, বলল: মাস্টার মশায়ের কথা তুমি আমাকে বলো নি।

কিন্তু তাঁর নাম আমি কারও কাছে গোপন করি নি। আমার কালিন্দী পর্ব উৎসর্গ করেছি তাঁর নামে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: শুধু আমি নয়, মাস্টার মশায়ের অনেক ছাত্র কলম ধরেছে। তারা কেউ তাঁকে আমার চেয়ে কম শ্রদ্ধা করে না। কুচবিহার ছাড়বার আগে আমি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসলে সেই মানুষের কথা সাহিত্যে পরিণত হবে। হৃদয় দিয়েই পাওয়া যায় হৃদয়।

আকাশের রঙ তখন বদলাচ্ছে। রূপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা কখন মেঘের আড়ালে চলে গেছে তা খেয়াল করি নি। খানিকক্ষণ আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

কুচবিহারের নাম ছিল না ভারতের প্রাচীন মানচিত্রে। কামতাপুর নামে একটি নাম স্বল্পকালের জন্য দেখা দিয়ে চিরকালের মতো মুছে গেছে। এই কামতাপুর বর্তমান কুচবিহারের একাংশে অবস্থিত ছিল। মধ্য যুগের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রবল পরাক্রান্ত বলে পবিচিত ছিল।

কেউ বলেন যে কামতাপুর বাজ্যেব প্রতিষ্ঠাতা হলেন নীলধ্বজ, কেউ বলেন যে তা নয়। নীলধ্বজের পূর্বেও এই কামতাপুরের নাম পাওয়া যায়। নীলধ্বজ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেব মানুষ, আর দুর্লভনারাযণ নামে একজন রাজা বোধহয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁব রাজ্য উত্তর বাঙলার করতোয়া নদী থেকে আসামের বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্লভ-নারায়ণ ঐতিহাসিক রাজা কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে।

কামতাপুরের নীলধ্বজ ও চক্রধ্বজ সম্বন্ধেও অনেক লৌকিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। তবে ইতিহাস এই কথা মেনে নিয়েছে যে এঁরা ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ। খেন নামে একটি আদিম পার্বত্য জাতি শক্তি সঞ্চয় করে এই অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত হয়েই রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। এই বংশের তৃতীয় ও শেষ রাজার নাম নীলাম্বর। ইনি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বাজা। বাঙলার সুলতান হুসেন শাহর সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—১৪৯৮ থেকে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেই যুদ্ধেই কামতাপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

স্বাতি বলল : একটা শতাব্দীর ইতিহাস কি এত সংক্ষেপে বলা যায়?

আমি বললুম ঃ এর বেশি বলতে হলে প্রচলিত প্রবাদের কথা বলতে হবে।

তাই বল।

বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আকাশের আলো তখনও মিলিয়ে যায় নি। মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়েছে চারিদিক। গরম নেই, শীতার্তও নয় বাতাস। এমন দিনে বুঝি অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু যা বলা উচিত তা কিছুতেই বলা যায় না।

স্বাতি বলল ঃ চুপ করে রইলে যে!

আমি আমার ভাবনার কথা গোপন করে গেলুম। বললুম ঃ গুরুজন-কথা চরিত্র নামে অসমিয়া ভাষার একখানি কাব্যগ্রন্থে দুর্লভ-নারায়ণ একজন পরাক্রান্ত রাজা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। গৌড়েশ্বর ধর্মনারায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর এক রাত্রে উভয়েই এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখে মিত্রতা স্থাপন করেন। ধর্মনারায়ণ তাঁর দলের সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থকে রেখে গৌড়ে ফিরে যান। এঁদের মধ্যে প্রধান বারোজনকে রাজা দুর্লভনারায়ণ বারো ভূঞা উপাধি দিয়েছিলেন। শিরোমণি ভূঞা উপাধি দিয়েছিলেন চণ্ডীবর নামে সবচেয়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান একজন কায়স্থকে। চণ্ডীবর দেবীর পূজারী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে দেবীদাস বলত। চণ্ডীবরের পুত্রের নাম রাজধর, আসামের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক শঙ্কর দেবের পিতামহ তিনি।

স্বাতি বলল ঃ এই তো ইতিহাসের কথায় এসে গেলে!

বললুম ঃ গুরুজন-কথা চরিত্র তো ইতিহাস নয়, তাই একে ইতিহাস বলব না। একে ইতিহাস বললে নীলধ্বজের রাজা হবার গল্পকেও ইতিহাস বলতে হয়, আর গোসানিমারির কাহিনীকেও তাহলে গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

স্বাতি কোন প্রশ্ন করল না, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের কৌতূহল আমাকে জানিয়ে দিল।

বললুম: প্রথমে নীলধ্বজের গল্প বলি। নীলধ্বজের জন্ম পবিচয় আমাদেব জানা নেই। কেউ বলে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীর গর্ভে তার জন্ম। কেউ বলে, বালক বয়সে সে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিল। ভারি দুষ্টু ছেলে, কাজে তার মন ছিল না একটুও। গরু চরাতে নিয়ে গিয়ে অপরের শস্যক্ষেত্রে গরু ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে শুয়ে শুয়ে ঘুমোত, আব গরুর পাল তছনছ করত তাদের ক্ষেত খামাব। একদিন সবাই এসে নালিশ কবল ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণ ব্যাপাবটা নিজে দেখতে বেরলেন।

দুপুবেলায় চারিদিকে কাঠফাটা রোদ। একটা গাছেব ছায়ায় তাঁর বাখাল বালক পরমসুখে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু ওটা কী! ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে একটা বিরাট সাপ তার মাথার উপরে ফণা ধরে আছে। একফালি রোদ এসে পড়ছিল বালকের মুখের উপরে, সাপটা তাব ফণা দিয়ে সেই রোদটুকু আড়াল করেছে। ভয় পেয়ে ব্রাহ্মণ পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সাপটাকে সবে যেতে দেখেই পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন।

এইবারে বালকের পায়ের দিকে তাঁর নজর পড়ল। চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ। শুধু অষ্টদল পদ্ম নয়, ত্রিশূল ঊর্ধ্বরেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ আছে তার পদতলে। আদর করে ব্রাহ্মণ তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন, বললেন, আর তোমাকে গরু চরাতে হবে না, কোন ছোট কাজও করতে হবে না তোমাকে। তাব পরে একদিন তাকে ডেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে কোনদিন রাজা হলে ব্রাহ্মণকে সে তার মন্ত্রী করবে।

পরিণত বয়সে সেই বালক এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। কামরূপের রাজা ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীকে জয় করে তিনি কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন। সসম্মানে তাঁর

প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করে রাজ্যের নাম দেন ব্রাহ্মণ রাজ্য। নিজে নাম নেন নীলধ্বজ।

কামতাপুর ছিল তাঁরই রাজ্যের রাজধানী। কেউ বলেন যে তিনিই পত্তন করেছিলেন এই নূতন নগর, কেউ বলেন যে ,তা নয়, কামতাপুর নামে একটি ছোট শহর আগে থেকেই ছিল, সেই জায়গাতেই তিনি রাজধানী স্থাপন করে তার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনিই নির্মাণ করেছেন কামতাপুরের দুর্গ এবং কমতেশ্বর নীলধ্বজ নামে নিজের পরিচয় দিতেন।

স্বাতি বলল : এই রকমের প্রবাদ বোধহয় আরও শুনেছি।

বললুম : আশ্চর্য নয়। এ একটা প্রিয় প্রবাদ। কোন নিদ্রিত বালকের মাথায় সাপের ফণা দেখলেই লোকে বুঝত যে সেই অজ্ঞাত কুলশীল বালক এক সময় রাজা হবে। আর—

বল।

দুগ্ধবতী গাভী যখন দল থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন পাথরকে তার দুধ দিয়ে স্নান করায়, তখন বুঝতে হয় যে সে পাথর সাধারণ পাথর নয়, সয়ম্ভু শিবলিঙ্গ বিশ্বের কল্যাণের জন্য আত্মপ্রকাশ করছেন।

এ রকমের গল্পও শুনেছি।

এবারে তাহলে যা শোন নি তাই বলি। অনেকে বলেন যে কামতাপুর নাম হয়েছিল কমতেশ্বরী দেবীর নামে। পুরাকালে এই দেবী ছিলেন নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেকে আবার এ কথা মানেন না, তাঁরা বলেন যে কমতেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নীলধ্বজের পুত্র রাজা চক্রধ্বজ। কামরূপের রাজা ভগদত্তের কবচ আছে এই দেবীর দেহের অভ্যন্তরে। সেও এক অলৌকিক কাহিনী।

রাজা চক্রধ্বজ একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভগদত্তের কবচ হস্তিনাপুরে পড়ে আছে। কেমন করে এই কবচ উদ্ধার করতে হবে, তাও তিনি স্বপ্নেই জানলেন।

তারপরে উদ্ধার করে আনলেন সেই কবচ। দুর্গের মধ্যে চক্রধ্বজ এক মন্দির নির্মাণ করলেন। স্বপ্নে যে দেবীর মূর্তি দেখেছিলেন, সেই মূর্তি নির্মাণ করে কবচ রক্ষা করলেন তার ভিতরে। তারপরে মন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা করে স্বপ্নলব্ধ পূজাপদ্ধতিতে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করলেন। এই দেবীই কমতেশ্বরী দেবী। কামতাপুর দুর্গের উত্তরাংশের এক বৃহৎ স্তূপ নাকি এই মন্দিরেরই ভগ্নাবশেষ।

স্বাতি বলল: কবচ এমন কী জিনিস যে তাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে!

আমি বললুম: সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে কমতেশ্বরী দেবী ভগদত্তের বাহুর কবচে অবস্থান করতেন।

স্বাতি বলল: তুমি নিশ্চয়ই এসব জায়গা দেখে এসেছ?

আমি বললুম: না। আমার শৈশব কেটেছে কুচবিহারে। কিন্তু এসব কথা তখন জানতুম না। কামতাপুরের নাম পড়েছিলুম স্কুলের পাঠ্য ইতিহাসে, আর গোসানিমারি নামে আর একটি জায়গার নামও শুনেছিলুম। দিনহাটা শহরের নিকটে এই স্থান, পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে তখন যেতে হত। যেতও অনেকে, গোসানিমারির দেবী আর একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তারা দেখে আসত। কিন্তু সে যে কমতেশ্বরী দেবী আর কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ, তখন তা জানতুম না।

কিন্তু এখন লোকে যে মন্দিরটি দেখে তা কমতেশ্বরীর প্রথম মন্দির নয়। মুসলমানেরা নাকি মন্দির ধ্বংস করে দেবীর মূর্তিও বিনষ্ট করে যায়। ভগদত্তের কবচটি নাকি একটি পুকুরে পড়েছিল, কিন্তু লোকে সে কথা জানত না। দীর্ঘদিন পরে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তা খুঁজে পাওয়া যায়।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: জেলের জালে উঠল বুঝি!

হেসে বললুম: উঠল না, জলের নিচে জালটাই গেল আটকে। অনেক টানাটানি করেও সে জাল আর টেনে তোলা গেল না।

কুচবিহারে তখন মহারাজা প্রাণনারায়ণের শাসনকাল। তার মানে দুশো বছরেরও বেশি গত হয়েছে। চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বরের সময় মুসলমানরা ধ্বংস করেছিল কামতাপুর। তারপরে বিশ্বসিংহ নতুন রাজবংশ স্থাপন করেছেন কুচবিহারে। প্রাণনারায়ণ সেই বংশের চতুর্থ রাজা। কবচের কাহিনী তিনি জানতেন এবং জেলেদের কাছে এই খবর পেয়ে কবচের কথাই তাঁর প্রথম মনে এল। পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এক ব্রাহ্মণকে হাতির পিঠে চড়িয়ে কবচ উদ্ধারে পাঠালেন। পুকুরের ধারে পৌঁছে সেই ব্রাহ্মণ জলে ডুবলেন, জলের ভিতর কবচে তার হাত ঠেকল। কোন রকমে সেই কবচ তিনি টেনে তুললেন, তারপর হাতির পিঠে চেপে বললেন, চল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কোথায়?

যেদিকে হাতির মন চায়। পণ্ডিতরা এই কথাই স্থির করেছিলেন যে হাতি নিজের ইচ্ছামতো চলে যেখানে থামবে, সেইখানেই কবচের প্রতিষ্ঠা হবে, নতুন মন্দির নির্মিত হবে সেইখানে। হাতি কুচবিহারের দিকে গেল না, চলল শিঙ্গিমারি নদীর তীর ধরে প্রাচীন কামতাপুরের দিকে। পুরনো মন্দিরের দিকেও হাতি গেল না, পুরনো নগরের সীমানা পেরিয়ে থামল গোসানিমারি নামে একটা গ্রামে। তারপরে আর কিছুতেই নড়ল না। পূর্বের সিদ্ধান্তমতো রাজা সেইখানেই মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। নতুন করে দেবীর প্রতিষ্ঠা হল, তাঁর দেহের অভ্যন্তরেই আবার ভগদত্তের কবচ রক্ষিত হল। গোসানিমারির যাত্রীরা আজও এই মন্দিরই দেখে, পূজা করে এই দেবীরই।

কিন্তু দেবীর গল্পের শেষ হয় না এইখানে। তাঁর সম্বন্ধে আরও একটি অলৌকিক কাহিনী আছে।—

মহারাজা প্রাণনারায়ণ একজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে দেবীর পূজারী নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণকে পূজারী নিযুক্ত কর, আগে তারাই

আমার পূজা করত। মহারাজা তাই করলেন। তারপর তিনি এই পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে খবর পেলেন যে দেবী প্রতি রাত্রে তাঁর মন্দিরের মধ্যে নগ্ন হয়ে নৃত্য করেন। দু চোখ বেঁধে তাঁকে আসতে হয়, আর দেবীর নৃত্যের সঙ্গে তবলা বাজাতে হয় তাঁকে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: হিসেবের একটু ভুল হয়ে গেল। চোখ বাঁধা পূজারী দেবীর রূপ দেখবে কী করে!

হেসে বললুম: মনের চোখ দিয়ে।

স্বাতি আর তর্ক করল না, বলল: রাজা বুঝি সেই নাচ দেখতে এলেন লুকিয়ে?

কিন্তু দেবীর কাছে কি লুকনো কিছু যায়! ঘুলঘুলিতে চোখ লাগাতেই দেবী তাঁর নাচ বন্ধ করলেন, আর শাপ দিলেন রাজাকে, তুমি বা তোমার বংশের কোন রাজা এর পরে এই মন্দিরের সীমানার মধ্যে এলেই মরবে। এই শাপের কথা রাজারা বিশ্বাস করতেন, তাই সেবা পূজোর দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই মন্দিরে কখনও আসতেন না।

স্বাতি বলল: অন্য কোন মন্দিরের সম্বন্ধেও এই রকমের গল্প শুনেছি মনে পড়ছে।

আমি বললুম: সেও কুচবিহারের রাজার গল্প, ঘটেছিল কামাখ্যার মন্দিরে। দেবী শাপ দিয়েছিলেন মহারাজা নরনারায়ণকে।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর স্বাতি আবার কথা কইল, বলল: তোমার গল্পের খেই বোধহয় হারিয়ে গেছে।

আমি কী ভাবছিলুম জানি নে, বললুম: তাই হবে।

তুমি কামতাপুরের কথা বলছিলে। এ রাজ্য কী করে ধ্বংস হল, সে কথা এখনও বল নি।

ইতিহাসের খুঁটিনাটি কথা মনে থাকে না, যা থাকে তা একটা ধারণা।

স্বাতি বলল: সেই ধারণাই তো বেশি ভাল লাগে। মন যা

মুছে ফেলতে চায়, জীবনের জন্য তা অপ্রয়োজনীয়; যা মনে থাকে, মূল্যবান সেই কথা।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালুম স্বাতির মুখের দিকে।

লজ্জা পেয়ে সে বলল: কী দেখছ?

তুমিও একটি মূল্যবান কথা বলেছ।

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল: এবারে তোমার গল্প বল।

বললুম: এদেশের ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস আছে। মানে, রাজ্য ওঠা-নামার পিছনেও আছে কতকটা একই ধরণের কাহিনী। রাজা ও মন্ত্রীর গৃহবিবাদে ধ্বংস হয়েছিল কামতাপুর রাজ্য।

চক্রেধ্বজের পুত্র নীলাম্বর তখন কামতাপুরের রাজা। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন ঘোড়াঘাটের গড়, রাজধানী কামতাপুরকেও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এক অবৈধ প্রণয়ের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়তেই বিবাদের সূত্রপাত হল। রাজা জানতে পারলেন যে তাঁর রাণীর প্রতি আসক্ত হয়েছে মন্ত্রীপুত্র। রাজা এই অপরাধের অমানুষিক প্রতিশোধ নিলেন। একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর মন্ত্রীকে, আর যে মাংস তাঁকে খেতে দিলেন—

স্বাতি শিহরে উঠল।

সত্যিই তাই। মন্ত্রীপুত্রকে রাজা বধ করেছিলেন, আর পুত্রের মাংস রেঁধে খাওয়ালেন পিতাকে। খাওয়া শেষ হবার পরে মন্ত্রীকে তাঁর পুত্রের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন।

স্বাতির নিঃশব্দ আর্তনাদ আমি শুনতে পেলুম। বললুম: শোকার্ত মন্ত্রী কোন প্রতিবাদ করলেন না, গঙ্গাস্নানের জন্য ছুটি নিলেন রাজার কাছে। তারপর কামতাপুর ছেড়ে চলে গেলেন। রাজসংসর্গ চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করবেন বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু তা পারলেন না। প্রতিশোধ নেবার বাসনায় গৌড়েশ্বর হুসেন শাহর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর যথাসময়ে কূটচক্রে প্রলুব্ধ করে হুসেন শাহকে ডেকে আনলেন কামতাপুর জয়ের জন্য।

হুসেন শাহ এসে দেখলেন যে সরাসরি আক্রমণ করে দুর্গ জয় দুঃসাধ্য। তিনি দুর্গ অবরোধ করে বসলেন। একদিন দুদিন নয়, দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে তিনি দুর্গ অবরোধ করে রইলেন।

স্বাতি বলল: হুমায়ুন শুনেছি চুনার দুর্গ অবরোধ করে ছিলেন চার বছর ধরে। বারো বছর অবরোধের কথা আমি আজও শুনি নি।

আমারও সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। তবে এই দুর্গের কথা কিছু কিছু মনে পড়ছে। কোন একটা প্রাচীন বইএ ধ্বংসপ্রাপ্ত কামতাপুরের কথা কিছু পড়েছিলাম।

বল না সেই কথা।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

কুচবিহারে ধরলা একটি প্রবল নদী, কিন্তু তার স্রোত এখন আগের মতো প্রবল নয়। সে কালে কামতাপুরের কোল ঘেঁষে বইত ধবলা, খরস্রোতা পার্বত্য নদী প্রশস্ত ছিল এইখানে। শিঙ্গিমারি নামে আর একটি নদী বইত নগরের মাঝখান দিয়ে। ধরলা এখন সরে গেছে, কিন্তু শিঙ্গিমারি আছে। তারই দু তীরে কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ।

স্বাতি বলল: এক দিকে নদী, আর তিন দিকে কী ছিল?

প্রাচীর ও পরিখা। পরিখাও নাকি দুটি ছিল। একটি নগর পরিখা, নগরের পরিধি ছিল উনিশ মাইল। আর একটি দুর্গ পরিখা। সেটি নগরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত। প্রাচীরের তিনদিকে তিনটি তোরণ ছিল, তাদের নাম শিলাদ্বার বাঘদ্বার ও হোকোদ্বার। হোকো বোধহয় এ অঞ্চলের কোন অসভ্য জাতির নাম। হোকোদ্বারের বাইরে আর একটি ছোট দুর্গ ছিল, তার নাম পাত্রের গড়। পাত্র মানে মন্ত্রী এই দুর্গে বাস করতেন। শীতলবাস নামে একটি ছায়া-শীতল উদ্যানের মধ্যে রাজার স্নানাগার ছিল আরও কিছু উত্তরে। কমতেশ্বরী দেবীর মন্দিরের নিকটে ছিল উৎসবমঞ্চ। একটি পুষ্করিণীতে রাজা কুমীর পুষতেন, তার নাম কুমীর দীঘি। এই দীঘির পারেই

রাজাদের শেলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। রাজবাড়ির অন্তঃপুরে ছিল আরও দুটি দীঘি, তার তীরে একটি দেবালয় ছিল বলে অনুমান করা হয়।

শিঙ্গিমারি নদীর উপরে সেতু আছে একটি। তারই উপর দিয়ে ছিল বাঘদ্বার থেকে ধবলা নদীর তীরে যাবার প্রশস্ত পথ। এই বাঘদ্বারের নিকটে একটি স্থানের নাম গৌরীপট্ট, শিবলিঙ্গ নেই। শিবের মন্দির ভেঙে পড়ে গেছে। একটি বিরাট পুকুর আছে, আর পাথর আছে কয়েকখানি। সেই পাথরের উপরে নাকি অর্ধনাগিনীর মূর্তি আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর মূর্তি আছে ক্ষোদাই করা।

লোকে বলে এই দুর্গ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছেন। আর তিনদিকের মুরচা নির্মাণ করেছেন দেবী কমতেশ্বরী। রাজাকে চার দিন উপবাস করতে বলেছিলেন, সেই চার দিনেই তিনি তাঁর নির্মাণ কার্য শেষ করবেন। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় রাজা তিন দিন পরে আহার করলেন। তিন দিকের মুরচা নির্মিত হল, বাকি রয়ে গেল এক দিকের।'

স্বাতি বলল: এই দিক দিয়েই বুঝি মুসলমানেরা এসেছিল আক্রমণ করতে?

বললুম: জানি নে।

তারা কি বারো বছর ধরে দুর্গের বাইরে চুপচাপ বসেছিল?

নিশ্চয়ই না। নবাব এসেই প্রথমে রাজাকে আক্রমণ করেছিলেন। প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল দু দলের, কিন্তু জয় পরাজয় হয় নি। নবাব বুঝেছিলেন যে সম্মুখ যুদ্ধে সহজে জয়লাভ হবে না, তাই নগর অবরোধ করে বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে মুসলমানেরা নগরের বাহিরে অনেক কিছু ধ্বংস করেছিল। আর নিজেদের থাকবার মতো ঘর বাড়িও তৈরি করে নিয়েছিল। কয়েকটা পুকুরও খুঁড়েছিল বলে শোনা যায়।

নবাব হুসেন শাহ ভেবেছিলেন যে নগর অবরোধ করে তাঁকে বেশি দিন থাকতে হবে না। কিন্তু দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে

গেল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে কৌশল অবলম্বন না করে আর উপায় নেই, কোনরকমে কিছু সৈন্যকে দুর্গের মধ্যে ঢোকাতে হবে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : রাজার কাছে ভেট পাঠালেন, না রানীর কাছে গেলেন নবাবের বেগমরা ?

আমি হেসে বললুম : অবরোধ তুলে নিয়ে দেশে ফিরে যাবার আগে বেগমরা দেখতে চাইলেন রাণীকে। রাজার অনুমতি পেয়েই তাঁরা দোলায় চেপে দুর্গে ঢুকলেন। আর বেগমও তো কম নয়, সেই বেগমরা যখন ঢাল তরোয়াল হাতে দোলা থেকে লাফিয়ে নামলেন, তখন আর নগর রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভিতর ও বাহির থেকে আক্রমণ হল একসঙ্গে, পরাজয় হল রাজার। কেউ বলেন, নীলাম্বর পালিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, তিনি বন্দী হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন। আসল কথা হল যে এই যুদ্ধের পরে মহারাজা নীলাম্বরকে আর দেখা যায় নি, তাঁর রাজ্য ও রাজধানীও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এই যুদ্ধে।

৯

বারান্দায় ভারি জুতোর শব্দ পেয়ে স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল : মিস্টার গিরি বোধহয় ফিরে এলেন।

বলে নিজেই বেরিয়ে গেল বাহিরে। তারপরে মিস্টার গিরির সঙ্গে ফিরে এল। ভদ্রলোক কোন ভূমিকা না করে বললেন : দেখে এলাম মিস্টার লালকে। ভাল আছেন, তবে অনেক দিন তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে।

আমি বললুম : তাহলে আর ভাল আছেন কেমন?

একটু বিব্রত ভাবে মিস্টার গিরি বললেন : কোন আশঙ্কা নেই বলেই ভাল আছেন বলছি। আপনি এখন কেমন বোধ করছেন? বিকেলের দিকে কি বেরবেন একটু?

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

উত্তর স্বাতিই দিল, বলল : আজকেই কি বেরতে পারবেন!

তা বটে। তবে মিস্টার লালের মতো পায়ে চোট লাগেনি তো, পারলেও পারতে পারেন। অফিস ফেরত আমি আসব একবার খোঁজ নিতে। কাছে পিঠে একটু বেড়িয়ে এলে মনটা ভাল লাগবে।

আমি বললুম না যে মন আমার খুব ভাল আছে।

মিস্টার গিরি বসলেন না, যেমন ব্যস্তভাবে এসেছিলেন তেমনি ভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরের আহারের পর স্বাতি আমাকে জোর করে শুইয়ে দিল। বলল : না, তুমি অসুস্থ মানুষ। সারাক্ষণ বসে থাকারও একটা পরিশ্রম আছে।

প্রতিবাদ করার ইচ্ছা আমার হল না। তার এই অভিভাবকের

মতো আচরণে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সংবাদ পেলুম। বাধ্য ছেলের মতো শুয়ে পড়ে বললুম : আর তুমি কী করবে ?

স্বাতি একখানা কম্বলে আমাকে ঢেকে দিয়ে বলল : আমিও ঘুমোব।

কিন্তু তখনই তার নিজের ঘরে গেল না। খাতা আর কলম নিয়ে একখানা আরাম চেয়ারে বসল হেলান দিয়ে। আমার দিকে তাকাতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ও কি, এখন কিছু লিখবে নাকি।

স্বাতি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। ধমক দেবার মতো করে বলল : তুমি ঘুমোও তো দেখি।

আমি যেন খুব ভয় পেয়েছি, এমনিভাবে চোখ বুজলুম তৎক্ষণাৎ।

খেলা করতে গিয়ে আমি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঠে দেখলুম যে স্বাতি ঘরে নেই। জানালা দিয়ে আর মেঘ দেখতে পেলুম না, বোধহয় এক পশলা বৃষ্টিতেই সব মেঘ ফুরিয়ে গেছে, আর সোনালী আলো ঝলমল করছে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে।

আমি এসে স্বাতির ঘরেব দরজার সামনে দাঁড়ালুম। আর তখনই তার প্রশ্ন এল কানে : ঘুম ভাঙল ?

উত্তর আমাকে দিতে হল না, তার আগে সে নিজেই এগিয়ে এল, বলল : মুখ হাত ধুয়ে নাও, চা আসছে।

আমি এক মুহূর্ত তাকে দেখলুম। অপরাহ্নের প্রসাধন তার শেষ হয়েছে। মুখে রঙ মেখেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, হাল্কা রঙের শাড়ি পরেছে আজ, একমুঠো বেলফুলের মতো সৌরভে ঘর ভরে গেল।

স্বাতি ধমক দিয়ে উঠল : অমন করে তাকিও না, লোকে অসভ্য বলবে।

তুমি বলবে না তো !

বলে আমি মুখ হাত ধুতে চলে গেলুম।

চা এল। চা খেতে খেতে আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। কামতাপুরের পরে কুচবিহারের ইতিহাস। কুচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। সংক্ষেপে আমরা এই ইতিহাস পড়েছি। আমানতুল্লা খানচৌধুরী সাহেব যে' ইতিহাস রচনা করেছেন তা এখন লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজোপাখ্যান নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আমার হাতে এসেছিল। শতাধিক বৎসর পূর্বে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময় তাঁর দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আদেশে জয়নাথ মুন্‌শী এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তার থেকেই জানা যায় যে বর্তমান রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নরনারায়ণের সভাসদ সর্ববেত্তা উপাধ্যায় যোগিনীতন্ত্র থেকে কিছু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তারপরে প্রাণনারায়ণের সময় রাজখণ্ড রচনা করেছিলেন কবিরত্ন। মার্শী ও শোভে সাহেবও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন। এই সবের উপরে নির্ভর করেই জয়নাথ মুন্‌শী রাজোপাখ্যান রচনা করেছেন গদ্যে।

ইতিহাসের নূতন রাজ্যে কুচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ শিববংশীয় বলে পরিচিত। দেবাদিদেব মহাদেবের নামে কেন বংশের নাম হল, সে কথা সবিস্তারে আছে যোগিনীতন্ত্রে। এই তন্ত্রের ত্রয়োদশ পটলে শিব-পার্বতী সংবাদ আছে। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করছেন, দেবতা ও যোগিনীরাও কঠোর তপস্যা করে তোমাকে পায় না, অথচ কোচনী পাড়ার হীরা কোচনীর ঘরে তুমি যথেচ্ছ যাতায়াত কর। কোন্ তপস্যায় সে তোমাকে পেয়েছে?

শিব বললেন, মাধবী যোগিনীকে তোমার মনে পড়ে! আমাকে পতিরূপে পাবার জন্যে অনাহারে অনিদ্রায় সে কঠোর তপস্যা করেছে। এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসেছিল তার কাছে। কিন্তু মাধবীর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তাই ভিক্ষা দেয় নি তাকে। ব্রাহ্মণের শাপে সেই মাধবীই হীরা নামে জন্মেছে কোচনী হয়ে। এখন সে তার তপস্যার ফলভোগ করছে। তার পুত্র বিশ্বসিংহ হবে এ রাজ্যের রাজা।

চিকিনা নামে এক পর্বতে—কোচের ঘরে জন্ম হয়েছিল দুই কন্যার—তাদের নাম জীরা ও হীরা। জীরা বড় ও হীরা ছোট। এক সঙ্গে দুই বোনের বিবাহ হল হরিদাস বা হাড়িয়া নামে এক মেচের সঙ্গে। হীরার বয়স তখন আট বছর, তার জন্যে পৃথক গৃহ নির্মাণ করে দিয়ে হরিদাস জীরার সঙ্গে সংসার করতে লাগল। যথা সময়ে জীরার দুই পুত্র জন্মাল, তাদের নাম চন্দন ও মদন।

হীরা জাতিস্মর ছিল, শিবের আরাধনা করে সে দিন কাটাতে লাগল। মাসে মাসে হরিদাস আসত তার গৃহে, কিন্তু হীরার গৃহে এলে সে ক্লীব হয়ে যেত। ক্রমে হীরার বয়স হল চোদ্দ। আর তখন কোচ পাড়ায় এক বৃদ্ধ যোগী দেখা যেতে লাগল। একদিন এই যোগী এলেন হীরার গৃহে। শিবের সঙ্গে মিলন হল মাধবীর। দুই পুত্র হল তাঁদের। বড়র নাম শিশু আর ছোটর নাম বিশু। শিশুর জন্মের পরে শিব বলেছিলেন, এই শিশু সুন্দর হবে, তাই তার নাম হয়েছিল শিশু। আর বিশুর জন্মের পরে তিনি বলেছিলেন, এই পুত্র তোমার বিশ্বজয়ী হবে, তাই তার নাম হয়েছিল বিশ্বসিংহ।

বিশ্বসিংহের শৈশব নিয়ে নানা কথা আছে। একই ধরণের কাহিনী। তিনি যখন ঘুমোতেন, তখন বিষধর সাপ ফণা ধরে তার মুখে ছায়া ফেলত। বাঘের বাচ্চা পুষবেন বলে বন থেকে ধরে আনতেন। শেষ পর্যন্ত একদিন খেলার ছলে নরবলি দিলেন। ভগবতীর মূর্তি গড়ে কোচ বালকদের সঙ্গে পূজো করেছিলেন, আর এই পূজোতেই একটি বালককে বলি করেন দেবীর সামনে। এই নৃশংস ঘটনার সংবাদ পৌঁছল অটগ্রামের তুর্কী কোতোয়ালের কানে, তিনি হুকুম দিলেন, শিশু ও বিশুর মাথা কেটে আন।

আত্মরক্ষার জন্য বনে পালিয়ে গিয়েছিল দুই ভাই। কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন বিশু, দেবী তাঁদের উপরে প্রসন্ন হয়েছেন, যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে ও তিনিই রাজা হবেন। আর যায় কোথায়! চন্দন মদন শিশু ও বিশু সবাই মিলে আক্রমণ করলেন কোতোয়ালকে। তাঁদের

জয় হল ঠিকই, কিন্তু কোতোয়ালের সঙ্গে মদনও মারা পড়ল। বিশু বলল, ঠিক আছে, চন্দনকে আমরা রাজা করব।

১৪৩১ শকে চন্দন রাজা হলেন, সেইদিন থেকেই কুচবিহারের রাজশকের আরম্ভ। ইংরেজী হিসাবে তখন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ। আট-দশ বছর আগে কামতাপুরের পরাক্রান্ত রাজা নীলাম্বর পরাজিত হয়েছিলেন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহর কাছে। সেই অরাজক কামতাপুর রাজ্যও তাঁরা অধিকার করলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত কামতাপুরে তাঁরা গেলেন না, নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন কুচবিহার শহরে।

বিশ্বসিংহের উল্লেখ আছে আকবর নামাতেও। সেখানে আমবা দেখি যে শিবের কাছে প্রার্থনা করে কোন নারী পুত্রবতী হয়েছিলেন, সেই পুত্রের নাম বিশা বা বিশু। কালক্রমে এই বিশুই কুচবিহাবের রাজা হয়েছিলেন।

হাণ্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে কিছু অন্য রকম কথা লিখেছিলেন। হাজো নামে একজন পরাক্রান্ত কোচ সর্দারের অধিকাবে ছিল বাঙলার রঙ্গপুর ও আসামের কামরূপ জেলা। হীরা ও জীরা তাঁরই দুই কন্যা। হীরার বিবাহ দিয়েছিলেন হাড়িয়া মেচের সঙ্গে, কিন্তু জীরার সঙ্গে কার বিবাহ হয়েছিল তা জানা যায় না। জীরার গভে শিশুর জন্ম, ইনি জলপাইগুড়ির রায়কৎ বংশের আদিপুরুষ। আব হীরার গর্ভে বিশুর জন্ম, ইনি উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন মাতামহেব সম্পত্তির।

সে যাই হোক বিশ্বসিংহ রাজা হয়েছিলেন বাইশ বছর বয়সে। আর তাঁর ভাই শিশু বা শিষ্যসিংহ রাজ্যাভিষেকের সময় রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করেছিলেন। সেই থেকে তাঁরা রায়কৎ নামে অভিহিত হয়ে প্রতি রাজার অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরে তাঁদের বাস।

বিশ্বসিংহ তাঁর রাজ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনেন মিথিলা ও শ্রীহট্ট

থেকে। শোনা যায় যে পরিণত বয়সে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

তার পরে কুচবিহারের রাজা হন নরনারায়ণ। সমসাময়িক পণ্ডিত রাম সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিশ্বসিংহের পুত্র ছিল না, নরনারায়ণ তাঁর দৌহিত্র। কিন্তু এ কথার সমর্থন আর কোথাও পাওয়া যায় না। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানে দেখি যে বিশ্বসিংহের তিন পুত্র, তাঁদের নাম নৃসিংহ নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ।

নৃসিংহ জ্যেষ্ঠ হয়েও কেন রাজা হন নি তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। বিশ্বসিংহের সিংহাসন ত্যাগের পর নৃসিংহের অভিষেকের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। পাত্রমিত্রের সঙ্গে নৃসিংহ তখন রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় তাঁর মেজ ভাই নরনারায়ণের স্ত্রী সখীদের সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা হয়ে তাঁর সামনে এলেন। নৃসিংহকে অভিবাদন করে বললেন, আপনার আশীর্বাদ মিথ্যা হতে চলেছে।

ভ্রাতৃবধূকে রাজসভায় আসতে দেখে নৃসিংহ আশ্চর্য হয়েছিলেন, এবারে আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী রকম?

আমার বিবাহের পরে আমি যখন আপনাকে প্রণাম করি, তখন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে আমি রাজরানী হব। কই, আমি তো রাজরানী হচ্ছি না।

নৃসিংহ এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন না, তৎক্ষণাৎ বললেন, না মা, তুমিই রাজরানী হবে।

বলে আদেশ জারি করলেন, অভিষেক হবে নরনারায়ণের।

জয়ধ্বনি হল নৃসিংহের। অভিষেক নরনারায়ণেব হল। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কৎ নরনারায়ণের মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আর প্রশান্ত মনে নৃসিংহ সংসার ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন।

স্বাতি এতক্ষণ আমাকে একটি কথাও বলে নি, এইবারে প্রশ্ন করল: এই গল্প কি সত্যি?

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

লজ্জা পেয়ে স্বাতি বলল : বুঝেছি।

আমি বললুম : অনেকে বলেন যে এই নৃসিংহ নাকি ভুটানে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন যা আমি ইতিহাসে পড়ি নি।

আমার পেয়ালার চা ফুরিয়ে গিয়েছিল। স্বাতি বলল : আর একটু চা খাবে ?

বলে আরও খানিকটা চা আমার পেয়ালায় ঢেলে দিল।

কিন্তু নৃসিংহের কথা আমি বললুম না, বললুম নরনারায়ণ ও তাঁর ভাই শুক্লধ্বজের কথা। ইতিহাসে শুক্লধ্বজ চিলারায় নামে বিখ্যাত। চিলের ছোঁ মারার মতো শত্রুসৈন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলেই তাঁর নাম চিলারায় হয়েছিল। এঁরা দুই ভাই সৌমার ও কামরূপ রাজ্য অধিকার করেন, নানাস্থানে মন্দিব নির্মাণ করেন। আসামের হাজোর মন্দিরে নাকি নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজেরও প্রস্তরমূর্তি আছে।

এঁদের মূর্তি আমি কামাখ্যার মন্দিবেও দেখেছি আর বিস্মিত হয়েছি অপরিসীম। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম যে কামাখ্যার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কুচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ। আহোমদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত এবং কামরূপেই হত সেই সব যুদ্ধ। একবার এক নৈশ অভিযানের সময় বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিষ্যসিংহ পথ হারিয়ে ফেলেন। নিজেদের সেনাদলকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা নীলাচল পর্বতে এসে উপস্থিত হন, তারপর নরকাসুরের তৈরি পথে পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছান। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন তাঁরা অবসন্ন। অথচ রাত্রির অন্ধকারে এই অরণ্যময় পরিবেশে কোন জনমামব দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা যখন নিচে নামবেন ভাবছিলেন, তখন মনে হল যে কেউ তাঁদের পথ দেখাতে এসেছে। তাকে অনুসরণ করে দুই ভাই এক স্তূপের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দিব্য আলোকে তাঁরা এক বৃদ্ধাকে একটি বটগাছের নিচে

পূজায় মগ্ন দেখলেন। তৃষ্ণায় তখন তাঁদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাই বৃদ্ধাকে ডেকে তাঁরা জল চাইলেন। সামনেই যে একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে তা তাঁরা দেখতে পান নি। বৃদ্ধা সেই ঝর্ণাটি তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করে মহারাজা বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিষ্যসিংহ খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।

তারপরে বৃদ্ধা তাঁদের সামনের স্তূপটি দেখালেন। ঘন বনে আবৃত সেই উঁচু স্থানটি দেখিয়ে বৃদ্ধা বললেন, এই আমাদের আরাধ্য দেবীর পীঠস্থান। ভক্তিভরে দেবীর কাছে কিছু চাইলে তা বিফল হবে না। তাঁরা সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করলেন। বললেন, যদি বিচ্ছিন্ন সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে পারি, তবে তোমার সোনার মন্দির তুলে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে দেব।

মনস্কামনা তাঁদের পূর্ণ হয়েছিল। অবিলম্বে সেনাদল এসে রাজার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। দেবীর মাহাত্ম্য রাজা বিশ্বাস করেছিলেন। তারপরে বৃদ্ধার কাছ থেকে সব কথা তিনি জেনে নিয়েছিলেন।

বিশ্বসিংহের মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তী আছে। রাজা ভেবেছিলেন যে দেবীর মাহাত্ম্য আর একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার। এই ভেবে তিনি ঝর্ণার জলে নিজের হীরের আংটি নিক্ষেপ করলেন, সেটি বেঁধে দিয়েছিলেন আধ হাত লম্বা তিন খণ্ড 'ইকরা' নলের সঙ্গে। মনে মনে এই প্রার্থনা করেছিলেন যে কাশীতে গঙ্গাস্নানের সময় যদি এই নলে বাঁধা আংটিটি ফিরে পান, তাহলে তাঁর প্রত্যয় আরও দৃঢ় হবে।

এ যুগে আমরা অলৌকিক ঘটনা একেবারেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু দেবীর ভক্তরা এ ঘটনা আজও বিশ্বাস করে। বিশ্বসিংহ যখন কাশীর গঙ্গায় নেমে স্নান তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর গায়ে কিছু বিঁধছিল। জল থেকে তুলে তিনি দেখলেন যে তিনটি 'ইকরা'

নলের সঙ্গে একটি হীরের আংটি। তারপরেই তাঁর সেই পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে তিনি রাজসভায় পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন। আর এই অলৌকিক ঘটনাটি শোনালেন তাঁদের। পণ্ডিতরা শাস্ত্র পুরাণ নিয়ে বিচার করতে বসলেন। নানা রকম বিচার ও গণনা করে রায় দিলেন যে সে পাহাড় কোন সামান্য পাহাড় নয়, তারই নাম নীলাচল পর্বত; আর যে স্তূপ রাজা দেখেছেন, তা হল একান্ন পীঠের অন্যতম কামাখ্যার শক্তিপীঠ। কামদেবের কথায় বিশ্বকর্মা যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, ধর্মবিপ্লবে তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; আর বশিষ্ঠ যে শাপ দিয়েছিলেন নরকাসুরকে, তারই প্রভাবে দেবীর মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়ে আছে। মহারাজা বিশ্বসিংহ অবিলম্বে সেই স্তূপের উপরে মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। কিন্তু সে সোনার মন্দির নয়, সে ইট পাথরের মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের ব্যাপারেও একটি অলৌকিক কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে।

প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা নীলাচল পর্বতের উপরে একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন। বহু লোকজন এনে বন জঙ্গল কেটে সেই স্তূপটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। খানিকটা খুঁড়ে দেখা গেল যে নিচে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, আর মূল পীঠস্থানটি তাতেই ঢাকা পড়েছে। এই আবিষ্কারে রাজার আনন্দের আর সীমা রইল না। বললেন, এই জায়গাতেই নতুন মন্দির গড়তে হবে। পুরাতন ভিতের উপরেই নূতন শিখর হোক।

কিন্তু ইঁট আর গাঁথা যায় না। সারাদিন ধরে যতটুকু গাঁথা হয়, রাতের অন্ধকারেই তা ধ্বসে পড়ে। এ ভারি জ্বালা। কয়েকদিন এই রকম ঘটনার পর একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন। লাল কাপড় পরা এক কুমারী কন্যা রাজার শিয়রে বসে বললেন, রাজা, তোমার প্রতিজ্ঞার কথা কি একেবারেই মনে নেই? তুমি তো সোনার মন্দির গড়ে দেবে বলেছিলে?

প্রতিজ্ঞার কথা রাজার মনে পড়ল, ভয় পেয়ে তিনি বললেন, তাহলে উপায় কী হবে ? এত সোনা আমি কোথায় পাব।

বলে ক্ষমা চাইলেন তাঁর অক্ষমতার জন্যে। রাজার ভক্তিতে কন্যা খুশী হলেন, বললেন, বেশ, এক কাজ কর তাহলে। প্রত্যেকটি ইঁটে এক রতি করে সোনা দাও, তাহলে তোমার সামর্থ্যেও কুলোবে, প্রতিজ্ঞাও রাখা হবে।

এই বলে সেই কুমারী কন্যা অন্তর্ধান হলেন।

সকালবেলায় রাজা তাঁর স্বপ্নের কাহিনী বললেন সকলকে। তারপরে দেবীর নির্দেশ মতোই প্রতি ইঁটে এক রতি সোনা দিয়ে মন্দির গাঁথা হল। সে মন্দির আর ভেঙে পড়ল না। বাসন্তরীয়া ব্রাহ্মণ এনে রাজা নিত্য পূজারও ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু মন্দিরের গায়ে বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিষ্যসিংহের কোন প্রতিমূর্তি নেই, আছে তাঁর পুত্র নরনারায়ণ ও চিলারায়ের মূর্তি। মহারাজা নরনারায়ণকে দেবী শাপ দিয়েছিলেন। সেই শাপের কথা তাঁদের বংশধরেরা নাকি আজও মনে রেখেছেন। আমরাও সেকথা লোকের মুখে মুখে শুনতে পাচ্ছি। জনশ্রুতি বলে এই ঘটনা নানা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

রাজা এবং রাজপরিবারের সবাই ছিলেন দেবীর ভক্ত, কিন্তু রুষ্ট হয়ে দেবী সবাইকে শাপ দিলেন। অথচ দেবীর অনুগ্রহেই এই রাজপরিবারের সমৃদ্ধি দিনে দিনে বাড়ছিল। এই শাপের ব্যাপারে আরও একজন জড়িত আছে, মন্দিরের পূজারী তিনি, নাম তাঁর কেন্দুকলাই। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই ব্রাহ্মণ যখন ঘণ্টা বাজিয়ে তন্ময় হয়ে দেবীর আরতি করতেন, তখন দেবী তাঁর ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করতেন। এই সংবাদ যখন মহারাজার কানে পৌঁছল, তখন তিনি কেন্দুকলাইএর কাছে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, দেবীর এই চৈতন্য মূর্তি না দেখলে জীবনই বৃথা। একটা উপায় আপনাকে করতেই হবে।

পূজারী বললেন, মন্দিরের ভিতরে তো থাকা চলবে না, উপায় আছে একটা। নাটমন্দিরে যে রন্ধ্র আছে সেই 'কুন্দ্রাক্ষর জলারে' ভিতরটা দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলায় আরতির ঘণ্টা শুনে আপনারা সেই রন্ধ্রপথে দেবীকে দেখবেন।

ভক্ত রাজা তাই করলেন, দেবীকে দেখলেন 'কুন্দ্রাক্ষ জলা' দিয়ে। কিন্তু দেবী এই ব্যাপার বুঝতে পেরে রুষ্ট হলেন। শিরশ্ছেদ করলেন কেন্দুকলাইএর, আর শাপ দিলেন মহারাজা নরনারায়ণকে। ভবিষ্যতে তিনি বা তাঁর বংশের আর কেউ দেবীকে দেখতে পাবে না। তাঁর দর্শন দূরে থাক, মন্দিরের দিকে কেউ তাকালেই তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। সবাই বলে যে এব পরে কুচবিহার রাজবংশের আর কেউ আসে নি কামাখ্যা দর্শনে।

মহারাজা নরনারায়ণ কিংবা তাঁর ভাই সেনাপতি চিলারায় শঙ্কর-দেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেছিলেন—রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া আপীকে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন শঙ্করদেব, এই বাঙালী বৈষ্ণব কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে আজও বিষ্ণুর অবতার বলে পুজো পাচ্ছেন।

আর একজন কুখ্যাত লোক মহারাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাসে তাঁর আর একটি জুড়ি নেই। ধর্মান্তরিত হিন্দু কালাপাহাড় তাঁর হিন্দু বিদ্বেষের জন্যই ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন। বিশ্বসিংহের তৈরি কামাখ্যার মন্দিরও তিনি ধ্বংস করেছিলেন, আর গদার আঘাতে দেবমূর্তিগুলি বিকৃত করে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। নরনারায়ণ নাকি কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। তারপর বারো বৎসর ধরে এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। এখন আমরা দেবীর যে ভোগমূর্তি দেখি, মহারাজা নরনারায়ণ সেই সময়ে তাও নির্মাণ করেন। আর একটি কাজ করেছিলেন তিনি। কুচবিহারে 'নারায়ণী' মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

চা শেষ করে পেয়ালাটি সরিয়ে রাখতেই স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এবারে একটু বেড়াতে বেরবে নাকি?

আমি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকালুম।

কেন, শরীরের কষ্ট আছে বুঝি!

বললুম: বলেছি তো, মনের আনন্দের চেয়ে শরীরের কষ্ট বড় নয়। আজ আমার গল্প করতেই বেশি ভাল লাগছে।

স্বাতি আমার কথা মেনে নিল, বলল: সেই ভাল। কাল সকালবেলায় আমরা বেড়াতে বেরব।

বলে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে আরও কাছে এগিয়ে এল। আমাব মনে হল যে স্বাতি গল্প শোনার আগ্রহেই এগিয়ে এল, তাই নরনারায়ণের আব একটি গল্প তাকে বললুম। চিলারায়ের মনে একবার বড ভাইকে বধ কবে রাজা হবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁরই বীরত্বে নানা দেশ জয় করা সম্ভব হয়েছে, এবং প্রকৃত রাজা হবার যোগ্য তিনিই। এই কথা মনে হতেই চিলারায় নবনাবায়ণকে বধ করবার জন্য তরোয়াল হাতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বড় ভাইয়ের মুখোমুখি হতেই তাঁর বলিষ্ঠ হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল, চিলারায় কেঁদে ফেললেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে দশভুজা দুর্গা রাজাকে রক্ষা করছেন। ছোট ভাইয়ের এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন নরনারায়ণ, তারপরে তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, এই কথা! আজ থেকেই তুমি কামরূপের রাজা হলে, আর দুর্গাপূজার প্রচলন হবে আমার রাজ্য কুচবিহারে।

নরনারায়ণের পরে রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। আবুল ফজল তাঁর আকবর নামায় লিখেছেন লক্ষ্মীনারায়ণের কথা। বালগোঁসাই মানে নরনারায়ণ প্রথম জীবনে বিবাহ করেন নি। তাই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে যুবরাজ করেছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর ভাই শুক্ল গোঁসাইয়ের অনুরোধে বিবাহ করেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর

বুড়ো বয়সের ছেলে। তিনি রাজা হলে সেই যুবরাজ ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্রোহ করেছিলেন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদশাহর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। বাঙলার সুবেদার মানসিংহ এসেছিলেন তাঁকে সাহায্যের জন্য। তাঁর আগমনে অনেক আনন্দ উৎসব হয়েছিল, মানসিংহ এক রাজকন্যাকে বিবাহ করে ফিরে গিয়েছিলেন।

কুচবিহারের রাজবংশে মহারাজা প্রাণনারায়ণের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, বিক্রমাদিত্যের মতো তাঁর রাজসভায় ছিল পঞ্চরত্ন। তাঁরই উৎসাহে কবিরত্ন রাজখণ্ড নামে কোচ রাজবংশের বিবরণ প্রণয়ন করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান কীর্তি। জল্পীশ বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির ও কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির আজও তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

স্বাতি বলল: এই সব মন্দির কোথায় তা বলবে না?

বললুম: জলপাইগুড়ি জেলায় জল্পীশ মন্দির, সবাই জল্পেশ্বর বলে। উত্তরবঙ্গে এ রকম মন্দির আর দ্বিতীয় নেই। ট্যাক্সি ও মোটর বাসে যাতায়াত করতে হয়। শিবরাত্রি সেখানে সবচেয়ে বড় উৎসব। এর তুলনায় বাণেশ্বর নগণ্য। অনেকে বলেন যে অসুররাজ বাণের প্রতিষ্ঠিত এই শিব। কুচবিহার শহরের কাছে বাণেশ্বর গ্রামে এই মন্দির, রেলওয়ে স্টেশনও আছে এই নামে। অনাহৃত দেবতার সমারোহ শুধু শিবরাত্রির দিন। গোসানিমারির কামতেশ্বরী দেবীর কথা বলেছি, কিন্তু ষণ্ডেশ্বরের কথা আমি জানি নে।

স্বাতি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করল না। আমি বললুম: আর একজন রাজার কথা না বললে কুচবিহার রাজবংশের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর নাম ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ। ভুটানের সঙ্গে কুচবিহারের তখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কখনও বিবাদ, কখনও বন্ধুতা,

ভুটানের দেবরাজের একজন প্রতিনিধিও ছিলেন কুচবিহারে। দেবরাজ একবার ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। যুদ্ধে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন দেওয়ান রামনারায়ণ। যুদ্ধে জয়লাভ করে রামনারায়ণ নাকি অনেক ধনরত্ন এনেছিলেন, কিন্তু কাউকে তার ভাগ না দেওয়ায় রাজার পাত্রমিত্ররা চক্রান্ত করে তাকে বধ করেন। এই খবর পেয়ে দেবরাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পাত্র-মিত্রকে নিজে রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে কৌশলে সবাইকে বন্দী করেন।

এই ঘটনাতেই কুচবিহারেব স্বাধীনতা লুপ্ত হল। ভুটানরাজ কুচবিহারেব উপরে ক্ষমতা বিস্তার করছিলেন, আব কুচবিহারের রাজভক্ত পাত্রমিত্ররা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের শিশুপুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে ভুটানের ক্ষমতা প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। বৈকুণ্ঠপুরের বায়কংরাও এসেছিলেন রাজাকে সাহায্য করতে। শেষ পর্যন্ত ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে ইংরেজরা নামলেন রঙ্গমঞ্চে। কুচবিহারের সঙ্গে এক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে ভুটানদের তাড়ান কুচবিহার থেকে। ভয় পেয়ে ভুটানের রাজা মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পাত্রমিত্রদের মুক্তি দিলেন।

কিন্তু ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ দেশে ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ কবলেন না। তাঁর নাজিরকে বললেন, এ তোমরা কী করলে নাজির! কোম্পানীর কাছে তোমরা রাজত্ব বিক্রয় করে দিলে! বিদেশীকে কর দিয়ে আমি রাজসিংহাসনে বসব! ধিক্ আমাকে! বিশ্বসিংহের বংশলোপ হল না কেন!

ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হলেন না, রাজা রইলেন তাঁর পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু বছর দুই পরে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পরে তাঁকে রাজা হতে হয়েছিল। প্রজারা বাধ্য করেছিল তাঁকে। কিন্তু রাজা তখন বিবাগী, বাঘের ছাল পরে তীর্থ করে বেড়ান। লোকে তাঁকে পাগলা রাজা বলত।

স্বাতি বলল: পাগলামি তো নয়, ও দুঃখ। ভুটানের সঙ্গে তাদের

বিবাদ একদিন মিটে যেত, কিন্তু বিদেশীর কাছে কর যোগাতে হত না। বনের পাখি কি সোনার খাঁচার মর্ম বোঝে!

আমি হেসে বললুম: বেশ বলেছ।

কিন্তু তোমার বলা এখনও শেষ হয় নি।

আমি বললুম: ইতিহাস শুনতেও ভাল লাগে না, বলতেও ভাল লাগে না।

দরকারি বলে ফেলে দেওয়াও যায় না। বল তারপরে।

বর্তমান মহারাজার পিতামহ নৃপেন্দ্রনারায়ণ আধুনিক যুগের মানুষ। তিনি পাটনায় পড়েছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুগ্রহ লাভ করেছেন বিলেতে, আর ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেছেন হিন্দুমতে। ইনি তের তোপের অধিকারী হয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছ?

কেন বল তো!

তোমার কথা বলার ধরন দেখে তাই মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম: তোমারও ক্লান্ত হওয়া উচিত ছিল।

স্বাতি প্রতিবাদ করল না, বলল: শুধু একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ কর, এ বংশের রাজাদের কি আর কোন কীর্তি নেই?

আছে। বলে আমি হাসলুম।

হাসলে যে?

শৈশবে যে সাগর দীঘির ধারে আমরা প্রায় রোজ বেড়াতে যেতুম, দেড়শো বছর আগে তা খনন করেছিলেন মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ। পশ্চিম তীরের শিবমন্দিরটিও তাঁরই প্রতিষ্ঠা।

তারপর?

আরও অনেক বছর আগে মহারাজা রূপনারায়ণ মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমান রাজধানীও তাঁরই প্রতিষ্ঠা।

গল্পে বাধা পড়ল এই সময়ে। দরজায় কেউ করাঘাত করল।

১০

হোটেলের বেয়ারা এসেছে ভেবে ঘরের ভিতর থেকে আমি কর্কশ কণ্ঠে বলেছিলুম : কাম্ ইন।

কিন্তু তার বদলে যখন অন্য মানুষ এসে ঘরে ঢুকলেন, তখন লজ্জা পেলুম নিজের অসৌজন্যের জন্য। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের অভ্যর্থনা করলুম। স্বাতি বলল : আসুন আসুন।

মিস্টার গিরির সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছিল। ফর্সা সুশ্রী মেয়ে ছিপছিপে গড়নের, বয়সের অনুমানে মিস্টার গিরির মেয়ে বলে মনে হল। কিন্তু পরিচয় না পেলে কিছু ধরে নেওয়া উচিত নয়। আমি স্বাতির দিকে তাকালুম, আর স্বাতি তাকাল আমার দিকে। কিন্তু মিস্টার গিরি মেয়েটির পরিচয় দিলেন না। বললেন : অফিস থেকে ফিরেই আপনাদের কাছে চলে এলাম।

আমি বললুম : ভাল করেছেন।

আর স্বাতি তার নিজের চেয়ারটি ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘর থেকে আর একখানি চেয়ার নিয়ে এল। বলল : দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিস্টার গিরি, বসুন আপনারা।

মেয়েটি বলল : আপনাকেই তো দেখতে এলাম। আপনি বসুন আগে, তারপরে আমরা বসব।

স্বাতির বাঙলা কথা মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু উত্তর দিয়েছিল হিন্দীতে। মনে হল যে বাঙলা বা ইংরেজী বলার অভ্যাস তার নেই। নেপালী হয়তো নিজের মাতৃভাষা, বাকি কাজ হিন্দীতেই চালিয়ে নেয়।

সবাই বসবার পরে মেয়েটিই আবার কথা কইল : সত্যিই আপনাদের দেখলে স্বামী-স্ত্রী বলে মনে হয় না।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, তা নই যে। কিন্তু তার আগেই মেয়েটি বলল: মনে হয় যে আপনারা যেন ভাই বোন।

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি হাসলুম, আর স্বাতি কটমট করে তাকাল আমার মুখের দিকে।

মেয়েটি বলল: আপনারা কি খৃষ্টান?

বলে স্বাতির মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কেন বলুন তো?

মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা লোহাও দেখছি না।

স্বাতির চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু সত্য কথা বলতে পারল না। বোধহয় ভাবল যে সত্য কথা বললে অন্য রকমের বিপদ উপস্থিত হতে পারে। তাই উত্তরটা সযত্নে এড়িয়ে গেল। বলল: দেশ থেকে এসব আজকাল উঠে যাচ্ছে।

বয়সের তুলনায় মেয়েটিকে আমার বড় ডেঁপো বোধ হল। কখন যে সে তার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাঁটা বার করে উল বুনতে শুরু করেছিল, আমি তা দেখতে পাই নি। পাকা গিন্নীর মতো হাবভাব। বলল: উঠে যাওয়াটা কি উচিত হচ্ছে। এর পরদিন আমি কিনে নিয়ে আসব।

স্বাতি যেন আর্তনাদ করে উঠল: না না, অমন কাজও করবেন না।

আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম, মিসেস গিরিকে কেন সঙ্গে আনলেন না। তারপরেই থেমে গেলুম। এই মেয়েটি যে ভদ্রলোকের তৃতীয় পক্ষ নয়, তা এখনও জানা যায় নি। পারিবারিক কথা তাই জিজ্ঞাসা না করাই নিরাপদ।

মেয়েটি দমল না, বলল: মাথায় সিঁদুর না দিলে বাঙালী মেয়েকে একেবারেই মানায় না।

স্বাতি করুণভাবে তাকাল আমার দিকে। তার অসহায় ভাব দেখে আমার বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, ঠিক বলেছেন। কিন্তু সে বড়

গ্রাম্য রসিকতা হবে ভেবে নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম: এ সব রুচির কথা। কারও ভাল না লাগলে তার ওপরে জোর করা উচিত নয়।

মিস্টার গিরিও এই কথা মেনে নিলেন। বললেন: এ আমাদের একটা বদ্ অভ্যেস যে অন্যের স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে যাই।

এই সুযোগে আমি তাঁদের অন্য কথায় টেনে আনলুম। বললুম: দার্জিলিঙে কী দেখবার আছে বলুন তো?

প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে মিস্টার গিরি বললেন: কিচ্ছু বলব না।

স্বাতি ও আমি দুজনেই আশ্চর্য হয়ে তাকালুম তাঁর মুখের দিকে।

সহাস্যে মিস্টার গিরি বললেন: বলব না কিছুই, কিন্তু দেখাব সবকিছু। কবে বেরবেন বলুন?

এবারে তাঁর রহস্য আমি বুঝতে পারলুম, বললুম: কাল সকালে।

মিস্টার গিরি এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপরে বললেন: ভোর চারটেয় বেরুতে পারবেন?

কেন পারব না।

তবে প্রথমেই আপনাকে টাইগার হিলে নিয়ে যাই, কী বলেন!

সে তো অনেক দূর!

হেঁটে তো আর যাবেন না, যাবেন গাড়িতে। দূরের জন্যে ভাবনা কী!

অনেকটা পাহাড় নাকি হেঁটে উঠতে হয়?

মিস্টার গিরি বেশ প্রসন্ন মনে হাসলেন, বললেন: আপনি দেখছি বুড়ো মানুষের মতো ভয় পাচ্ছেন। আজকাল আর এক পা-ও হাঁটতে হয় না। পাহাড়ের চূড়োর ওপরে কয়েকশো ল্যাণ্ডরোভার দেখতে পাবেন।

তারপরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন: না, হাঁটতে হয় বইকি।

বাড়ি থেকে বেরতে দেরি হলে চূড়োয় তো আর ওঠা যাবে না, পার্কিঙের সমস্ত জায়গা আগেই ভরে যাবে। কাজেই—

বললুম: বুঝেছি। হাঁটতে না চাইলে একটু আগে বেরতে হবে।

মিস্টার গিরি এ কথার উত্তর দিলেন না, তাঁকে বড় চিন্তিত দেখাল। মেয়েটি এতক্ষণ নীরবে ছিল, এবারে বলল: গাড়ির ব্যবস্থা এখন কী করে করবে?

চিন্তিতভাবেই মিস্টার গিরি বললেন: সেই কথাই তো ভাবছি। আমাদের ড্রাইভারের বাড়ি তো মনবাহাদুর চেনে।

মেয়েটি বলল: চিনে আর লাভ কী! তাকে তো এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না।

মিস্টার গিরি বললেন: সত্যি কথা।

ভদ্রলোককে নিষ্কৃতি দেবার জন্য আমি বললুম: তার জন্যে ভাবনা কী আছে। পরশু আমরা টাইগার হিলে যাব, আর কাল এই শহরটাই দেখব ঘুরে ঘুরে।

স্বাতি আমাকে সমর্থন করে বলল: প্রথম দিনে অল্পস্বল্প ঘোরাই ভাল।

মিস্টার গিরি প্রচুর আরাম পেলেন, বললেন: দূরের জায়গাগুলো না হয় ওবেলায় দেখিয়ে দেব।

মিস্টার গিরিকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই একটা সত্য কথা আমি বলি নি। দার্জিলিঙ শহরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি ল্যাণ্ডরোভারের অভাব নেই। সন্ধ্যাবেলায় একটা মোটর ট্রান্সপোর্ট অফিসে গেলেই গাড়ির ব্যবস্থা হতে পারত। সবার তো আর অফিসের গাড়ি নেই যে বিনি পয়সায় যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ আছে। সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারীদের এ একটা রোগের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। পয়সা দিয়ে গাড়ি চড়ার কথা তারা ভাবতে পারে না। আর বিনি পয়সায় সরকারী বা কোম্পানীর গাড়ি চাপতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা কারও নেই। সরকারী

জীপ থেকে মহিলারা বাজারে নামছেন প্রসাধনের সামগ্রী কিনতে, আবার কোম্পানীর গাড়ি সকাল থেকে গভীর রাত অবধি হোটেল ও বারে ছুটোছুটি করছে। এই সাধারণ নিয়ম, এর ব্যতিক্রম দেখলেই লোকে বিস্মিত হয়, ভয়ও পায় কোন দুরভিসন্ধির। আমি তাই গাড়ি ভাড়া করার পরামর্শ মিস্টার গিরিকে দিলুম না।

স্বাতি প্রশ্ন করল: কাল আমাদের কী দেখাবেন?

মিস্টার গিরি বললেন: ধীরধাম আপনাদের দেখাব না, কেন না আপনারা নিজেরাই ঐ বৌদ্ধ মন্দিরটি দেখতে পারবেন। এই তো আপনাদের হোটেলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা নেমে গেছে, ঐটেই ধীরধামের রাস্তা। কয়েক গজ এগিয়েই সুন্দর মন্দিরটি দেখতে পাবেন। চারিদিকে ফুলের বাগান, আর দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। অনেকটা নিচে দেখতে পাবেন লুই জুবিলি স্যানাটোরিয়াম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোন রোগীদের থাকবার জায়গা?

স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে, বলল: দার্জিলিঙে বুঝি এর আগে কখনও আস নি।

গম্ভীরভাবে আমি বললুম: না।

স্বাতি বলল: হোটেল একটা, এর পরিচালনা একটু অন্য ধরনের শুনেছি। ব্যবস্থা ভাল হলেও কে থাকবে সেখানে। মনে হবে যে পাতালপুরী থেকে ওঠানামা করছি।

মিস্টার গিরি বললেন: ওকথা বলবেন না। টুরিস্টদের খুবই প্রিয় জায়গা ওটা। পাহাড় দেখবার জন্যেই তো পাহাড়ে আসা, তাই ঐ পরিশ্রমটুকু অনেকেরই ভাল লাগে।

মিস্টার গিরি তারপরে দার্জিলিঙ শহরের চেহারাটা আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন।

এই যে চওড়া রাস্তাটা স্টেশনের সামনে দিয়ে গেছে, তার নাম কার্ট রোড। শুধু দার্জিলিঙ শহরটাকেই চিরে দু ভাগ করে নি, দার্জিলিঙকে যুক্ত করেছে সমতল ভূমির সঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে

মাইল পঞ্চাশেক পথ ক্রমাগত উপরে উঠেছে ঘুম পর্যন্ত। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে ঘুম, তারপরে এধারে নেমেছে দার্জিলিঙের দিকে। এখান থেকেই এই পথ মাইল পাঁচেক দূরে লেবঙের রেসকোর্স পর্যন্ত এমনি করে চলে গেছে। এই দার্জিলিঙ শহর উপরেও যতখানি, নিচেও ততখানি। আর দুনিয়ার নিয়মে উপরে বড়লোকদের আর নিচে গরিবদের বসবাস।

আমি হেসে বললুম : বড়লোকদের উপর আপনার রাগ নাকি?

মেয়েটি বলল : দু চক্ষে দেখতে পারে না, বলে যে ক্ষমতা থাকলে নাকি রোলার চালিয়ে সবাইকে সমান করে দিত।

এ কথা তো গরিবেরা বলে।

মিস্টার গিরি বললেন : আর বড়লোকেরা বলে যে কে কার ওপরে রোলার চালায় দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললুম : আপনি কেন নিজেকে গরিব ভাবেন?

মিস্টার গিরি বললেন : আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের অবস্থা তো আরও খারাপ।

মেয়েটি বলল : ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয়, আবার স্ট্যাটাসও রাখতে হয়।

এতটুকু মেয়ের মুখে ছেলেমেয়ে মানুষ করার কথা শুনে আশ্চর্য হতে হয়, স্বাতিও সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : তার চেয়ে দার্জিলিঙের কথা বলুন।

মিস্টার গিরি বোধহয় লজ্জা পেলেন, বললেন : এই আমাদের দোষ, কোন্ কথায় কোথায় চলে যাই খেয়াল থাকে না।

তারপরে আবার দার্জিলিঙের কথা শোনালেন।

দার্জিলিঙের বাজার হল কার্ট রোডের ধারে। শৌখিন জিনিসের বাজার উপরেও আছে, কিন্তু জীবনধারণের জন্য এ বাজারে সবাইকে আসতেই হবে, আর এ বাজারে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস কমই আছে। দার্জিলিঙের প্রত্যেক যাত্রীকে কার্ট রোডের নিচে নামতে

হবে দুবার। একবার বটানিকাল গার্ডেন দেখতে, এমন সুন্দর ফুলের বাগান আর কোথায় আছে জানি নে। আর একবার ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ দেখতে, দার্জিলিঙে এই একটি ফল্‌স্‌, পাগলা ঝোরা এখান থেকে অনেক দূরে। দার্জিলিঙবাসীকে তার শেষ দিনেও একবার নিচে নামতে হয় চোখ বোজবার পরে।

স্বাতি বলল: আমার যতদূর মনে পড়ে, বর্ধমান মহারাজার বাড়িটিও বোধহয় কার্ট রোডের কিছু নিচে ঘুমে যাবার পথে।

মিস্টার গিরি এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না, বলে উঠলেন: এসব আবার কেন!

পিছন ফিরে দেখতে পেলুম যে চা ও খাবার নিয়ে হোটেলের বেয়ারা ঘরে ঢুকেছে, কখন যে সে চায়ের পুরনো সরঞ্জাম নিয়ে গেছে, আর কখন স্বাতি তাকে আবার চা আনতে বলেছে, আমি তা দেখতে পাই নি। ঘরের বাহিরেও সে যায় নি, চোখের ইসারায় যে সে কিছু বলেছে তা বুঝতে পারছি। মেয়েটিও বলে উঠল: বাড়ি থেকে আমরা তো চা খেয়েই বেরিয়েছি।

স্বাতি নিজের সামনের ছোট টেবিলে সব নামিয়ে নিয়ে বলল: তাতে আর কী হয়েছে! দার্জিলিঙের গল্পটা আরও ভাল জমবে।

মিস্টার গিরি এর পরে কার্ট রোডের উপরের দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা করলেন।

দার্জিলিঙ শহরে পাহাড় আছে চারটি। চৌরাস্তা থেকে শহরের একপ্রান্তে সোজা সমতল পথ ধরে গটমট করে চলে যান বার্চ হিলে। আগে সে একটা নির্জন বেড়াবার জায়গা ছিল, এখন দ্রষ্টব্য স্থান হয়েছে—মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট আর শীতের দেশের চিড়িয়াখানা। ফেরার পথে অবজারভেটরি হিলটাও দেখে নিতে পারেন। একেবারে চৌরাস্তার পাশেই। উপরের একটা জায়গা থেকে হিমালয়ের সব চুড়োগুলো দেখবেন—সব নাম লেখা আছে, তারপরে আমাদের একটা ধর্মস্থান দেখে নেমে আসবেন।

আর একদিন আপনাদের জলাপাহাড়ে যেতে হবে। চৌরাস্তা থেকে অন্য দিকের পথ। বার্চ হিলের মতো সমতল পথ নয়, এ উপরে উঠতে হয়। দম না ফুরোলে কাটা পাহাড়ও ঘুরে আসতে পারেন। না পারলেও কোন ক্ষতি নেই, দেখবার মতো আকর্ষণীয় কিছু নেই। মিলিটারি ছাউনির জন্যে এই পাহাড় এক সময় বিখ্যাত ছিল। বুড়োদের কাছে শুনেছি যে গোরা পল্টনদের ভয়ে এ দেশের মেয়েরা ওপথ মাড়াত না।

এর পরে বেড়াবার সময় এটা সেটা দেখুন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্টেপ অ্যাসাইড, মিউজিয়াম, ভুটিয়া বস্তি মনাস্টারি, আলুবাড়ির তিব্বতী গোম্ফা, হ্যাপি ভ্যালির চা বাগান। যেদিন টাইগার হিলে যাবেন, সেদিন আপনাকে সিঞ্চন লেক ক্যাভেণ্টার্স ফার্ম আব ঘুম মনাস্ট'বি দেখিয়ে দেব।

চা খেতে খেতেই মিস্টাব গিরি কথা বলছিলেন। বসে বসে দার্জিলিঙেব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে মন্দ লাগছিল না। তাতে দেখবার সুবিধা হয়। মিস্টার গিরি এইবারে নিজেদেব ভাষায় মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞাসা কবলেন। কোন মেয়ের নাম সন্দেহ করে স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল : মিসেস—

ঠোঁটের উপরে আঙুল চেপে আমি তাকে থামিয়ে দিলুম, আর তারপরেই বুঝতে পারলুম যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। বাহিরে কোলাহল শুনেই বোধহয় মিস্টার গিবি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। এইবারে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটি বেশ বড়সড় মেয়ে এসে ঘবের মেয়েটিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল, ইংরেজীতে বলল : মা, তুমি এখানে! আমরা সারা রাজ্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দু চোখ বিস্ফারিত কবে স্বাতি আমার মুখেব দিকে তাকাল। এতক্ষণ যে মেয়েটিকে আমবা ছেলেমানুষ ভাবছিলুম, তিনি যে এতগুলি পুত্রকন্যার জননী তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে ছ তিনটি মেয়েকেই মায়ের বড় বোন বলে মনে হচ্ছে। মিসেস গিরি বললেন : আর আমার বসা চলবে না, আমি চললাম।

বলে তিনি উঠে পড়লেন।

লজ্জিত ভাবে স্বাতি বলল : সেকি, উঠছেন কেন, বসুন।

ভদ্রমহিলা বললেন : এরা শুধু আমায় নয়, আপনাদেরও জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

মিস্টার গিরি তাঁর স্ত্রীকে বাধা দিলেন না, বললেন : লিলি এখানে বসুক।

লিলি তাঁর বড় মেয়ে। সবাই চলে গেলে পরিচয় হল তাঁর সঙ্গে। দার্জিলিঙের কলেজে সে পড়ছে, বাঙলা জানে। স্বচ্ছন্দে কথা বলে বাঙলায়। আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : আপনি চমৎকার বাঙলা বলেন।

মিস্টার গিরি বলে উঠলেন : আপনি নয় আপনি নয়, তুমি। লিলি আমার মেয়ে।

তারপরেই বললেন : বাঙলা গানও শিখেছে। ওর গলায় ভাওয়াইয়া গান শুনে ওকে উত্তর বঙ্গের মেয়ে বলে আপনার মনে হবে।

ভাওয়াইয়ার নামে আমার পুলক জাগল মনে। বললুম : এ গান আমাকে শুনতেই হবে।

মিস্টার গিরি আমার পুলক দেখে বললেন : কেন, আপনার দেশ কি এই অঞ্চলে নাকি।

সহাস্যে স্বাতি বলল : জাতে কোচ।

আমি বললুম : কোচ নয়, বাহে।

সে আবার কী!

ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্বে আমরা নেই। আমরা দূর থেকে বলি, ক্যানে কাজিয়া করেন বাহে!

লিলিও এবারে আমাব মুখের দিকে তাকাল সকৌতুকে। বললুম: কলকাতার লোক বলে মশাই, আমরা কুচবিহার ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলি বাহে, বাবাহের সংক্ষেপ। আর কাজিয়া মানে ঝগড়া। আমরা নির্বিবাদী মানুষ। ঝগড়া বিবাদের মধ্যে আমরা যেতে চাই নে।

স্বাতি বলল: তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত বনিবনা কারও সঙ্গে হল না।

আমি বললুম: তর্ক এখন তোলা থাক, আমরা লিলির গান শুনব।

বলে একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলুম।

স্বাতি বলল: সেই ভাল। আমিও গান শোনবার জন্যে প্রস্তুত।

লিলি বলল: ভাওয়াইয়ার জন্যে যে দোতরার দরকার।

দোতরা আবার কী!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: দুতারের একটা যন্ত্র, অদ্ভুত মিষ্টি সুর তার। কিন্তু লিলির গলার স্বর আরও মিষ্টি বলে কোন যন্ত্রেরই দরকার হবে না। শুরু কর তো।

মিস্টার গিরি গর্বিতভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

লিলি আর দেরি করল না, গাইল:

কানাইরে, কেমন করিয়া
হইমুরে দরিয়া পার?
কাশিয়া আর এলুয়া
নদী হইছে হলুস্থুলু রে।

রের পরেই একটা এহে এহে বলে টান দিয়েই লিলি হেসে উঠল।

আমি বললুম: বেশ চমৎকার হচ্ছে, গাও তার পরে।

কিন্তু লিলি আর গাইল না। বলল: আমার লজ্জা করে এসব গান গাইতে।

আমি বললুম : তবে নিজের দেশের একখানি গান শোনাও।

কিন্তু তাতেও সে রাজী হল না।

মিস্টার গিরি অন্য কথা বললেন। দার্জিলিঙ ও দার্জিলিঙবাসীর সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন আমাদের। তারপরে রাত হয়েছে বলে ফিরে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

তাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে স্বাতি ফিরে এল। বলল : কুচবিহার সম্বন্ধে তোমার খানিকটা দুর্বলতা আছে দেখলাম।

বললুম : জননী জন্মভূমিশ্চ—

কিন্তু জন্মভূমির কাছে তুমি কি কিছু পেয়েছ ?

জীবনটিই যে পেয়েছি।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপরে বলল : তা পেয়েছ।

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বলল : আমাকেও একবার সেখানে নিয়ে যেও।

সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের পরে স্বাতি বলল : আজ তোমাব শরীর কেমন ?

বললুম : ঘরে বুঝি মন বসছে না ?

তোমার মন টানছে না কিছু ?

টানছে।

পরের কথাটুকু শোনবার জন্যে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : আমাব গল্পের নায়িকা।

তাহলে উঠে পড়।

বলে স্বাতি উঠে দাঁড়াল।

চায়ের টেবিলে বসবাব আগেই স্বাতি আমাকে সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছে। কোটপ্যান্ট পরাবাব চেষ্টা করে নি। ধুতির উপরে পাঞ্জাবী পবিয়েছে কোন রকমে, তার ওপরে একটা হাত-কাটা বোতাম দেওয়া সোয়েটার। এবারে একখানা গরম তুস গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল : চল।

আমি তার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালুম, তারপরে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

আকাশে মেঘ নেই, পাহাড়ের গা বেয়েও উঠছে না মেঘ। সকালের সোনালী রোদ পথের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমরা পথের উপরে এসে দাঁড়ালুম।

সামনে পাহাড়, প্রশস্ত পথ এই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বিস্তৃত। ডান হাতে এই পথ খানিকটা এগিয়েই হারিয়ে গেছে, তারপরে আবার বুঝি দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরে, মাঝখানের গভীর বাঁকটা আর দেখতে পাচ্ছি না। এদিকের শহর যেন সহসা শেষ হয়ে গেছে।

আমরা বাম দিকে এগোলুম। জনাকীর্ণ দার্জিলিঙ শহর এই দিকেই। বাজারের দিকে আমরা এগোলুম না। স্টেশন ছাড়িয়ে আমরা চৌরাস্তায় উঠবার পথ ধরলুম। ধীরে ধীরে এই পথ উপরের দিকে উঠেছে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ পথ কি চিনতে পারছ?

বললুম : না। দার্জিলিঙের কোন পথই আমার চেনা নয়।

কেন?

সজ্ঞানে দার্জিলিঙে আসি নি। আর হাসপাতাল থেকে হোটেলে এসেছি অন্ধকারে বন্ধ গাড়ির মধ্যে।

দার্জিলিঙের ম্যাপ দেখা আছে তো?

ম্যাপ দেখে পাহাড়ী শহর চেনা যায় না। এখানে আমার গাইড হবে তুমি।

আর তুমি কোথায় গাইড হবে?

সে কাজ তো অনেক দিন আগে ছেড়ে দিয়েছি।

ভাল লাগল না বুঝি!

তোমাকে অনুসরণ করতে বেশি ভাল লাগছে।

স্বাতি হঠাৎ তার চলার গতি কমিয়ে দিল, বলল : খেয়াল করি নি যে তুমি আমাকে অনুসরণ করছ। আমরা পাশাপাশি চলব।

এই সড়কটি দার্জিলিঙের একটি প্রধান রাজপথ, নিচের তলার মানুষকে যুক্ত করেছে উপরতলার সঙ্গে। আগে নাম ছিল ম্যাকেঞ্জি রোড, এখন বোধহয় নাম হয়েছে লাডেন লা রোড। আর ম্যাল বোধহয় এখন তার পুরনো চৌরাস্তা নামেই পরিচিত। ধীরে ধীরে আমরা উপরে উঠে গেলুম, পৌঁছলুম সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। এক ধারে বড় বড় বাড়ি দোকানপাট, অন্যধারে উন্মুক্ত আকাশ। রেলিঙের ধারে ধারে বসবার বেঞ্চ সাজানো আছে। এক দিকে অবজারভেটরি ছিল, তার দুধার দিয়ে গেছে দুটো পথ। অন্য দিকে

একটা পথ নেমেছে জলাপাহাড় থেকে, আর একটা পথ ধরে আমরা উঠে এসেছি। চৌরাস্তা বললে যেমন বোঝা যায়, এ তেমন চৌরাস্তা নয়। চারটি পথ এক জায়গায় মিলিত হয় নি, দূরত্ব তাদের অনেকখানি। অনেকগুলি দোকনপাট পেরিয়ে ম্যলের প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত হতে হয়, সেই স্থানেরই আর এক প্রান্তে আর তুটো পথ। বাঁয়ের পথটি গেছে বার্চ হিলের দিকে। ডানদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মৃতিবিজড়িত গৃহ স্টেপ অ্যাসাইড। সমুদ্র সৈকত থেকে এই স্থানের উচ্চতা হল সাত হাজার তু ফুট।

স্বাতি বলল: এস, আজ আমরা ঐ লেকে একটু বসি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার সময় একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করলুম। পাহাড়ের উত্তর দিকের গায়ে আমরা পেঁৗছেছি, এখান থেকে উত্তরের সমগ্র পর্বতশ্রেণী আমরা দেখতে পাব পঞ্চাশ থেকে একশো মাইলের মধ্যে। তুষারাবৃত পর্বতগুলি নীলপাহাড়ে আবৃত নয়, আর একটু উপরে অবজারভেটরি হিলের উপরে উঠলে উত্তরের দিগন্ত হবে চোখের সামনে উদ্ভাসিত। মনে মনে সেই দৃশ্য কল্পনা করে বললুম: বসতে পারি, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। একবার ঐ পাহাড়ে আমাদের উঠতেই হবে।

স্বাতি আমার সংকল্প দেখে আশ্চর্য হল, কোন কথা না বলে তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি হেসে বললুম: উদার দিগন্ত দেখতে পাচ্ছ? ঐ পাহাড়ে উঠলে আর কোন অবরোধ থাকবে না।

স্বাতি মেনে নিল আমার কথা। বলল: তা জানি। কিন্তু তার আগে যে দার্জিলিঙের ভূমিকা শুনতে হবে—ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ না বসলে চলবে কেন!

কত শাস্তি দেবে?

শাস্তি বল। জীবনের তুঃখ ভোলবার জন্যে মানুষ বৈরাগী হয়,

আর সুখের জন্যে করে ছুটোছুটি। তুমি এই বেঞ্চিতে বসে তোমার দুঃখও ভুলবে, শান্তিও পাবে।

বলে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। আমি বসলুম তার পাশে।

সহসা আমার সিমলার কথা মনে পড়ল। সিমলার রিজে আমরা এমনি করে বসতুম, আর তাকিয়ে থাকতুম তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে। সেখানকার কিছু বেঞ্চ ছিল উল্টো দিকে সাজানো, সেই বেঞ্চে বসে পাহাড় দেখা যেত। এখানে সে সুবিধে নেই, এখানে আমরা দূরের দোকানপাটেব দিকে মুখ কবে বসেছি, পাহাড় দেখতে হলে আমাদের মুখ ফেরাতে হবে।

সেদিনও আমরা জাখু পাহাড়ের মাথায় পাশাপাশি বসেছিলুম, আর সহসা স্বাতি তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আমার দিক থেকে। বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম, কোন প্রতিবাদ আমি করতে পারি নি। তার সেদিনের কথাগুলো আজও আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

জাখু পাহাড়ে উঠবাব জন্যে আমরা শেষরাতে বেরিয়ে পড়েছিলুম। মামী জেগে আছেন জেনে স্বাতি বলেছিল : আসি মা, দরজাটা বন্ধ করে দিও।

অস্ফুট স্বরে মামী দুর্গানাম করেছিলেন।

পথে অন্ধকার ঘন নয়, আলোও আসছিল না কোন দিক থেকে। রাত কত তা আমি দেখি নি ; কখন সূর্যোদয় হবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। আমি স্বাতিকে বলেছিলুম : মামীমাকে বড় অসহায় দেখাল।

স্বাতি বলল : মার ভাবনা তোমার জন্যে। তোমাকে যে একটুও ভরসা পান না।

আমি এলে তোমাকে যে আর ঘরে আটকানো যায় না।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : তুমি কি কলির কৃষ্ণ।

আমি হেসে বললুম: সকল পুরুষই একটি রাধার কাছে কৃষ্ণ। যে তা নয়, সে দুর্ভাগা।

তুমি কি আমাকে তোমার রাধা ভাবছ?

না তো। আমি নিজেকে তোমার কৃষ্ণ ভাবছি।

হঠাৎ এই পরিবর্তন এল কেন?

শুনলুম যে এক রাধা এখন স্বাধীন জীবন যাপনের চেষ্টা করছে।

তাতে কী সুবিধা হবে?

এক আয়ান ঘোষ সংগ্রহের চেষ্টা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাইতেই মামা বলছিলেন, স্বাতির বিয়ে এখন থাক। আয়ান ঘোষের বদলে ও কৃষ্ণকেই বিয়ে করবে।

স্বাতি বলল: কলির কৃষ্ণের যে দুরবস্থার শেষ নেই।

আমি বললুম: দ্বাপরের কৃষ্ণেরও দুরবস্থা কিছু কম ছিল না। কারাগারে জন্ম, ননী চুরি করে আর গরু চরিয়ে শৈশব কাটল, যৌবনে গোপীদের হাতে নাকানি-চোবানি, তারপরে জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা থেকে একেবারে ভারতের শেষপ্রান্ত দ্বারকায়।

তবু তিনি দ্বারকার রাজা।

ব্রিজের উপরে যখন পৌঁছলুম, প্রত্যুষের প্রথম আলোয় চারিদিক তখন পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। পাহাড়ে উঠতে উঠতে আরও অনেক হাল্কা কথা আমাদের হল। পথের ধারে একটা খাবারের দোকান দেখে আমি বলেছিলুম: ফেরার পথে একটু চা খাওয়া যাবে, তার সঙ্গে ফুচ্‌কা কিংবা হিঙের কচুরি।

স্বাতি বলেছিল: চমৎকার আইডিয়া। এই বুদ্ধির জন্যেই তোমার একটা ভাল বিয়ে হওয়া উচিত।

স্বাতি প্রচুর গাম্ভীর্য নিয়ে এই মন্তব্য করেছিল, আর আমি ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলেছিলুম: সে ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছি।

সত্যি নাকি!

নিমন্ত্রণপত্র পেলেই সব জানতে পারবে।

হৃদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে স্বাতি বলল: তোমার উত্তরপাড়ার ঐ এঁদো ঘর থেকে বউ পালিয়ে যাবে না তো!

বউ যে সেধে সেখানে যাচ্ছে!

বল কি, ঐ এঁদো ঘরে!

আমার বউ গাছতলার বদলে ঘর পাচ্ছে, সেই আনন্দেই মশগুল।

স্বাতি হেসে বলেছিল: তুমি নিজেও যে মশগুল দেখছি।

জাখু পাহাড়ের উপরে পৌঁছে মাটির উপরে আমরা বসে পড়েছিলুম। উত্তরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আনন্দে ও বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। সামনে তুষারমৌলি হিমালয়ের অপরূপ বিস্তার। কোথাও বরফ, কোথাও মেঘ, কোথাও বা দুয়ে মিলে এক মায়াময় রূপ। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে আমরা এই সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলুম।

স্বাতি হঠাৎ আমাকে জাগিয়ে দিল, বলল: কী ভাবছ বল তো?

চমকে জেগে উঠে আমি চারিধারে চেয়ে দেখলুম। এ সিমলার জাখু পাহাড় নয়, আমরা দার্জিলিঙের চৌরাস্তায় বসে আছি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: সিমলার কথা মনে পড়ছে।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: সিমলার কথা!

বললুম: জাখু পাহাড়ের মাথায় বসে তুমি আমাকে একটা সত্য কথা বলেছিলে। তার জন্যে কোন ইতস্তত কর নি, কোন ভূমিকাও না। অত্যন্ত সহজভাবে স্পষ্ট ভাষায় তুমি তোমার বক্তব্য আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলে। মনে আছে সেই কথা?

যেন কিছুই মনে নেই, এমনিভাবে স্বাতি বলল: কোন্ কথা বল তো!

বলেছিলে, তুমি ঠিকই শুনেছ যে আমি স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করছি। কেন করছি, তাও বোধহয় বুঝেছ। সে বাবা-মার

সম্মানের জন্য। লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে থাকলে বাবা মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবেন। অথচ বিনা দ্বিধায় বিয়ে করতে পারি এমন মানুষের দেখা কি আজও পেয়েছি।

তারপর?

আমি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম, জলভরা মেঘের মতো তোমার মুখ থমথম করছে। খানিকক্ষণ থেমে তুমি বলেছিলে, আমি তোমাকে ভালবাসি গোপালদা, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না। আদর্শের জন্য নিজের সুখ দুঃখ স্বার্থ ত্যাগ করা চলে, কিন্তু পিতামাতা যে দেবতার মতো সব আদর্শের ঊর্ধ্বে। তাঁদের অসম্মান করে তো কল্যাণ হবে না।

এই সব বড় বড় কথা বলেছিলুম বুঝি?

বলে স্বাতি হেসে উঠল।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। আজ তার চোখ জলভরা মেঘের মতো নয়, কৌতুকে আজ তার দৃষ্টি ঝলমল করছে। কিন্তু সেদিন এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতি আমার দেহমন অসাড় করে দিয়েছিল। আমি তাকে সমর্থন করতে পারি নি, প্রতিবাদ করবার মতো কোন যুক্তিও খুঁজে পাই নি। আমি নির্বাক নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলুম। আজও আমি কী বলব ভেবে পেলুম না।

স্বাতি বলল: কী হল, কথা বলছ না যে!

বললুম: হেরে গেছি তোমার কাছে।

স্বাতি বলল: এসব কথা ভুলে গেলেই তুমি জিতবে। নাও, বল এবারে দার্জিলিঙের ইতিহাস।

এমন চট্ করে আমি চিন্তার বিষয় পরিবর্তন করতে পারলুম না, সময় নিলুম অনেকখানি। স্বাতি আমাকে এই সময় দিতে আপত্তি করল না। বলল: দার্জিলিঙ নামটা কোথা থেকে এল তাই বল আগে।

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল। বললুম: তিব্বতী ভাষায়

দোর্জে মানে বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র, আর লিঙ মানে স্থান। দার্জিলিঙ শব্দেব মানে তাই বজ্রের দেশ। একদা অবজারভেটরি হিলের উপরে একটি বৌদ্ধ গোম্ফা ছিল, তারই নাম ছিল দোর্জেলিঙ বা দার্জিলিঙ। এই গোম্ফাটি ঘিরে তখন এখানে ছিল গোটাকতক কুঁড়েঘর, আর কিছুই ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একবার ও শেষের দিকে আর একবার সিকিমের মহারাজা ভুটিয়া ও গুর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। গুর্খা নামে একটি পার্বত্য জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং দেখতে দেখতেই তারা পাঞ্জাব থেকে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের সমগ্র পাদদেশ জুড়ে রাজত্ব বিস্তার কবেছিল। এই রাজ্যেরই নাম নেপাল। গুর্খারা নিজেদের রাজ্য নেপাল থেকে বৃটিশ রাজ্যে ঢুকে যখন তখন লুটপাট করত। এবং শেষ পর্যন্ত গুর্খাদের সঙ্গে বৃটিশের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। বড়লাট হেস্টিংস ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু প্রথমে সুবিধা করতে পারেন নি, বারে বারে তাঁর পরাজয় হচ্ছিল। দু বছর পরে গুর্খারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়, আর এই সন্ধির শর্ত অনুসারে এক দিকে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অন্য দিকে নেপালের তরাই অঞ্চল ও সিকিমের উপর অধিকার তাদের ছেড়ে দিতে হয়। আরও দু বছর পরে সিকিম ও নেপাল সীমান্তে বিবাদ বাধলে ক্যাপ্টেন লয়েড এলেন বিবাদ মেটাতে। এই অঞ্চলটি তাঁর খুব ভাল লাগল, নিজেদেয় জন্য একটা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের ইচ্ছায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তারপরে সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন এই জেলাটি। ১৮৯১ সম্বতের ৯ই মাঘ যে দলিলের উপরে রাজার মোহর পড়ল তা খুবই ছোট।—

The Governor General having expressed a desire for the possession of the hill of Darjeeling on account

of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government suffering from sickness to avail themselves of its advantages.

I, the Sikkimputtee Rajah, out of friendship to the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is all the land south of the great Rangeet River, east of Balasum, Rahail and Little Rangit Rivers, and west of the Rungpee and Mahanuddy Rivers.

বড়লাট তাঁর অসুস্থ কর্মচারীদের জন্য দার্জিলিঙ পাহাড়টি চেয়েছেন বলে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সিকিমপতি রাজা এই অঞ্চলটি তাঁকে উপহার দিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী দার্জিলিঙ জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কয়েকটি কুঁড়েঘর থেকে এত বড় একটা শহর গড়ে উঠেছে?

আমি বললুম: একদিনে তো এতবড় হয় নি, হয়েছে ধীরে ধীরে। ক্যাপ্টেন লয়েড ও ডক্টর চ্যাপম্যান এসেছিলেন দার্জিলিঙের অধিকার নিতে। কিন্তু চার বছর পরে ডক্টর ক্যাম্পবেল এলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। দার্জিলিঙে তিনি বাইশ বছর কাটিয়েছেন। আর তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় এই শহরটি গড়ে উঠেছে। ডক্টর ক্যাম্পবেল যখন এসেছিলেন তখন এখানে কুড়িটি পরিবার ছিল, এখন এখানে চল্লিশ হাজার লোকের বাস।

স্বাতি হঠাৎ আমার হাতের উপরে একটা চিমটি কাটল। আমি তখনি থেমে গেলুম। বুঝতে আমার কষ্ট হল না যে হয় আমাকে উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনতে হবে, নয় চোখ মেলে দেখতে হবে চারিধারে। বোধহয় কিছু শুনতে হবে, দেখবার হলে চিমটি না কেটে সে কথা কইত। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কানে এল: ও নো, ইউ আর নটি।

আমার ঠিক পাশ থেকেই এই নারী কণ্ঠের ভর্ৎসনা এল। আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম। পাশে তাকিয়ে দেখবার সাহস আমার হল না।

এবারে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনলুম : চল তাহলে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতেই আমি তাঁকে দেখতে পেলুম। প্রথমেই চোখ পড়ল তাঁর সরু পায়ের পাৎলুন ও ছুঁচলো জুতোর দিকে। উপরের দিকে তাকিয়ে তাঁব টুপি দেখলুম আর কালো চশমা, নাকের নিচে সরু গোঁফ, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। মোটাসোটা ভারি চেহারা দেখে বয়সে প্রৌঢ় বলেই মনে হল।

মহিলার বয়স কাঁচা, ছিপছিপে চেহারা। ভারি জরির আঁচল ও বড় ব্যাগটা সামলে নিয়ে উঠে পড়লেন। তারপরে হাল্কা জুতোব খট্‌খুট আওয়াজ তুলে ভদ্রলোককে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল : বোধহয় দ্বিতীয় পক্ষ।

আমি বললুম : বোধহয় কোন পক্ষই না।

স্বাতি চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে বসল। আমি হেসে বললুম : আমাদের কোন্ পক্ষ ?

এবাবে স্বাতিও হাসল, বলল : ও নো, ইউ আর নটি।

দুষ্টু আমি, না তুমি! যাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পার না, তার কাছে উড়ে চলে এলে কেন!

এ কথার উত্তর দিতে স্বাতি এক মুহূর্ত দেরি করল না, বলল : এ ফ্রেণ্ড ইন্ নীড ইজ্ এ ফ্রেণ্ড ইন্‌ডীড্।

আমি বললুম : দুঃখের দিনেই বন্ধু চেনা যায় সত্যি। কিন্তু তোমার এই কথা শুনে আমার মিত্রার কথা মনে পড়ছে। এই রকম বড় বড় কথা সে চাওলাকে বলত, আর বেচারা চাওলা অন্ধকার দেখত চোখে।

সকৌতুকে স্বাতি বলল : তুমি চোখে অন্ধকার দেখছ না ?

আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এইবারে হয়তো আলো দেখতে পাব।

ঐ দেখ।

বলে স্বাতি আমাকে আঙুল দিয়ে এক ধাবে দেখাল। উনুনের ধোঁয়ার মতো হাল্কা মেঘ সেই দিকে জড়ো হচ্ছে, আব ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তাকে অন্য ধাবে চেয়ে দেখতে বললুম। সকালের উজ্জ্বল আলোয় সে দিকটা ঝলমল করছে।

স্বাতি বলল : না, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলে চলবে না। এখানে আমাদের অনেক কাজ আছে।

সবিনয়ে বললুম : কী করতে হবে বল।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল : বিশ্রাম তো হয়েছে, এইবারে ধীরে ধীরে এগোনো যাক।

বলে অবজারভেটরি হিলের দিকে এগোতে লাগল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : কোথায় চললে ?

স্বাতি বলল : ভয় পাচ্ছ কেন! এগিয়ে এস না। দার্জিলিঙ তো আমার কাছে নতুন জায়গা নয়, এর আগেও এসেছিলাম।

সত্যি নাকি!

বলে আমি তার পাশে পাশে চলতে লাগলুম।

স্বাতি বলল : অনেক দিন আগের কথা, কিন্তু কত দিন আগের তা ঠিক মনে পড়ছে না। এই পথ ঘাট দোকান পাট তবু পরিচিত মনে হচ্ছে।

পূর্ব জন্মের স্মৃতি নয় তো!

স্বাতি বলল : জন্মান্তর তো হয়েছে। সেবারে বাবা মার সঙ্গে রেলগাড়িতে চেপে এসেছিলাম দু দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে। আর এবারে—

চোখ বন্ধ করে মালা জপ করতে করতে এসেছ জানি। তাই এবারের কথা থাক, সেবারে পথের শোভা কেমন দেখেছিলে তাই বল।

স্বাতি বলল : শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ আমরা ট্রেনে আসব, না ট্যাক্সিতে, এই নিয়েই প্রথমে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কলকাতা ছাড়বার আগে নানা জনে নানা কথা বলেছিলেন বাবাকে। কেউ

বলেছিলেন, ট্যাক্সিতে গেলে বেলা বারোটার আগেই দার্জিলিঙে পৌঁছনো যায়। তারপর খাওয়া দাওয়া করে একটা লম্বা ঘুম। আবার কেউ বলেছিলেন, ঘুমোবার জন্যে তো যাওয়া নয়, চোখ বুঁজে যাবার কোন মানে হয় না। অন্তত প্রথমবার ট্রেনে চেপে যেতেই হবে, পথের এমন সুন্দর দৃশ্য এ দেশের আর কোথাও নেই। শেষ পর্যন্ত ট্রেনেই আমরা এসেছিলাম। দার্জিলিঙ পৌঁছতে বেলা ছুটো বেজে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে কষ্ট হয় নি কিছু। শিলিগুড়িতে ছোটাহাজরি খেয়েছিলাম, আর ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলাম কার্সিয়ঙে।

আমি হেসে বললুম: খাবার কথাটাই তোমার আগে মনে পড়ল!

স্বাতি বলল: ঐটিই তো জীবনের প্রথম কথা। পেটে ক্ষিদে থাকলে কিছুই ভাল লাগে না।

তর্কের কথা থাক, এবারে পথের কথা বল।

স্বাতি বলল: পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আমরা আসি নি, আমরা এসেছিলুম সকরিগলি ঘাটে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে। ফরাক্কার পথ তখনও তৈরি হয় নি। শুনেছিলাম যে আর কিছু দিন পরে বড় লাইনের গাড়িতেই কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আসা যাবে। গঙ্গার উপরে পুল তৈবি হয়ে গেলে স্টিমারেও আর গঙ্গা পার হতে হবে না।

আমি বললুম: এখন বড় লাইনের গাড়িই আসছে। তবে শিলিগুড়িতে নয়, নিউ-জলপাইগুড়ি নামে নতুন স্টেশন তৈরি হয়েছে। শুধু ব্রড গেজ নয়, মিটার ও ন্যারো গেজের ট্রেনও সেখানে আসে। কিন্তু স্টেশনের নাম শুনে যেন ভুল করো না। নিউ-জলপাইগুড়ি স্টেশন শিলিগুড়ির কাছে, জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূরে।

তবে এ রকমের নাম হল কেন?

বোধহয় রাজনৈতিক কারণে। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বলেই বোধহয় নিউ-শিলিগুড়ি নাম বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সে কথা থাক, তুমি তোমার কথা বল।

স্বাতি বলল: আমরা শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে নেমেছিলাম। সেও নতুন স্টেশন, একধারে মিটার গেজ ট্রেন, অন্যধারে দার্জিলিঙের টয় ট্রেন।

আমি বললুম: এ আবার কী নাম?

স্বাতি বলল: এই নামই তো শুনি সকলের মুখে।

মন্দ নাম নয়। দার্জিলিঙের ন্যারো গেজ শুনেছি অন্য জায়গার চেয়ে ছ ইঞ্চি কম, আড়াই ফুটের বদলে মাত্র দু ফুট চওড়া লাইন।

তখন আমরা ছোট একটি পার্কের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলুম। জনকয়েক ছেলেমেয়ে ভিতরে খেলা করছে, আর কয়েকজন আছে বসে। পরে মিস্টার গিরির কাছে শুনেছিলুম যে এই জায়গাটির নাম ব্রাবোর্ন পার্ক, সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। আমরা পাশ কাটিয়ে অবজারভেটরি হিলের পথ ধরলুম।

স্বাতি বলল: দার্জিলিঙের গাড়ি যে এমন মজার, আগে আমরা তা বুঝতে পারি নি। দেরিতে পৌঁছেছিলাম বলে ছুটতে ছুটতে এসেছিলাম নতুন গাড়ির কাছে। খেলনার মতো ছোট গাড়িতে শুধু বসবার জায়গা আছে, শোবার ব্যবস্থা নেই, বাক্সবিছানাও বোধহয় এ গাড়িতে ঢুকবে না। বাবা বললেন, আমাদের কুলিরা গেল কোথায়? মা বললেন, তাই তো, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। চট করে আমি চারিদিকটা দেখে ফিরে এলাম, কেউ কোথাও নেই। উদ্বিগ্ন ভাবে বাবা বললেন, এইখান থেকেই ফিরতে হবে নাকি! বলে তিনি একজন রেলের লোককে ধরলেন। সে ভদ্রলোক হেসে বললেন, কেউ আপনার মাল নিয়ে পালায় নি। পিছনের মালগাড়িতে তুলে দিয়ে এখুনি পয়সা নিতে আসবে।

আমি হেসে ফেলেছিলুম।

আমার হাসি দেখে স্বাতি বলল : হাসি নয়, তখন আমরা ঘেমে উঠছিলাম। ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম কুলিদের দেখতে। কিন্তু তাদের দেখতে পেয়েও নিশ্চিন্ত হই নি।

কেন?

কুলিরা সকলেব মালপত্র একটা মালগাড়িতে তুলে দিচ্ছে, কিন্তু কোন রসিদ কাটবার ব্যবস্থা নেই। দার্জিলিঙে পৌঁছে যদি নিজেদের মাল খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে কাউকে কিছু বলবাব নেই। গার্ড সাহেব অবশ্য ভরসা দিয়ে বললেন যে এ রকমের ঘটনা ঘটে না। নিরুপায় হয়ে আমরা ছোটখাট মালপত্র নিয়ে নিজেদের গাড়িতে ফিরে এলাম। ছোটাহাজরি খেলাম, তারও অনেক পবে গাড়ি ছাড়ল।

স্বাতি একটু থেমে বলল : আমরা ভেবেছিলাম যে স্টেশন ছেড়েই আমরা পাহাড় দেখতে পাব, কিন্তু যত দূব মনে পড়ে পরের স্টেশন পর্যন্ত আমরা সমতল ভূমিব উপর দিয়েই এসেছিলাম। তাব পরে শুরু হয়েছিল চড়াই।

আমাদের সামনেও চড়াই পথ, কিন্তু সে পথ ধরবার আগে থমকে দাঁড়াতে হল। পিছনে একটা চীৎকার শুনতে পেয়েছিলুম। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম যে মিস্টার গিরি আসছেন ছুটতে ছুটতে। স্বাতি তাঁব দিকে এগিয়ে গেল।

কাছে এসে মিস্টার গিরি বললেন : আমি জানতাম যে আপনাদের এখানে পাব।

নমস্কার করে স্বাতি বলল : কী করে জানলেন?

মিস্টার গিরি বললেন : দার্জিলিঙে এসে প্রথম দিনে সবাই আসেন এই চৌরাস্তায়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে অবজারভেটরি হিলে গিয়ে ওঠেন। আমি আপনাদের ডিস্টার্ব করলাম না তো।

বলে সচকিতে একবার স্বাতির দিকে ও আর একবার আমার

দিকে তাকালেন। আমি কিছু বলবার আগেই স্বাতি বলল: আপনার কথাই যে আমাদের মনে এসেছিল।

খুশী হয়ে মিস্টার গিরি বললেন: সত্যি নাকি!

আমি বললুম: স্বাতি দার্জিলিঙে এসেছিল ছেলেবেলায়, ট্রেনে চেপেই এসেছিল, কিন্তু পথের কথা সব ভুলে গেছে।

স্বাতি বলল: সব কথা কি ভুলেছি, মনেও আছে অনেক কিছু। তিনধারিয়া নামে একটা স্টেশনে এক সঙ্গে তিনখানা ট্রেন দেখেছিলাম পাহাড়ের গায়ে।

মিস্টার গিরি বললেন: ঠিকই দেখেছেন। শিলিগুড়িতে দার্জিলিঙ মেল দেখে একখানাই ট্রেন মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। এক লাইনেই তিনখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। এক একটা ইঞ্জিন তিন চারখানা প্যাসেঞ্জার কোচ আর দু একখানা মালগাড়ি নিয়ে দশ পনর মিনিট পর পর ছাড়ে, দার্জিলিঙেও পৌঁছয় একখানার পর আর একখানা। তিনধারিয়ায় এই তিনখানা ট্রেনই দেখা যায় এক সঙ্গে। আরও কয়েক জায়গায় দেখা যায়।

এর পরে পাহাড়ে উঠতে উঠতে মিস্টার গিরির কাছেই আমরা পুরনো দার্জিলিঙ-হিমালয়ান রেল পথের কথা শুনলুম। সে এক বিচিত্র কাহিনী। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রেল পথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, আর শেষ হয়েছিল দু তিন বছর পরে।

মিস্টার গিরি বললেন: এক মহিলার বুদ্ধিতে এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল: একটা ইন্টারেস্টিং গল্প মনে হচ্ছে।

মিস্টার গিরি বললেন: স্যার অ্যাশ্‌লি ইডেন আর মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন প্রেস্টেজ এই রেল পথ পেতেছিলেন। আমি যে মহিলার কথা শুনেছি, তিনি কার মেমসাহেব জানি নে। কাজেই কোন সাহেবের গল্প তা সঠিক বলতে পারব না। অনেক পরিশ্রম ও

অধ্যবসায়ে তিনি লাইন পাতছিলেন, কিন্তু আধখানা পাহাড় উঠবার পরে কাজ আটকে গেল, আর উপরে উঠবার উপায় নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে চক্কর কেটে এগুনো যায় না। সামনের পাহাড় এমনি বেয়াড়া যে দু ধার কেটে মাঝখান দিয়ে যাওয়াও অসম্ভব, আবার এতখানি সমতল জায়গা নেই যে লুপ তৈরি করে নিচের লাইনের উপর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও ভাবছেন কাজের কথা। ডিনারেব সময় হয়েছে। কিন্তু সাহেবের হুঁশ নেই। মেমসাহেব তাড়া দিয়ে বললেন, অত ভাবনা কিসেব। অন্যমনস্কভাবে সাহেব বললেন, সামনে যে আর এগোতে পারছি না। তৎপর ভাবে মেমসাহেব বললেন, তবে পিছিয়ে এস। সাহেব চমকে উঠলেন, কী বললে। মেমসাহেব কথাটা বুঝিয়ে বললেন, সামনে যেতে না পার তো পিছিয়ে এস। সাহেব লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে, বললেন, ঠিক বলেছ। পরদিন রাত থাকতেই সাহেব কাজে দৌড়লেন। রেল পথেব ইতিহাসে নতুন জিনিস তৈরি হল, তার নাম রিভার্স, সাধারণ লোকে বলে জিগজ্যাগ। পাহাড়ে উঠতে উঠতে ট্রেন এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। পয়েন্ট ম্যান দাঁড়িয়ে থাকে নিশান হাতে, লাইন বদলে পিছনে যেতে বলে খানিকটা, তারপর আবার পয়েন্ট বদলে দেয়, নতুন পথ ধরে ট্রেন উঠে যায় উপরে, স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। এই ছোট রেল পথে এমন জিগজ্যাগ আছে কয়েকটা। প্রথম জিগজ্যাগটি হল চুনাভাটির কাছে। নিশ্চয়ই মনে আছে এই জিগজ্যাগের কথা ?

লজ্জিতভাবে স্বাতি বলল : না।

ফেরার সময় তাহলে ট্রেনে যাবেন, ভাল লাগবে এই কায়দাটি দেখতে। আর একটি কায়দার নাম হল লুপ, ঘুমে যাবার পথে বাতাবিয়া লুপ পড়বে, দেখিয়ে দেব। নিচে থেকে ট্রেন এসে পাক দিয়ে উঠে যায় একটা পুলের উপর দিয়ে।

আমরাও খাড়া পথে পাহাড়ে উঠছিলুম। নিঃশ্বাস নিতে কিছু কষ্ট হচ্ছে। স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর প্রশ্ন করল মিস্টার গিরিকে: পথের কথা কিছু বলবেন না?

মিস্টার গিরি ভালবাসেন কথা বলতে, বললেন: মহানদীর পুল আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে?

কথা না বলে স্বাতি এবারে শুধু মাথা নাড়ল।

মিস্টার গিরি বললেন: শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়েই তো মহানদীর পুল। শুক্‌না পর্যন্ত সাত মাইল পথ আসবেন সমতলভূমির উপর দিয়ে। তারপরে বন আর পাহাড়, ভূগোলের ভাষায় এরই নাম তরাই অঞ্চল। ছোট গাড়ি, ছোট ইঞ্জিন, চলেও ধীরে ধীরে। মনে হবে যেন গাড়ির সঙ্গে হেঁটেই চলা যায়।

আমি বললুম: আমার এক বন্ধুর ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি যে তাঁদের আমলে গাড়িতে বাথরুম ছিল না, চলতি গাড়ি থেকে তাঁরা লাফিয়ে নামতেন, আবার দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠতেন।

বাজে কথা।

বলে স্বাতি হেসে উঠল।

মিস্টার গিরি কিন্তু হাসলেন না, বললেন: বাজে কথা নয়, আমিও এ রকম কথা শুনেছি। আর বুনো জানোয়ারের অত্যাচার যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শুক্‌নার পরের স্টেশন রঙটঙেই নাকি দশ বছরে একশোটা মানুষ বাঘের পেটে গেছে।

সত্যি।

আমি বললুম: বুনো হাতিও নেমে আসত রেল লাইনের ওপর। আর দেশলায়ের বাক্সের মতো ছোট গাড়িতে যাত্রীরা বসে থাকত ভয়ে কাঠ হয়ে। ট্রেনের ড্রাইভার আগুন জ্বালত ইঞ্জিনের ওপরে, আর ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হাতি তাড়াত। বুনো জন্তু তাড়াবার সমস্ত সরঞ্জাম থাকত ইঞ্জিনে।

মিস্টার গিরি বললেন: বালি ছড়ানোর ব্যবস্থা এখনও আছে।

জলে বা হিমে গাড়ির চাকা পিছলে যায় বলে লাইনের ওপরে বালি ছড়ানো হয় চলন্ত ইঞ্জিন থেকে।

সাগ্রহে স্বাতি বলল : তারপর ?

মিস্টার গিরি বললেন : রঙটঙের পর চুনাভাটি, তারপরে তিন-ধারিয়া। এইখানেই এই ছোট লাইনের গাড়ি ও ইঞ্জিনের কারখানা বলে জায়গাটা বেশ জমজমাট। দৃশ্যও মনোরম। পূর্বদিকে যে রুক্ষ পাহাড় দেখা যায় তা ভুটানের, দক্ষিণে বাঙলার সমতলভূমি। কিন্তু এর চেয়েও মনোবম দৃশ্য দেখবেন গয়াবাড়ি স্টেশনটি পেরিয়ে। পাগলা ঝোরার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।

আমরা এক সঙ্গে বললুম : শুনেছি।

কী অপরূপ দৃশ্য বলুন সেই জলপ্রপাতেব।

আমি বললুম : সত্যিই অপরূপ।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি দেখেছ নাকি।

ছবিতে দেখেছি, আর দেখেছি সত্যেন দত্তের কবিতায়—

তোমরা কি কেউ শুনবে নাকো
পাগলা ঝোরার দুঃখ গাথা ?

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : দুঃখ গাথা কেন ?

আমি বললুম : রেললাইন পাতবার জন্যে বোধহয় তাকে বাঁধা হয়েছে।—

ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু,
আমায় কিনা বাঁধলে শেষে।

মিস্টার গিরি বললেন : ঠিক কথা। এই পাহাড়ে ছ ঘণ্টায় চোদ্দ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয় আর উন্মত্ত হয়ে ওঠে পাগলা ঝোরা। প্রতি বছর রেল লাইনের অনেক ক্ষতি করত বলে এখন তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। কার্সিয়াঙে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা গয়াবাড়ি গিয়ে পাগলা ঝোরা দেখে আসেন। মাঝখানে ছোট একটি স্টেশন, তার নাম মহানদী। মহানদী নামটা আপনাদের দেওয়া, লেপচা নাম হল

মহলদী, তার মানে বাঁকা নদী। যে অরণ্যময় পাহাড় থেকে এই নদী নেমেছে তার নামও মহলদী।

স্বাতি হেসে জিজ্ঞাসা করল : এদেশে সোজা নদী নেই ?

মিস্টার গিরিও উত্তর দিলেন হেসে, বললেন : তিস্তার নাম রংপো, রংপো মানে সোজা নদী।

চড়াই পথ ধীরে ধীরে উঠবার সময়ে আমাদের কার্সিয়াঙের কথা হল। কার্সিয়াঙ সত্যিই একটি সুন্দব পাহাড়ী শহর। উচ্চতায় পাঁচ হাজার ফুটের কিছু কম, কতকটা আলমোড়ার মতো মধ্যবিত্ত শহর। শীত কম, বাড়িভাড়া কম, দার্জিলিঙের মতো সৌখিন শহর নয় বলে জীবনযাত্রার খরচও কম। অথচ শহরের সমস্ত সুবিধা আছে। শহরই তো, মহকুমা শহর। কোর্ট কাছারি আছে, দুটি বিলিতি স্কুল আছে—ডাওহিল ও ভিক্টোরিয়া স্কুল, বাঙালী ও পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের জন্যেও হাইস্কুল আছে, বনবিদ্যার বিদ্যালয় পর্যন্ত। কার্সিয়াঙে আর একটি আশ্চর্যের জিনিস এই যে সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠান সেখানে আছে—হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মসজিদ গির্জা, রামকৃষ্ণ মিশন, কপিল আশ্রম, সনাতনীদের মন্দির, জেসুইট রোমান ক্যাথলিকদের কলেজ, বিদেশী অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য গোয়েল মেমোরিয়াল স্কুল। রেলওয়ের অফিসও এই কার্সিয়াঙে।

আমি স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলুম : তোমরা যাও নি কার্সিয়াঙে ?

স্বাতি বলল : দার্জিলিঙ থেকে বেড়াতে এসেছিলুম একদিন, কিন্তু কিছুই মনে নেই। একটা বাজারের কথা আর কয়েকটা রাস্তার নাম মনে আছে। ট্রেনে যেতে যেতেই বাজারটা আমরা দেখেছিলাম, আর রাস্তার নাম মনে পড়ছে ডাওহিল রোড আর পাঙ্খাবাড়ি রোড।

আর কিছু ?

একটা পাহাড়ের নাম শুনেছিলাম। সেখানে উঠলে নাকি এক দিকে বরফ পাহাড় ও অন্য দিকে সমতলভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

মিস্টার গিরি বললেন : সেই পাহাড়ের নাম ঈগল্‌স্‌ ক্রেগ। ঘুম পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে নি, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশে জানু ও কাব্রু পাহাড়ও দেখা যায়। অন্য দিকে বাঙলার সমতলভূমিতে দেখা যায় তিস্তা মহানদী বালাসন, নেপাল সীমান্তের মেচী নদী আর বুনো হাতির মোরুং বন। পরিষ্কার দিনে নেপালের দুটি নদীও দেখতে পাওয়া যায়।

পথের ধারে আমরা একটা বড় হোটেল দেখেছিলুম, জনকয়েক সাহেব মেমকেও দেখেছিলুম রোদ পোয়াতে। এখন আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যে আর একটু পরেই পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাব। মিস্টার গিরি থামতেই আমি বললুম : তারপর ?

মিস্টার গিরি সংক্ষেপে বললেন : তারপরে টুং সোনাদা ও ঘুম। ঘুমই এ লাইনের সবচেয়ে উঁচু স্টেশন, ৭২০৭ ফুট। তারপরে গড়িয়ে নেমে আসুন দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙ থেকে আপনারা নেপাল সিকিম ও ভুটান দেখতে পাবেন, কিন্তু বাঙলার সমতলভূমি আর দেখতে পাবেন না।

আমি বললুম : সোনাদায় আগে ভালুকের উপদ্রব ছিল বলে শুনেছি।

মিস্টার গিরি বললেন : সোনাদার মানে কি জানেন ? ভালুকের গুহা। নিশ্চয়ই কোন সময় ভালুকের উপদ্রব ছিল, তা না হলে এমন নাম হয়েছে কেন !

পথের ধারে স্থানে স্থানে পড়েছে সূর্যের আলো, আবার বড় বড় গাছে[illegible] পড়েছে। দার্জিলিঙ শহরের বুকের উপরে এই [illegible] ঠিক গন্ধমাদন পর্বতের মতো মনে হচ্ছে। কোন হনুমান [illegible]হাড়টি তুলে এনে এইখানে যেন বসিয়ে দিয়েছিল। উপরে ওঠানামার এই একটি মাত্র পথ। আমরা হাঁপাচ্ছিলুম, কিন্তু মিস্টার গিরি উঠছিলেন স্বচ্ছন্দে। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিস্টার গিরি বললেন : আর উঠতে হবে না, এবারে আসুন এই দিকে।

১৩

দার্জিলিঙ নাম কেন হল এ নিয়ে নানা রকমের আলোচনা শুনতে পাওয়া যায়। বাঙালীরা বলে যে একদা এই পাহাড়ের উপরে ছিল দুর্জয় লিঙ্গ শিব। গুর্খা আক্রমণের সময় তিনি এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই শিবের নামেই জায়গার নাম দার্জিলিঙ হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় লেপচারা বলে, না, দার্জিলিঙ শব্দের একটা মানে আছে। দোর্জে মানে ইন্দ্রের বজ্র, আর লিঙ মানে স্থান। বজ্রের দেশ বলে এই পাহাড়ের দার্জিলিঙ নাম। গত শতাব্দীতে এই পাহাড়ের উপরে একটা গোম্ফা ছিল, সেই গোম্ফায় লামা ছিলেন দোর্জে, দোর্জে লামাব একটি সমাধি আজও এখানে আছে। আর আছে হনুমান ও কালীর স্থান। অনেকে এই পাহাড়কে মহাকাল পাহাড় বলেন, আর প্রণাম করেন মহাকাল শিবকে।

মিস্টার গিরি বললেন: ভুটিয়া বস্তিতে এখন যে গোম্ফা আছে, এক সময় তা এই পাহাড়ের উপরেই ছিল। দার্জিলিঙ আক্রমণ করে গুর্খারা এই গোম্ফাটি ভেঙে দিয়ে যায়। তারপরে এটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চৌরাস্তার নিচে ভুটিয়া বস্তিতে। পুরনো জায়গাটিও কিন্তু অনাহত নয়।

বলে সেইখানে আমাদের নিয়ে গেলেন।

নানা রঙের নিশান উড়ছে বাঁশের ডগায়। মন্ত্রপূত এই সব নিশান ভক্তরাই টাঙিয়ে দিয়ে যায়। পাহাড়ীরা আসছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়াচ্ছেন। একটা পবিত্র গম্ভীর ভাব সারাক্ষণ এখানে বিরাজ করছে।

এ সব দেখে আমরা চূড়ার দিকে এগিয়ে গেলুম। একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তরের দিগন্ত দেখা যায় অবারিত ভাবে। হিমালয়ের মহিমা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের এ এক

অপরূপ রূপ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

খানিকক্ষণ আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য দেখলুম। তারপরে কথা কইলেন মিস্টার গিরি, বললেন: বিশ হাজার ফুটেরও উঁচু গিরিশৃঙ্গ এখানে কুড়িটির বেশি আছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: সত্যি!

মিস্টার গিরি বললেন: বিশ হাজার ফুটের নিচু গিরিশৃঙ্গ কতগুলো আছে, তার হিসেব আমি জানি না। আমরা যে পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি, তার নাম জানেন?

তৎপরভাবে স্বাতি বলল: অবজারভেটরি হিল।

স্বাতির উত্তর শুনে মিস্টার গিরি হাসলেন।

আমি বললুম: দার্জিলিঙ পাহাড়।

মিস্টার গিরি বললেন: দার্জিলিঙ হল শহরের নাম, আর পাহাড়ের নাম শিংলীলা। শিংলীলা একটি গিরিশ্রেণী আর এই পাহাড়ের গা বেয়েই আপনারা এখানে এসেছেন।

আমরা এই নতুন নাম শুনে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

খুশী হয়ে মিস্টার গিরি বললেন: সামনের ঐ পাহাড়কে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা বলি, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা চূড়োর নাম, আর প্রত্যেকটি চূড়োর এক একটি নাম আছে। আসুন এই দিকে।

বলে একটি ঘরের নিচে টেনে আনলেন। সেখানে একটি মানচিত্র আছে পাহাড়ের, আর নাম লেখা আছে প্রত্যেকটি গিরিশৃঙ্গের। ঐ মানচিত্র দেখে পাহাড়ের নামগুলি অনায়াসেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। স্বাতি বলল: নক্সাটা টুকে নিলে তোমার সুবিধে হত।

আমি বললুম: মন তাহলে চটে যাবে, যা মনে রাখতে পারে তাও আর রাখবে না।

স্বাতি আমার কথা মেনে নিল, বলল: কথাটা মিথ্যে নয়। টুকে রেখে দেখেছি যে সময় মতো সে কথা মনেই থাকে না,

কদাচিৎ মনে পড়লেও সেই টোকা জিনিস আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাজেই আমরা পাহাড়ের চূড়োগুলি ভাল করে চিনে নেবার চেষ্টা করলুম। মিস্টার গিরি বললেন: সবচেয়ে পশ্চিমে হল কাঙ আর কোকটাঙ। তারপরে জানু ছোট কাব্রু ও কাব্রু। জানু পঁচিশ হাজার ফুটের বেশি, আর কাব্রু চব্বিশ হাজার ফুট। তার পরের নিচু শিখরটির নাম জেম। এইবারে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন তালুঙ ও পান্দিমের মাঝখানে। বাঁয়ে তালুঙ তেইশ হাজার ফুট, আর ডানে পান্দিম বাইশ হাজার, মাঝখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮১৫৬ ফুট।

মিস্টার গিরি একটু থেমে বললেন: এইবারে পূর্বের শিখরগুলি চিনে নিন। এপাশে জুগনু আর ওপাশে নরসিং বিশ হাজারের নিচে, মাঝখানে সিম্ভু প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার। আপনাদের অনেকে নরসিংকে নরসিংহ আর সিম্ভুকে স্বয়ম্ভু পাহাড় বলেন। নরসিংএর পাশে সিনিয়লচু চোমিয়ামো কাঞ্চনমাও ডঙ্খিয়া-রি পাহাড়ও সিম্ভুর সমান উঁচু।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: দাঁড়ান, এই কয়েকটি পাহাড়ই ভাল করে চিনে নিই।

মিস্টার গিরি বললেন: তা হলেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চেনা হয়ে যাবে।

স্বাতি আমাদের কথায় কান দেয় নি, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরে বলল: এই পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কী মনে হচ্ছে বল তো?

আমি বললুম: কাঞ্চনজঙ্ঘা একা হলে নিশ্চয়ই এত ভাল লাগত না।

মিস্টার গিরি হেসে বললেন: এখানে একা এলে আপনারও এমন ভাল লাগত না।

তারপরে আমরা পাহাড় থেকে নামতে লাগলুম

মিস্টার গিরি বললেন ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটিরও একটি মানে আছে। ক্যাং মানে তুষার, চেন মানে বৃহৎ, আর জোঙ্গা মানে পাঁচটি ধনভাণ্ডার। সত্যিই এটি একটি বরফের বিরাট ভাণ্ডার। সমস্ত দার্জিলিঙ শহর সারাক্ষণ এই পাহাড়ের মহিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছে।

স্বাতি বলল ঃ সত্যিই তাই। দার্জিলিঙে বোধহয় এমন কোন জায়গা নেই, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না।

আমি বললুম ঃ এখন আমরা হোটেলে ফিরব তো!

ব্যস্ত ভাবে স্বাতি বলল ঃ কেন, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে!

বললুম ঃ কষ্টের কথা নয়, উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোথায় ঘুরে বেড়াবে!

স্বাতি বলল ঃ মিস্টার গিরির বোধহয় অফিসের সময় হচ্ছে।

মিস্টার গিরি বলে উঠলেন ঃ না না, আমার জন্যে ভাববেন না, আমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না। আপনার যদি কষ্ট না হয় তো এবেলা আর একটা জায়গা দেখিয়ে দিই—ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম। চৌরাস্তা থেকে পাঁচ মিনিট লাগবে পৌঁছতে।

স্বাতি বলল ঃ আপনার কাজের ক্ষতি না হলে আমাদের আর আপত্তি কী!

মিস্টার গিরি বললেন ঃ এই মিউজিয়াম আর মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট দেখার একটু অসুবিধা আছে। সকাল নটা থেকে দুপুর একটা, তারপর তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। ভাবছি যে এবেলায় আপনাদের মিউজিয়াম দেখাব, আর বিকেলে নিয়ে যাব মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে।

স্বাতি বলল ঃ কিন্তু বিকেল পাঁচটার আগে আপনি আসবেন কী করে?

মিস্টার গিরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন ঃ আপনারা তো এখানে চিরকাল থাকবেন না, কিন্তু আমাদের অফিস থাকবে।

নিচে নামতে নামতে মিস্টার গিরি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, বললেন : দেখেছেন, কী ভুল হয়ে গেল !

স্বাতিও দাঁড়াল, বলল : ভুল আবার কী হল !

মিস্টার গিরি বললেন : একটা সুড়ঙ্গ আপনাদের দেখানো হল না। কেউ বলে যে এই সুড়ঙ্গ গেছে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত, কেউ বলে যে কুচবিহারের কালীবাড়ি পর্যন্ত গেছে। চেষ্টা করলে আপনারাও কয়েক হাত এগোতে পারতেন।

আমি দাঁড়াই নি, এগিয়ে যেতে যেতে বললুম : কুচবিহারে ব্রহ্মচারী কালীবাড়ি আছে, কিন্তু সুড়ঙ্গ থেকে বেরবার কোন মুখ নেই। তার চেয়ে আপনার মিউজিয়ামে চলুন।

চলতে শুরু করে মিস্টার গিরি বললেন : আপনি তামাসা করছেন, কিন্তু এই রকমের প্রবাদ কোথায় নেই বলুন।

স্বাতি মেনে নিয়ে বলল : সত্যিই তাই। সুড়ঙ্গের একটা মুখ দেখতে পেলেই আমরা এই রকমের কিছু একটা বলে থাকি।

মিস্টার গিরি বললেন : আরও একটা জিনিস দেখবার ছিল। কতগুলো ছর্টেন বা মণি।

মানে বুঝতে না পেরে আমরা দুজনেই তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মিস্টার গিরি বললেন : লামাদের অনেকগুলো সমাধি আছে পাহাড়ের উপরে। তারই নাম ছর্টেন।

স্বাতি বলল : বাঁশের উপরে নিশান টাঙাবার মানেও আমরা বুঝতে পারি নি।

মিস্টার গিরি বললেন : নিশানের উপরে কালো অক্ষরে মন্ত্র লেখা আছে দেখেছেন !

লক্ষ্য করি নি তো !

আছে। নানা রকমের মন্ত্র লিখে ভুটিয়ারা ঐ সব নিশান টাঙায়। ওদের ধারণা যে হাওয়ায় ভেসে ঐ মন্ত্র পৌঁছয় দেবতার কাছে।

নিজেদের বাড়িতেও ওরা ঐ রকম নিশান টাঙায়। নিশান দেখেই আপনারা ভুটিয়াদের বাড়ি চিনতে পারবেন।

পাহাড় থেকে নামবার সময় আমাদের কোন পরিশ্রম হল না। সেই বড় হোটেলটার পাশ দিয়ে আমরা যেন গড়িয়ে নেমে এলুম। তাবপর এগিয়ে গেলুম মিউজিয়ামের দিকে। বড় রাস্তার ধারে ভিক্টোরিয়া পার্ক, তারই নিচে মিউজিয়ামের ছোট বাড়িটি তখন সবে খোলা হয়েছে। দর্শনী লাগে না, তবে ছবি তোলার জন্য বোধহয় পয়সা দিতে হয়।

লর্ড কারমাইকেলের পবিকল্পনায় এই জাদুঘরটি খোলা হয় প্রায় পঞ্চাশ বছব আগে। পূর্ব হিমালয়ের সব রকম প্রাণী এখানে দেখতে পাওয়া যায়। আব এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। বাঘ দেখে মনে হয় যে জীবন্ত বাঘ দেখছি। আব তেমনি রূপ কীট পতঙ্গ ও প্রজাপতির। পশু পাখিকে তার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। স্বাতি বলল : সত্যিই সুন্দর।

খুশী হয়ে মিস্টার গিরি বললেন : ওপরতলাতেও অনেক কিছু দেখবার আছে।

তারপরে ঘড়িব দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনারা ধীরে ধীরে দেখুন, আমি আসি।

আমি বললুম : সেই ভাল।

নমস্কার কবে দরজার বাহিরে গিয়েও মিস্টার গিরি ফিরে এলেন। বললেন : ফেরার সময় আপনাদের চৌরাস্তা হয়ে ফেরবার দরকার নেই। সামনের পথ ধরে নিচে নেমে যাবেন। বাজারে পৌঁছে স্টেশনের পথ ধরবেন। বিকেলে আমি আসব চারটের সময়। বেরবার জন্যে তৈরি থাকবেন।

স্বাতি হেসে বলল : আচ্ছা।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে হিমালয়ের পশু পাখি ও পতঙ্গ দেখলুম। তারপরে ফিরে এলুম হোটেলে।

বিকেল বেলায় নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই এলেন মিস্টার গিরি। নিচের ডাইনিং হলে বসে আমাদের খবর পাঠালেন। আমরা নেমে এলুম।

মিস্টার গিরি বললেন: বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম তো!

স্বাতি বলল: আপনি আমাদের এখনও চেনেন নি বলেই এ কথা বললেন।

কেন?

আমাদের বিশ্রাম মানে শাস্ত্র আলোচনা। বেদে বা পুরাণে দার্জিলিংএর কথা আছে কিনা, না থাকলে কেন নেই, এক। থাকলে এই সব আমরা আলোচনা করি।

আমি বললুম: ঠাট্টা নয়, কালিকাপুরাণে দুর্জয় গিরির উল্লেখ আছে, হিমালয়ের এই অংশেরই নাম দুর্জয় গিরি। কাজেই মহাকাল শিবকে যাঁরা দুর্জয়লিঙ্গ বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল বলেন না।

আমরা দাঁড়িয়েছিলুম বলে মিস্টার গিরি বললেন: একটু বসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরব বলে যে দশ মিনিট আগে এসেছি। আপনাদেরও তো চা খাওয়া হয় নি।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মিস্টার গিরি তাঁর অফিসের ল্যাণ্ডরোভারখানা নিয়ে এসেছেন। বললেন: উঠে পড়ুন।

বলে আমাদের দুজনকে সামনে তুলে দিয়ে নিজে বসলেন স্টিয়ারিঙে। ড্রাইভার পিছনে উঠল লাফিয়ে।

স্বাতি বলল: আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন?

সকালে বলি নি বুঝি! মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে যাবার আগে দার্জিলিঙ শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দেব।

বলে বাজারের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

একটি প্রশস্ত অঙ্গনে দার্জিলিঙের বাজার বসে। তার চারিদিকে দোকান পাট। লোকজন কোলাহলে ভরা জমজমাট বাজার। এগিয়ে যেতে যেতে মিস্টার গিরি বললেন: এই রাস্তার নাম ছিল কার্ট রোড। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে এসে শেষ হয় নি, সমস্ত বার্চ হিল পাহাড়টা ঘুরে লেবঙ গ্রামে পৌঁছেছে লেবঙ কার্ট রোড নামে।

সহসা বললেন: বাঁ দিকেব এই রাস্তাটি মনে রাখবেন। এই পথে নেমে গেলে পাবেন লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন। ধাপে ধাপে সাজানো এই বাগানটি দেখে অন্য ধারের গেট ধরে বেরবেন। তারপরে পাবেন বাঙালীদের পাড়া চাঁদমারি। ইচ্ছে করলে সোজা বাজারের দিকে আসতে পারেন, পথে একটি সুন্দর মন্দির দেখে নেবেন। আব হাঁটবার ইচ্ছা থাকলে কাকঝোরার দিকে এগিয়ে যাবেন। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ দেখে বর্ধমানের রাজ-বাড়ির পাশ দিয়ে কার্ট বোডে গিয়ে উঠবেন। অত দূর যেতে না চাইলে রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে সানাটোরিয়ামের ধার দিয়ে উঠে পড়বেন। দার্জিলিঙেব শ্মশান আরও নিচে, সেদিকে যাবেন না।

আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলুম। মিস্টার গিরি বললেন: চা বাগান দেখবার ইচ্ছা থাকলে আপনাদেব হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট দেখিয়ে দিতে পারি। এখান থেকে খুব কাছে, দার্জিলিঙ শহরেই বলতে পারেন।

স্বাতি বলল: চা বাগান আমি সত্যিই দেখি নি।

মিস্টার গিরি বললেন: এখুনি যাবেন ?

আমি বললুম: এখন নয়, এখন আমরা যা দেখতে বেরিয়েছি তাই দেখি।

সেই ভাল।

বলে মিস্টার গিরি সমতল পথে জোরে চলতে লাগলেন। বললেন: ডান দিকের এই পাহাড়টা লক্ষ্য করবেন। এরই নাম

বার্চ হিল। চৌরাস্তা থেকে একটা সমতল পথ গেছে পাহাড়ের শেষ পর্যন্ত, আর আমরা এই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলেছি, সমস্ত পাহাড়টা ঘুরে চৌরাস্তার ঠিক নিচে গিয়ে দাঁড়াব। তার মানে বুঝতে পেরেছেন তো!

স্বাতি উত্তর দিল : না।

মিস্টার গিরি বললেন : চৌরাস্তা থেকে এদিকে আমরা নেহরু রোড ও লাডেন লা রোড ধরে স্টেশনে নামি, আর উল্টো দিকে সি আর. দাস রোড ধরে স্টেপ অ্যাসাইডের পাশ দিয়ে ভুটিয়া বস্তি মনাস্টারি হয়ে আমরা লেবঙে পৌঁছুই। চৌরাস্তা থেকে পায়ে হেঁটে নিচে নামলেই লেবঙ, এখন আমরা পাঁচ মাইল পথ ঘুরে যাচ্ছি।

দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আমবা চলেছিলুম উত্তর-পশ্চিমের দিকে। এক সময় পাহাড় শেষ হয়ে গেল, পশ্চিম থেকে আমরা উত্তরে চলে এলুম, তারপব চললুম পূর্ব দিকে। এক জায়গায় মিস্টার গিরি বললেন : দার্জিলিঙের এটা নর্থ পয়েন্ট। খ্রীষ্টানদের কবরখানা আমরা ছেড়ে এসেছি, এখানে সেন্ট জোসেফ্‌স্‌ কলেজ ও হারমন স্কুল।

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমরা এগিয়ে চলেছিলুম, আর মিস্টার গিরি আমাদের সব চিনিয়ে দিচ্ছিলেন। এক সময় বললেন : উত্তরে যে উপত্যকা দেখছেন তার নাম রঙ্গীত ভ্যালি, আর সামনে রঙ্গীত টি এস্টেট।

আরও খানিকটা এগিয়ে পথ আমাদের এঁকেবেঁকে সি. আব. দাস রোডের সঙ্গে মিলে আবার ঘুরে এল। তারপরেই লেবঙের রেস কোর্স দেখতে পেলুম। ছোট একটি গোল মাঠ, তার পরিধি দেখে ঘোড় দৌড়ের মাঠ বলে মনে হয় না। মিস্টার গিরি বললেন : পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রেস কোর্স। দু ফার্লঙের চক্কর, কিন্তু এত উঁচুতে এমন মাঠ আর কোথাও নেই। পল্টনের ছাউনি দেখতে পাচ্ছেন। আসলে এটা ওদের প্যারেড গ্রাউণ্ড। জিমখানা ক্লাব বছরে দুবার ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থা করে। দৌড়য় সব পাহাড়ী

ঘোড়া। বুধবার আর শনিবার দার্জিলিঙের সব লোক আসে এখানে।

মিস্টার গিরি আমাদের নামতে দিলেন না, বললেন: সময় নষ্ট করলে আমাদের চলবে না, ভুটিয়া বস্তির গোম্ফাও আজ আপনাদের দেখাতে পারব না। যে পথে আমরা ফিরব, তার খুব কাছেই। কিন্তু সেখানে গেলে মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট আপনাদের দেখা হবে না।

বলে আগের মতোই বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। এঁকে-বেঁকে আবার আমরা কতকটা সরল রাস্তায় এসে পড়লুম। নর্থ পয়েণ্টের নিকটে মিস্টার গিরি এক জায়গায় রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালেন। বললেন: নামুন এইখানে।

কোন প্রশ্ন না করে আমরা নেমে পড়লুম।

মিস্টার গিরি ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে। স্বাতি আমার দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম মিস্টার গিরির দিকে। মিস্টার গিরি হেসে বললেন: উপরে উঠতে পারবেন না হেঁটে?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: পারিব না এ কথাটি বলিও না আর।

পিছনে তাকিয়ে দেখলুম যে আমাদের ল্যাণ্ডরোভারখানা হুস করে চলে গেল। পারব না বললে এখন এই নির্জন পথের উপরেই বসে থাকতে হবে। তাই আর কোন কথা না বলে মিস্টার গিরিকে অনুসরণ করলুম।

কঠিন চড়াই পথে উঠতে আমরা অনভ্যস্ত, তাই কষ্ট হয়। ভালোও লাগে। আমরা নিঃশব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠি, আর মিস্টার গিরি ওঠেন স্বচ্ছন্দে কথা বলতে বলতে। বললেন: মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভুটিয়া বস্তির গোম্ফা দেখাতে পারলাম না। গোম্ফা এখানে আরও দুটো আছে—একটা

শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে আলুবাড়িতে, আর একটা ঘুমে। ঘুমের গোম্ফাটিই সবচেয়ে ভাল। সেটি আমরা কাল সকালে দেখব।

কাল সকালে!

বলি নি বুঝি আপনাদের! কাল ভোর চারটেয় আমি গাড়ি নিয়ে আসব। হোটেলের বেয়ারা আপনাদের সময়মতো জাগিয়ে দেবে। রাতে কফি দিয়ে দেবে ফ্লাস্কে। কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

স্বাতি বলল: টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখবার মতলব বুঝি!

মিস্টার গিরি বললেন: আজকের ওয়েদার দেখে মনে হচ্ছে, কাল সানরাইজ খুব ভাল দেখা যাবে।

স্বাতি বলল: তা হয়তো দেখা যাবে, কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে—

না না, ওসব ভদ্রতার কথা আমাকে বলবেন না। আমি পাহাড়ী লোক, বিলিতি আদবকায়দা দেখলে আমি ঘাবড়ে যাই।

তাঁর কথার ধরনে আমরা হাসলুম। মিস্টার গিরিও হাসলেন। তারপর বললেন: ভুটিয়া বস্তি গোম্ফাটির পরিবেশটি ভারি সুন্দর। তিব্বতী ধরনের একটি দোতলা বাড়ি, তার ঠিক পিছনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মনে হবে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়েই এই গোম্ফাটি।

ভিতরে কী দেখবার আছে বলবেন না?

ভিতরের দ্রষ্টব্য বস্তু সর্বত্রই প্রায় এক রকম। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবী এবং বিখ্যাত লামাদের মূর্তি ও পট নিচের তলায়, ওপরের তলায় একটি লাইব্রেরি, তাতে অসংখ্য হাতের লেখা পুঁথির সংগ্রহ। বোধহয় জানেন যে তিব্বতীদের দুটো এনসাইক্লোপিডিয়া আছে, তাদের নাম ট্যাঙ্গুর ও ক্যাঙ্গুর। এই গ্রন্থ দুখানির একশো আটটি করে খণ্ড, প্রত্যেকটি খণ্ড এক একখানি বিরাট পুঁথি। সংস্কৃত পালি

ও তিব্বতী ভাষায় লেখা ধর্ম দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের চুম্বক সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ দুখানি রচিত হয়েছে।

এ আমার কাছে একেবারে নূতন কথা। আমি কোথাও এ কথা পড়ি নি, বা শুনি নি কারও কাছে। সহসা অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। কিন্তু কোন প্রশ্ন আমি করলুম না। চোখ আর মন দুইই তখন পথ চলায় নিবদ্ধ।

এক সময় আমরা বার্চ হিলের মাথায় পৌঁছে গেলুম। মিস্টার গিরি বললেন: বার্চ হিলের কথা আপনার মনে আছে কি?

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল: সুন্দর একটি পার্ক দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে।

ঠিকই মনে পড়ছে। ছোট ছোট গাছপালা, ফুলের বাগান, কুঞ্জবন, কত বেঞ্চ পাতা ছিল, সাহেবমেমরা বেড়াতে এসে বসে বিশ্রাম করত, নিভৃতে আলাপ করত। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলা করত, তাদের খেলার সরঞ্জাম ছিল কত।

মিস্টার গিরি একটা সুন্দর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: চিনতে পারেন সেই জায়গাটা?

স্বাতি চারিদিকে চেয়ে দেখল, তারপরে বলল: না।

মিস্টার গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বার্চ হিল পার্কেই হয়েছে এই হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার কি দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে?

মিস্টার গিরি বললেন: এই ইনস্টিটিউট অন্য কোন জায়গায় হলে আমি সুখী হতাম। এ জায়গাটি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, টুরিস্টদেরও ভাল লাগত এই জায়গাটি। চৌরাস্তার ভিড়ে তো রোজ ভাল লাগে না, সোজা সমতল পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই জায়গায় এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে সত্যিই ভাল লাগত।

তারপরেই মিস্টার গিরি তাঁর দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললেন। বললেন: আসুন, ভেতরটা আপনাদের দেখিয়ে দিই।

বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বছর দশেক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই স্কুলটি খুলেছিলেন পাহাড়ে ওঠা শিক্ষা দেবার জন্যে। শিক্ষার্থীদের থাকবার জন্য হস্টেল আছে, আর শেরপা ট্রেনারদের জন্য আছে সুইস টাইপের ছোট ছোট বাংলো। মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকে ফিল্ড ট্রেনিংয়ের ডাইরেক্টর।

তেনজিঙের নামে আমার মনে এল গাম্বোর কথা। তিনিও এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন দুবার, কিন্তু তেনজিংএর পরে বলে তাঁর কথা আমরা অনেকেই জানি নে।

এর পরে আমরা এই ইনস্টিটিউটের মিউজিয়ামে গিয়ে ঢুকলুম। ছোট জাদুঘর কিন্তু পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে যে কত কথা জানবার আছে তার শেষ নেই। ছবি নক্সা মানচিত্র আছে নানারকমের, আর একটি শেরপার পাহাড়ে ওঠার মূর্তি আছে উপরের তলায়। আমরা সত্যি মানুষ বলে মনে করেছিলুম, তারপর উপরে উঠে কাছে গিয়ে ভুল বুঝতে পেরেছিলুম।

মিস্টার গিরি বললেন: তেনজিঙের সঙ্গে আলাপ করবেন?

স্বাতি আমার দিকে তাকাল, আর আমি উত্তর দিলুম: বেশ তো।

তেনজিং নোরকে তাঁর নিজের ঘরে ছিলেন, মিস্টার গিরির কথায় বেরিয়ে এলেন বাহিরে। সাদাসিধে সরল মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হল, ভাল লাগল তাঁকে। বললুম: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জিনিস জয় করেছেন আপনি, আপনাকে প্রণাম করে যাই।

মিস্টার গিরি এইবারে আমাদের অন্য এক ধারে নিয়ে গেলেন। ছোট একটি রেস্টরেণ্টের সামনে খানকয়েক চেয়ার পাতা। বললেন: বসুন একটুখানি।

বলে ভিতরে গিয়ে কিছু বলে আবার ফিরে এলেন।

আমি বললুম: বেলা তো পড়ে এল, আর যদি কিছু দেখবার থাকে তো চলুন না দেখে নিই এই সময়।

মিস্টার গিরি বললেন : পাহাড়ে উঠতে কষ্ট তো কম হয় নি, একটু চা খেয়ে নিন, তারপর ফেরার পথে চিড়িয়াখানাটা দেখা যাবে।

স্বাতি বলল : এখানেও চিড়িয়াখানা আছে নাকি!

সাধারণ চিড়িয়াখানা নয়, এখানে আছে পাহাড়ী অঞ্চলের পশু পাখি। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ আমাদের বাঘ উপহার দিয়েছিলেন, সেই বাঘও এখানে আছে। ভালুক আছে, আরও অনেক জীবজন্তু আছে, আর স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে আছে বলে খুব ভাল দেখায়।

চা খেতে আমরা বেশি সময় নষ্ট করি নি। অন্ধকার হবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি আমরা চিড়িয়াখানাটা দেখে নিয়েছিলুম। এও বার্চ হিলেরই একটি অংশে অবস্থিত।

বার্চ হিলের পূর্ব ও পশ্চিম দু ধার দিয়ে দুটি রাস্তা চৌরাস্তার দিকে গেছে। ইস্ট রোডটি পিছন দিয়ে আর সামনে দিয়ে ওয়েস্ট রোড। এটিও নির্জন ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু প্রায় সমতল। এই রাস্তা ধরে হাঁটলে পাহাড়ে হাঁটছি বলে মনে হয় না, অথচ পাহাড়ের গা দিয়েই হাঁটতে হয়, ডান দিকে দার্জিলিঙ শহর কার্ট রোড পর্যন্ত নয়, তারও নিচে নেমে গেছে।

এক সময় আমরা রাজভবনের কাছে পৌঁছে গেলুম। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এই বাড়িটি দেখবার মতো। মিস্টার গিরি বললেন : এক সময় নাকি এটি কুচবিহারের রাজবাড়ি ছিল, বাঙলার ছোটলাটকে রাজা উপহার দিয়েছিলেন। জলাপাহাড়ের দিকে তাঁদের আরও অনেক বাড়ি আছে, নিজেরা বেড়াতে এলে সেই সব বাড়ির একটায় থাকেন।

তারপরে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা শোনালেন। কয়েক বছর আগে কুচবিহারের রাজকুমার ইন্দ্রজিৎনারায়ণ একটি বাড়িতে আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। রাতে সেই বাড়িতে কেমন করে আগুন লাগল, আর কেন তাঁকে রক্ষা করা সম্ভবপর হল না, কেউ তা বলতে পারে না।

১৪

মিস্টার গিরি আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, কিন্তু বসলেন না। ম্যানেজারকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন যে কাল সকালে আমরা সূর্যোদয় দেখতে টাইগার হিলে যাব। রাতে কফি দিতে হবে ফ্লাস্কে, আর ভোর চারটের আগে জাগিয়ে দিতে হবে। তিনি নিজে আসবেন গাড়ি নিয়ে। এ কথাও বললেন যে চারটেয় রওনা হলে একেবারে টাইগার হিলের মাথায় উঠে যাওয়া সম্ভব হবে। দেরি হলে খানিকটা পথ হেঁটে উঠতে হবে। প্রতিদিনই টাইগার হিলে অসংখ্য গাড়ি যায়, উপরে পার্ক করার জায়গা বেশি নেই।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল : মিসেস গিরি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো?

হাহা করে হেসে উঠেছিলেন মিস্টার গিরি, বলেছিলেন : হাসালেন আপনি।

কেন!

সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ করে তিনি বেরবেন কী করে!

ভদ্রলোকের উত্তর শুনে স্বাতিও হেসেছিল।

ঘরের ভিতরে অন্ধকার তখন থমথম করছে। রাত কত তা জানি নে। উঠে বাতি জ্বেলে ঘড়ি দেখব কিনা ভাবছিলুম, এমন সময় খুট করে একটা শব্দ হল। দুই ঘরের মাঝখানের দরজা খুলে যেতেই আমি ঝকঝকে আলোয় স্বাতিকে দেখতে পেলুম। বেরবার জন্যে তৈরি হয়ে সে দরজা খুলেছে। আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি জেগে আছ?

আমি বললুম : এই মাত্র ঘুম ভাঙল।

স্বাতি বলল : চারটে বাজতে আর দেরি নেই, তৈরি হয়ে নাও।

বলে আমার ঘরের বাতিও জ্বেলে দিল।

আমি আর দেরি করলুম না। মুখ হাত ধোবার জন্যে বাথরুমে চলে গেলুম।

ফিরে আসতেই স্বাতি বলল: আজ তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

কী রকম।

এই সোয়েটারটা তোমাকে পরতে হবে। ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

নতুন একটা পুরো হাতের সোয়েটার, হাতে বোনা। এগিয়ে এসে বলল: গায়ে হবে কিনা জানি নে।

কষ্ট হল সোয়েটার পরতে, কিন্তু তবু আমি পরলুম। বললুম: আমার জন্যে বুনেছ বুঝি।

স্বাতি বলল: বুনেছিলাম বাবার জন্যে, কিন্তু তুমি দার্জিলিঙে আছ শুনে ভাবলাম—

বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

মামাবাবুর মাপে বুনেছ দেখছি।

স্বাতি লজ্জা পেয়েও পেল না, বলল: একটু ছোট হয়ে গেছে।

আমি হেসে বললুম: আমার ঠিক হয়েছে।

তবে একটু কফি খাও।

বলে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল। ঠিক এই সময়েই দরজায় টোকা পড়ল। হোটেলের বেয়ারা এসেছে জাগাতে। দরজা খুলে স্বাতি বলল: আমরা তৈরি আছি, গাড়ি এলে খবর দিও।

খবর দেবার জন্যে তাকে আর আসতে হল না। বাহিরে রাস্তার উপরে গাড়ির হর্ন শুনতে পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি কফি খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে আছে চারিদিক, শুধু হোটেলের বারান্দায়

আলো জ্বলছে, আর দূরে দূরে এক আধটা বাতি দেখা যাচ্ছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে খুব সন্তর্পণে আমরা রাস্তার উপরে এলুম।

আমাদের দেখতে পেয়ে মিস্টার গিরি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। বললেন: খুব কষ্ট দিলাম তো!

স্বাতি বলল: আমরা তো আনন্দের লোভে বেরিয়েছি।

মিস্টার গিরি এবারে আমাদের সামনে বসতে বললেন না, আমাদের সঙ্গে নিয়ে ভিতরে বসলেন। ড্রাইভার বসল গাড়ি চালাতে। বুঝতে পারলুম যে শেষরাতের ঠাণ্ডা এড়াবার জন্যেই তিনি ভিতরে বসেছেন।

কাল বিকেলে আমরা যেদিকে গিয়েছিলুম এবারে তার উল্টো দিকে চলেছি। ঘুমের দিকে। দার্জিলিঙ থেকে ঘুম পাঁচ মাইল পথ, তারপরে পাহাড়ে উঠতে হয়। মিস্টার গিরির কাছে আমরা সব খবর পেলুম। যে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমরা চলেছি, তারই নাম জলাপাহাড়, আর পথের নাম কার্ট রোড। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘুমে যাবার আরও তিনটি পথ আছে, তাদের পুরনো নাম অকল্যাণ্ড রোড, জলাপাহাড় রোড ও ওল্ড ক্যালকাটা রোড। দার্জিলিঙেব এইসব পুবনো পথের নতুন নাম হয়েছে গান্ধী রোড তেনজিং নোরকে রোড। টাইগার হিলে যখন মোটর চলাচল ছিল না, যাত্রীরা তখন পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে এইসব রাস্তা দিয়ে ঘুমে আসত। কেউ আগের দিন বিকেলবেলায় আসত ট্রেনে, আর রাত্রিবাস করত সিঞ্চলের ডাকবাংলোয়। রাত দুটোয় উঠে দার্জিলিঙ থেকেও অনেকে পায়ে হেঁটে আসত, ঘোড়ায় আসতে হলে বেরতে হত রাত তিনটেয়। এখন চারটের পরে বেরলেও চলে।

অন্ধকারে আমরা বাতাসিয়া লুপ দেখতে পেলুম না। মিস্টার গিরি বললেন যে, ফেরার সময় দেখিয়ে দেবেন। সিঞ্চল লেক কেভেণ্টার্স ড্যাইরি ফার্ম ও ঘুম মনাস্টারিও দেখাবেন। রেল লাইনে যেমন জংসন স্টেশন, এই পাহাড়ে তেমনি ঘুম। নানাদিকে যাবার

রাস্তা এই ঘুম থেকে বেরিয়েছে। ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছবার আগেই দার্জিলিঙ থেকে গান্ধী রোড এসে কার্ট রোডে মিলেছে, আর সেইখান থেকেই একটা রাস্তা উল্টো দিকে ঘুমের গোম্ফার দিকে গেছে। ঘুম স্টেশন পেরিয়েই আর একটা রাস্তা পাওয়া যায় ডান হাতে। তার নাম সুকিয়া রোড। নেপাল সীমান্তে অবস্থিত সুকিয়া বাজার থেকে উত্তরে টংলু সন্দকফু ফালুট পর্যন্ত যাওয়া যায়।

ঘুমের স্টেশন ও বাজার ছাড়িয়ে জোর বাংলোর কাছে আরও দুটি পথ এসে কার্ট রোডের সঙ্গে মিলেছে। জলাপাহাড় রোড এসেছে কাটাপাহাড় ডিঙিয়ে, আর তেনজিং নোরকে রোড আলুবাড়ি গোম্ফার সামনে দিয়ে এসেছে। এই তিনটি পথ যেখানে মিলেছে, তার কাছেই আছে একটি হিন্দু মন্দির।

এখান থেকে কয়েক পা এগোলেই বাঁ হাতে বিখ্যাত পেশক রোড তিস্তা নদীর পুল পর্যন্ত নেমে গেছে। সেই পুল পেরিয়ে ডান দিকে কালিম্পঙ ও বাঁ দিকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের পথ। আর একটুখানি এগিয়ে আর একটি সরু পথ বেরিয়েছে বাঁ হাতে, তার নাম সিঞ্চল রোড, কেভেণ্টার্স ডায়েরি ফার্মের পাশ দিয়ে টাইগার হিলে যাবার পথ এইটিই। কার্ট রোড ধরে আরও কয়েক পা এগোলে বাঁ হাতের তৃতীয় পথটি গেছে সিঞ্চল লেকের দিকে। এই পথের নাম ওল্ড মিলিটারি রোড। আর এ সব পথ না ধরে সোজা এগিয়ে গেলে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব।

মিস্টার গিরি আমাদের এই সব কথা শোনাচ্ছিলেন। বললেন: কাল জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

কেন?

সাধারণত দেখা যায় যে আগের দিন বৃষ্টি হবার পর আকাশে মেঘ থাকে না, সূর্যোদয় খুব ভাল দেখা যায়। তা না হলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

স্বাতি বলল: তবে কি আজ আমরা সূর্যোদয় দেখতে পাব না?

মিস্টার গিরি হেসে বললেন : সে আপনাদের কপাল।

আমরা যে কার্ট রোড ছেড়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি তা বুঝতে পারছি। অন্ধকার পথ নির্জন বলে মনে হচ্ছে না, গাড়ির শব্দেই মুখর হয়ে আছে। পিছনেও গাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছি।

দার্জিলিঙ থেকে সাত মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। টাইগার হিলের চূড়ায় পৌঁছে গাড়ি থামতেই আমরা টুপটাপ করে নেমে পড়লুম। তারপরে দেখতে পেলুম যে ঠিক চূড়ার সমতল জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারি নি, আগে থেকেই সে জায়গাটি গাড়িতে গাড়িতে ভরে আছে। এখন রাস্তার ধারে গাড়িগুলি রাখা হচ্ছে। মিস্টার গিরি বললেন : আরও অনেক গাড়ি আসবে।

অল্প একটুখানি হেঁটেই আমরা উপরে পৌঁছে গেলুম। একটি দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে এখানে, তার নিচের তলায় রেস্টরেণ্ট, আর উপরের তলা থেকে যাত্রীদের সূর্যোদয় দেখবার ব্যবস্থা। কিন্তু সেখানে উঠবার আর উপায় নেই, স্বল্প-পরিসর স্থানটুকু আগে থেকেই যাত্রীতে ভরে আছে। মিস্টার গিরি বললেন : আসুন, নিচে থেকেই আমরা ভাল দেখতে পাব।

বলে রেলিঙের ধারে আমাদের টেনে আনলেন। সেখানেও লোক জমতে শুরু হয়েছে।

মিস্টার গিরির পছন্দমতো আমরা একটি ভাল জায়গা দখল করলুম। এখন যারা আসবে তারা আমাদের পিছনে দাঁড়াবে। নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাতি বলল : এখানে যত গাড়ি দেখছি, সবই তো ল্যাণ্ডরোভার। এত ল্যাণ্ডরোভার কোথা থেকে এল?

মিস্টার গিরি বললেন : এ সবই ট্যাক্সি। পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া দিলে ভোর চারটেয় এসে দরজায় দাঁড়ায়। তারপর এখান থেকে কেভেণ্টার্স ফার্ম সিঞ্চল লেক ও ঘুমের গোম্ফা দেখিয়ে আটটার মধ্যেই দার্জিলিঙে পৌঁছে দেয়।

আমি বললুম : গরিব যাত্রীর কী উপায় ?

মিস্টার গিরি বললেন : তারা চৌরাস্তায় টুরিস্ট অফিসে যায়। মাথাপিছু গোটাছয়েক টাকা দিলে তারাও এই ব্যবস্থা করে দেয় শুনেছি।

পিছন থেকে চাপ পড়ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে ভিড় বাড়ছে, দু-তিন সারি মেয়ে পুরুষ পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকের হাতে ক্যামেরা, যারা পিছনে পড়েছে তারা ছবি তোলবার জন্যে সামনে আসবার চেষ্টা করছে। চাপ পড়ছে এইজন্যেই। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে বলে জনতাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সাজপোশাক ও রঙের বৈচিত্র্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বাঙালী মেয়েকেও মেমসাহেব বলে মনে হচ্ছে, আর খাঁটি বাঙালী মনে হচ্ছে এমন পুরুষ একজনও দেখা যাচ্ছে না।

এর পরে এল সেই বহু-প্রতিক্ষিত মুহূর্ত। পূর্বাকাশে রঙের খেলা শুরু হল। নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল প্রত্যূষের মেঘমালা। ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল দর্শকেরা, কলগুঞ্জন শোনা গেল। পিছনের চাপ দেখলুম ক্রমাগত বাড়ছে।

এক সময় মিস্টার গিরি বললেন : আজ আপনাদের ভাগ্যে বোধহয় সূর্যোদয় দেখতে পাব।

কিন্তু নির্মেঘ আকাশের অপরূপ সূর্যোদয় আমরা দেখতে পেলুম না। যা দেখলুম তাও সুন্দর। এ রকম সূর্যোদয় এর আগে কখনও দেখি নি।

স্বাতি বলল : কন্যাকুমারীর কথা মনে পড়ছে ?

বললুম : সেও সুন্দর।

সেখানে আমরা সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখেছি একসঙ্গে। সে সমুদ্রের উপরে। এখানে আমরা সূর্যোদয় দেখলুম পাহাড়ের উপরে, সমুদ্ভাসিত কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বপ্নাতীত রূপ দেখে আনন্দ ও বিস্ময়ে আমরা বিহ্বল হলুম।

যারা ছবি তুলতে এসেছে তারা একাধিক ছবি তুলল, যারা বায়নাকুলর নিয়ে এসেছে তারা দূরের পাহাড়কে দেখল কাছে এনে। সূর্যোদয় দেখার শখ যাদের মিটে গেল, তারা গিয়ে রেস্টরেণ্টে ঢুকল চায়ের লোভে। আমরা অন্যধারে এলুম কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাউণ্ট এভারেস্ট ভাল করে দেখবাব জন্যে।

আজ সত্যিই আমাদের ভাগ্য ভাল। মাউণ্ট এভারেস্টও আমরা দেখতে পেলুম। নীল পাহাড়ে ঢাকা আছে এই গিরিশ্রেণী, শুধু তিনটি তুষার শিখর জেগে আছে সামনের পাহাড়ের পিছনে। সর্বোচ্চ শিখরটি কিন্তু মাউণ্ট এভারেস্ট নয়, তার নাম মাকালু, মাঝখানের নিচু শিখরটিই মাউণ্ট এভারেস্ট, পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ ২৯০০২ ফুট। মাকালুর উচ্চতাও কম নয়, সাড়ে সাতাশ হাজার ফুটেরও বেশি।

মিস্টার গিরি বললেন: এর চেয়ে নিচু ও নিকটের কোন পাহাড় থেকে মাউণ্ট এভারেস্ট দেখা যায় না। এভারেস্ট এখান থেকে একশো সাত মাইল দূরে। আচ্ছা, এভারেস্টকে কি আপনারা গৌরীশঙ্কর বলেন?

আমি বললুম: কেন বলুন তো?

এর তিব্বতী নাম বোমোকঙ্কর। এক বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে এর নাম যমকিঙ্কর হওয়া উচিত, ভুল করে বাঙলায় গৌরীশঙ্কর বলা হয়।

আমি বললুম: গৌরীশঙ্কর বোধহয় অন্য কোন শিখর।

স্বাতি বলল: টাইগার হিল কত উঁচু?

৮৪৮২ ফুট। চৌরাস্তা থেকে আমরা মাত্র সাত মাইল দূরে এসেছি।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির দূরত্বও তিনি বললেন। ঘুমের গোম্ফা চৌরাস্তা থেকে পাঁচ মাইল, কেভেণ্টার্স ডায়েরি ফার্মও তাই, আর সিঞ্চল লেক ৬ মাইল। ফেরার পথে ডায়েরি ফার্ম দেখে আমরা

কার্ট রোডে পৌঁছব, তারপর সিঞ্চল লেক দেখে আবার ফিরে আসব কার্ট রোডে। মিস্টার গিরি বললেন: আসুন, এবারে একটু চা খাওয়া যাক।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে আমরা কফি খেয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু তার আগেই স্বাতি বলল: আপনার গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে উঠেছে। এস।

বলে আমাদের তুজনকে ডেকে রেস্টরেন্টর দিকে এগোল।

মিস্টার গিরি বললেন: ওদিকে নয়, গাড়িতে চলুন। শেষরাতে উঠে মিসেস গিরি ফ্লাস্ক ভরে চা দিয়েছেন, তার সঙ্গে খাবারও দিয়েছেন কিছু।

স্বাতি লজ্জা পেল, বলল: ছি ছি, এত কষ্ট দিয়েছেন তাঁকে!

মিস্টার গিরি বললেন: আমি কি আর কষ্ট দিয়েছি, এ কষ্ট তাঁর স্বভাবের দোষে। রাতেও তো চা করে রাখতে পারতেন, কিন্তু চায়ের স্বাদ খারাপ হবে বলে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠেছেন রাত তিনটের সময়।

স্বাতি কী বলবে ভেবে পেল না, কতকটা অসহায়ভাবে তাকাল আমার দিকে। আমি তার অর্থ বুঝি। অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ হারিয়ে সে অসহায় বোধ করছে।

গাড়িতে বসেই আমরা চা আর স্যাণ্ডুইচ খেলুম, তারপর নামতে লাগলুম পাহাড় থেকে। সকালের সোনালী আলোয় তখন চারিদিক আলোকিত। পাহাড়ের তু একটি গাছ চিনতে পারছি। ক্রিপ্টোমেরিয়া জাতের ঝাউ লম্বা ওক আর বেঁটে রডডেনড্রন গাছ, এক আধটি ম্যাগনোলিয়া গাছও যেন দেখতে পেলুম। মিস্টার গিরি বললেন: এক সময় এখানে গোরা পল্টনের ছাউনি ছিল, তাদের ব্যারাক, গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠ, ডাক-বাংলো। এখন আর এখানে কোন ছাউনি নেই।

আমাদের গাড়ি এক সময় পথের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। আরও অনেক গাড়ি এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা নেমে পড়েছে পথে, আর একটা খাড়া পথে উপরে উঠে যাচ্ছে। আমরাও নামলুম, আমরাও তাদের অনুসরণ করলুম।

মিস্টার গিরি বললেন: বৃটিশ আমলে এই ফার্মের শ্রী সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল, এখন নামে চলছে, আগের সে বোলবোলাও আর নেই।

কেভেণ্টার্স ডায়েরি ফার্মে আমরা বেশি সময় কাটাই নি। বিদেশী গরু আছে কিছু, আর বড় বড় সাদা শুয়োর। তাদের প্রত্যেকের এক একটা নাম আছে। কারও বাঙালী নাম, বিদেশী নাম কারও। লক্ষ্মীর সঙ্গে আছে ক্রিস্টিন কিলার। শুয়োরের ব্যবসাই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এব পরে সিঞ্চল লেক। দার্জিলিঙ শহরের জল সরবরাহ হয় এইখান থেকে। তাই সিঞ্চল লেক দেখতে হলে অনুমতি-পত্রের দরকার। ট্যাক্সি নিলে তারাই পারমিট সংগ্রহ করে আনে, আমাদের পারমিট এনেছেন মিস্টার গিরি। বললেন: দার্জিলিঙের পাওয়ার হাউস আপনাকে দেখাতে পারব না।

কেন?

তার জন্যে পাতালে নামতে হবে। বর্ধমান রাজবাড়ির পাশ দিয়ে নেমেছে ভিক্টোরিয়া রোড। ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের পুল পার হয়ে শ্মশানের পথ। তারও নিচে পাওয়ার হাউস। কার্ট রোড থেকে মাইল পাঁচেক নিচে নামতে হয়। সেখানে সমস্ত ঝর্ণাগুলি বেঁধে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে।

স্বাতি হেসে বললে: সত্যিই সে পাতালের পথ।

আমাদের গাড়ি এসে সিঞ্চল লেকের কাছে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ঢালু পথে লেকের ধারে নেমে এলুম। পাশাপাশি

তিনটি সরোবর অর্ধচন্দ্রাকৃতি, একটির সঙ্গে অপরটি সংলগ্ন, এপার থেকে ওপারে যাবার পথও আছে। পাহাড় বেষ্টিত এই স্থান থেকে দূরের দৃশ্য দেখা যায় না, শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশটি নির্জনে উপভোগ করা যায়। আমরা চারিদিকে ঘুরে এই মনোরম স্থানটি দেখলুম, তারপরে ফিরে এলুম নিজেদের গাড়ির কাছে। এখান থেকে আমরা ঘুমের গোম্ফা দেখতে যাব।

তিব্বতী গোম্ফা সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না, এর আগে আমি কোন গোম্ফাও দেখি নি। বই পড়ে যে ধারণা হয়েছে, তা কতকটা ভয়াবহ। লামাদের সম্বন্ধেও আমার ধারণা কতকটা এই রকম। শৈশবে একজন ইংরেজ পর্যটকের বই পড়ে জেনেছিলুম যে নতুন লোক দেখলে লামারা চা খেতে দেয়। সে চায়ের স্বাদ এমনি যে খেলেই বমি হয়ে যায়। আর বমি করলে রক্ষা নেই, লামারা তাকে মেরে ফেলে। এই গল্প পড়ে অবধি আমি লামাদের সম্বন্ধে একটা দুরন্ত ভয় মনে মনে পোষণ করে এসেছি।

স্টেশন পেরিয়ে একটি ছোট রাস্তা ধরে আমরা ঘুমের গোম্ফার সামনে এসে নামলুম। একটি তিনতলা বাড়ি, প্রথম দুতলা প্রায় সমান, কিন্তু তৃতীয় তলাটি ছোট, উপরে টিনের ছাদ। সামনেই দুটি খুঁটির সঙ্গে বড় নিশান ঝোলানো আছে। দরজা ঠিক মাঝখানে। দু ধারের দেওয়ালের গায়ে একসারি করে ধর্মচক্র সাজানো আছে। এগুলি ঘুরিয়ে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে হয়। দোতলার বাহিরের দেওয়ালে ড্র্যাগনের মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

মিস্টার গিরির পিছনে আমরা গোম্ফার ভিতরে ঢুকলুম। গোম্ফার সম্বন্ধে আমার পুরনো ধারণা এক নিমেষে পাল্টে গেল। এ একটি গম্ভীর ভাবের ধর্মমন্দির। সামনে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। অতীশ দীপঙ্কর ও পদ্মসম্ভবের মূর্তিও আছে। আরও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ

দেবদেবীর মূর্তি। দেওয়ালেও চিত্রিত আছে নানা দেবতা ও স্বর্গ-নরকের দৃশ্য। সৌম্যদর্শন তুজন লামা মন্দিরের কাজে ব্যস্ত আছেন। আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই এগিয়ে এসে মূর্তিগুলি চিনিয়ে দিলেন। বললেন: তিব্বতী নববর্ষে এই গোম্ফায় উৎসব হয়, সে আমাদের ফাল্গুন মাসে।

ঘুরে ঘুরে আমরা সব কিছু দেখলুম। কিন্তু শৈশবে পড়া গল্পের সঙ্গে কিছুই মিলল না। পবিত্র পরিবেশ, ভারি ভাল লাগল এই গোম্ফাটি। ধূপ দীপের গন্ধ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাকে লেগে রইল।

গাড়িতে উঠে বসেই স্বাতি প্রশ্ন করল: এবারে আমরা কোথায় যাব?

উত্তর আমি দিলুম, বললুম: এবারে ফেরার পালা।

ড্রাইভার কোন হুকুমের অপেক্ষা করে নি। কার্ট রোডে পৌঁছে বাঁ হাতে দার্জিলিঙের পথ ধরল। অনেক দূর চলে আসবার পর মিস্টার গিরি হঠাৎ বলে উঠলেন: এই যা, একটা জায়গা দেখাতে ভুল হয়ে গেল।

আমি হেসে বললুম: বাতাসিয়া লুপ।

মিস্টার গিরি বললেন: ঘুমপাষাণ।

সে আবার কী?

বিরাট একখানি পাথর। প্রায় একশো ফুট উঁচু। তার নিচে আছে একটি সুড়ঙ্গ। লেপচাদের রাজত্বকালে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হলে এই পাথরের ওপর থেকে আছড়ে ফেলা হত। এখন লোকে এই পাথরের উপরে বসে পিকনিক করে। বাঙলার সমতলভূমি দেখা যায় এখান থেকে, কিন্তু দার্জিলিঙের দৃশ্য ঢাকা পড়েছে গাছপালায়।

একই নিঃশ্বাসে মিস্টার গিরি বললেন: আস্তে।

এই নির্দেশ তিনি ড্রাইভারকে দিয়েছিলেন। আমাদের বুঝতে

কষ্ট হল না যে বাতাসিয়া লুপ আমরা পৌঁছে গেছি। মিস্টার গিরি বললেন: গাড়ি থেকে নেমে দেখবেন কি?

আমি বললুম: না।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: দেখবে না?

ছবি দেখেছি অনেক। এক দিক থেকে ট্রেন আসে, তারপর একটা চক্কর কেটে নিচের পথের উপর দিয়ে চলে যায়।

মিস্টার গিরি হেসে বললেন: চল।

গাড়িতে বসে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই আমরা দেখে নিলুম।

১৫

হোটেলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে মিস্টার গিরি বলে গেলেন : এবেলা আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি ওবেলায় আসব।

ব্রেকফাস্ট সেরে বোর্ডাররা তখন বেড়াতে বার হচ্ছেন। আমরা উপরে নিজেদের ঘরে না গিয়ে ডাইনিং হলেই চললুম। স্বাতি বলল : আজকের সকালটি বেশ ভাল লাগল।

কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি আবার বলল : তোমার কি ভাল লাগে নি।

এবারে আমি আর নীরব থাকলুম না, বললুম : এখন আমার অন্য কথা মনে আসছে।

স্বাতি তার পরের কথা শোনবার জন্য আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : হঠাৎ আমার ফেরার কথা মনে পড়েছে। দার্জিলিঙে আমরা তো বেড়াতে আসি নি, চিরকাল এমনি করে বেড়ালেও চলবে না।

স্বাতির মুখ সহসা মলিন হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল : তুমি কি কাজে ফিরে যাবার কথা ভাবছ।

আমি বললুম : সে কথা তো ভাবতেই হবে। শরীর অসুস্থ বলে বিশ্রামের অনুমতি মিলেছিল, কিন্তু তার প্রয়োজন তো আর বেশি নেই।

স্বাতি কোন মন্তব্য করল না, কিন্তু তার একটি দীর্ঘশ্বাস চাপার শব্দ যেন শুনতে পেলুম।

এই সময়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট এল টেবিলে। খেতে খেতে আরও দু-একটি কথা হল।

স্বাতি প্রশ্ন করল : তুমি কি এখান থেকেই গৌহাটি যাবে ?

আমি বললুম : তাই তো উচিত।

এর পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : তুমি কি দিল্লীতে ফিরবে ?

অলস ভাবে স্বাতি বলল : ভেবে দেখি।

হাসবার চেষ্টা করে আমি বললুম : তুমি কি গৌহাটি যাবার কথা ভাবছ ?

স্বাতি যেন চমকে উঠল, তারপরেই সহজ হয়ে বলল : ভাবছি তোমার গৌহাটি যাওয়া বন্ধের কথা।

কেন ?

পরে বলব।

বলে স্বাতি আহারে মনোনিবেশের ভান করল। আমিও আর কোন কথা কইলুম না।

কিন্তু বেশিক্ষণ নীরবে থাকাও গেল না। ম্যানেজার আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এসে নমস্কার করলেন, বললেন : সূর্যোদয় কেমন দেখলেন ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : অপূর্ব।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন : বিদেশীরা কী বলে জানেন ? এমন অপূর্ব দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন দেশে নাকি নেই।

আমি বললুম : হয়তো সত্যি কথা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : বোটানিকাল গার্ডেন দেখেছেন ?

বললুম : না।

এমন বাগানও নাকি কম আছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান না। খুব ভাল লাগবে আপনাদের।

কেন জানি না, আমি আমার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবু রাজী হয়ে গেলুম তাঁর কথায়। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দুজনে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

মিস্টার গিরির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে ও তাঁর কথা শুনে দার্জিলিঙ

শহরটি যেন আমাদের চেনা হয়ে গেছে। কাউকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করতে হয় না। বাজার পেরিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনের রাস্তাটি আমরা নিজেরাই চিনে ফেললুম। তারপরে নামতে লাগলুম নীচে।

বড় বড় গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন নির্জন শীতল পথ। বাজারের কোলাহল থেকে সহসা যেন আমরা অন্য জগতে চলে এসেছি। আমরাও ভুলে গিয়েছি কথা কইতে।

বাগানের গেট খোলা ছিল। সেই গেট পেরোবার সময় স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠেছিলুম। তারপরে চকিতে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। না, কেউ নেই নিকটে। হাসবার মতো কৌতুকের কোন বস্তুও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে আর একবার হেসে উঠল।

এবারে আমি আর নীরবে থাকতে পারলুম না, বললুম: হাসবার মতো কী দেখলে?

স্বাতি হাসতে হাসতেই বলল: তোমার ভাব দেখেই তো হাসছি।

মানে!

তুমি যে হঠাৎ মুষড়ে পড়লে!

সত্য কথা গোপন করবার চেষ্টা আমি করলুম না, বললুম: সেইটেই তো স্বাভাবিক।

স্বাতি বলল: কোনটা স্বাভাবিক, আমার আসাটা, না চলে যাওয়াটা!

আমি বললুম: আমার মুষড়ে পড়াটা।

স্বাতি ফিরে দাঁড়াল, বলল: তুমি কি ভেবেছিলে যে আমি চিরকালের জন্যে তোমার কাছে এসেছি!

না।

তবে?

ভেবেছিলুম যে আমাদের ছাড়াছাড়ির কথাটা হঠাৎ এমন বড় হয়ে উঠবে না।

কিন্তু এইটেই কি সত্যি নয়!

মিথ্যেও তো হতে পারত।

স্বাতি বলল : সত্যকে তোমার স্বীকার করতেই হবে।

বললুম : নিশ্চয়ই করব। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। ভবিষ্যৎ যেদিন বর্তমান হবে, সেদিনও সংশয় থাকবে কিছু। সত্য হল অতীত।

থাক তর্ক। এস একটু হাসি।

বলে স্বাতি পথের ধারের এক ফালি ঘাসের উপরে বসে পড়ল। আমি গিয়ে তার পাশে বসলুম।

স্বাতি বলল : এই বাগানে একটি অদ্ভুত জিনিস দেখছি।

এমন আকস্মিকভাবে তার বিষয়ান্তরে যাবার দক্ষতা দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। কোন কথা না বলে তাকালুম তার মুখের দিকে।

স্বাতি বলল : তুমি কিছু লক্ষ্য কর নি?

বললুম : না।

বাগানের উপরের দিকটা বড় বড় গাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কিন্তু নিচের দিকটা তা নয়। উপরটা বনের মতো, আর বাগানের মতো নিচেটা। রক গার্ডেন আর হট হাউস বোধহয় আরও নিচে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না, আমার মন তখনও বাগানের দিকে যায় নি।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা গোপালদা, নতুন চাকরি কি তোমার ভাল লাগছে?

বললুম : চাকরি কারও ভাল লাগে না।

কেন?

চাকরি মানেই তো গোলামি!

তবে তো বাদশাহও গোলামি করেন।

কী রকম?

তাঁকেও প্রজাদের কথা ভাবতে হয়, চেষ্টা করতে হয় তাদের মনোরঞ্জনের।

আমি বললুম : আজ তোমার হয়েছে কি বলতো ?

মুখ ফিরিয়ে স্বাতি বলল : খুব বেশি আবোলতাবোল বকছি বুঝি।

এ কথার উত্তর না দিয়ে বললুম : একটা সত্যিকথা বলবে ?

কেন ভাবছ যে মিথ্যে বলব !

মিথ্যে না বললে উত্তরটা বোধহয় এড়িয়ে যাবে।

না। তুমি নির্ভয়ে প্রশ্ন কর।

আমি স্বাতির মুখের দিকে একবার তাকালুম, তারপরে তাকালুম ফুলে ভরা বাগানের দিকে। মাথার উপরে নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সাদা বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাচ্ছি না। ঘাসের উপর থেকে একটা ফড়িং লাফিয়ে এল স্বাতির কোলের কাছে, কিন্তু স্বাতি ফড়িংটাকে দেখতে পেল না। প্রজাপতিটাও কি সে দেখতে পায় নি ?

স্বাতি বলল : অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন ?

আমি বললুম : কী জানতে চাইব ভেবে পাচ্ছি না।

এই তো কী একটা কথা জানতে চাইবে বলছিলে !

আমি বললুম : থাক সে কথা।

স্বাতি বলল : এ যে আমার মতো কথা হল।

বললুম : সে কথা হবে মামা মামীর সঙ্গে।

তার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করবে না !

বলে সকৌতুকে স্বাতি আবার হেসে উঠল।

এক সময় আমরা উঠে পড়লুম হট হাউস দেখবার জন্য। তার জন্যে নিচে নামতে হল খানিকটা। পাশাপাশি দুটো কাচের ঘর, তার কাচের ছাদ নৌকোর ছইএর মতো। ভিতরে বিরাট ব্যাপার, থরে থরে টব সাজানো আছে গ্যালারির মতো। ফুলের

বাহার দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। নিঃসংশয়ে এমন সুন্দর ফুল আমরা এর আগে কোথাও দেখি নি। এ কোন্ ফুল।

মালি কাজ করছিল। সে বলল : বিগোনিয়া।

বিগোনিয়া!

আমি আশ্চর্য হলুম। বিগোনিয়া আমি অনেক দেখেছি—ফাইব্রাস রূটেড ও টিউবেরাস রূটেড। তার পাতার বাহার। ফুল হয় শীতকালে, কিন্তু সে ফুল কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এ যে গোলাপের মতো ডবল ও সেমিডবল ফুল, নানা রঙের ও নানা রূপের। প্লাস্টিকের ফুল বলে ভুল হয়। এমন ছোট ছোট গাছে কয়েকটি করে ফুল ফুটেছে, কুঁড়ি আছে আরও কয়েকটি। এ ফুল যে অনেকদিন পর্যন্ত ফুটে থাকে তাতে সন্দেহ নেই, কোন টবের উপরেই ফুলের পাঁপড়ি ছড়িয়ে পড়ে নি।

এ ফুলের পরিচর্যার কথা আমি মালির কাছে জেনে নিলুম। অন্যান্য জাতের বিগোনিয়ার মতো এ ফুলের চারা বীজ থেকে হয় না, ডাল পুঁতেও তাকে বাঁচানো যায় না। একটিমাত্র গাছ, কাজেই আলাদা করে গাছ বাড়ানো যায় না। এর প্রপাগেসন হয় বাল্ব থেকে। গাছ পুষ্ট হলে নিচে বাল্ব হয় গ্ল্যাডিওলির মতো। সেই বাল্ব তুলে শুকিয়ে রাখা হয়। তারপর সময় মতো সেই বাল্ব পুঁতে ফুল নিতে হয়। প্রথম শীতেই এর ফুলের বাহার। পাহাড়ে এই ফুল ফোটে পুজোর সময়েই।

আরও কয়েক রকমের ফুল দেখলুম—গ্লাক্সিনিয়া, নাইজেলিয়া প্রভৃতি। বসন্তের ফুলও এখন ফুটতে শুরু করেছে।

যে পথে এসেছিলুম, সে পথে আমরা ফিরলুম না। আমরা এগোলুম উল্টো দিকে, বাঙালীদের পাড়া চাঁদমারির দিকের গেট দিয়ে আমরা বেরব। সেই দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললুম : বিগোনিয়ার কয়েকটি বাল্ব সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

স্বাতি হেসে বলল : লাগাবে কোথায় ?

আমি বললুম : টবে।

স্বাতি বলল : সে টব তোমার কোথায় রাখবে ?

এবারে তার পরিহাস আমি বুঝতে পেরেছি। বললুম : ধর্মশালায়।

স্বাতি এবারে আর হাসল না, বলল : এইজন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : সত্যিই তাই। কয়েকটা ভাল ফুল দেখেই তোমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। এ মন তুমি কোথায় পেলে গোপালদা ?

বললুম : ঠাট্টা করছ !

স্বাতি বলল : না। তোমার এই মনকে আমি শ্রদ্ধা করি। এ মন তোমার মলিন হতে আমি দেব না।

তাহলে তো দূরে থাকা তোমার চলবে না !

কাছে থাকতেও যে ভয় হয় আমার। দূরে থাকলে—

পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

আমি চমকে উঠলুম স্বাতির কথা শুনে। বললুম : না না, মিথ্যাকে এমন করে প্রশ্রয় দিয়ো না।

মিথ্যা !

স্বাতি অবিশ্বাসের দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম : মিথ্যাই তো। শুধু কান্না জীবনকে পূর্ণ করে না, হাসিও দরকার। সে হাসি তুমি জীবন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা কোরো না।

নিঃশব্দে স্বাতি পথ চলতে লাগল, কোন উত্তর দিল না আমার কথার।

১৬

দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শেষ রাতে ওঠার ক্লান্তি ছিল, খেয়েদেয়ে আরাম করে বিছানায় শুতেই ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে এসেছিল। স্বাতিও বোধহয় তার ঘরে ঘুমিয়েছে। আমাকে যখন জাগাল বেলা তখন পড়ে গেছে। বিকালের চায়ের সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্বাতি বলল: মুখে একটু জল দিয়ে নাও, তারপরে নিচে গিয়ে চা খেয়ে আসব।

মুখ হাত ধুয়ে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোথাও বেরুতে হবে নাকি?

স্বাতি একখানা গরম চাদর হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল: আজ ছুটি।

আমি বললুম: তবে তো ঘরে বসেই চা খাওয়া চলতে পারত।

স্বাতি বলল: সেইজন্যেই তো নিচে যাচ্ছি। তবু একটুখানি বেড়ানো হবে, আর মুখ দেখা যাবে দু-একজনের।

নিচে নেমে সত্যিই দু-একজনের মুখ দেখা গেল। ঠাণ্ডা লাগাব ভয়ে যাঁরা অন্ধকার হবার আগেই ফিরে এসেছেন, তাঁরা চা খাচ্ছিলেন। আমরাও গিয়ে একটা খালি টেবিলে বসলুম।

মিস্টার গিরির কথা আমার মনে পড়ল। এবেলাতেও আসবেন বলে গিয়েছিলেন। অন্য দিন এ সময়ে এসেই পড়েন, আজ দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারলুম না। হঠাৎ মিস্টার লালের কথা আমার মনে পড়ল। তিনি কেমন আছেন জানি নে, মিস্টার গিরির কাছে তাঁর খোঁজ নিতেও আমি ভুলে গেছি। স্বাতিকে বললুম: কাল সকালে একবার হাসপাতালে যাব।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন বল তো।

মিস্টার লাল কেমন আছেন একবার দেখে আসা দরকার।

লজ্জিতভাবে স্বাতি বলল : সত্যি কথা।

তারপরে বলল : চল না, আজই তাঁকে দেখে আসি।

ঠিক এই সময়ে মিস্টার গিরি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : আজ কোথাও বেরোন নি দেখছি।

আমি বললুম : এইবারে আমরা বেরোব।

কোথায় ?

হাসপাতালে মিস্টার লালকে দেখতে যাব ভাবছি।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে মিস্টার গিরি বসে পড়লেন, বললেন : এই তো আমি তাঁর কাছ থেকেই আসছি।

স্বাতি বলল : কেমন আছেন তিনি ?

ভাল।

মিসেস লাল কি এসে পৌঁছেছেন ?

না।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে স্বাতি সন্তুষ্ট হল না, মিস্টার গিরির মুখের দিকে চেয়ে রইল। কতকটা বাধ্য হয়ে মিস্টার গিরি বললেন : তিনি বোধহয় আসতে পারবেন না।

ঠিক এই সময়ে আমাদের চা এল। বেঁচে গেলেন মিস্টার গিরি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : একটা কথা জিজ্ঞেস করতে রোজ ভুলে যাচ্ছি, অফিসে গেলেই এক বাবু আমাকে চেপে ধরে।

মিস্টার গিরি আমার দিকে চেয়ে ছিলেন বলে আমি বললুম : কী কথা ?

আপনি কি গোপালবাবু নামে পরিচিত ?

মিস্টার গিরির প্রশ্ন শুনে স্বাতির কৌতুক যেন আর ধরে না। আমি হেসে বললুম : কেন বলুন তো ?

কী একটা কাজে এই হোটেলে সে একদিন এসেছিল। আর ঘরের ভিতরে আপনাদের আলাপের কিছু শুনে গেছে। তারপর থেকেই ব্যস্ত হয়েছে আপনাদের নাম জানবার জন্যে।

আমি আশ্চর্য হলুম।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আমার নামটা কি আপনি তাকে বলেছিলেন!

বলেছি। আপনাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল তো, তাই নামটা আমার জানা আছে।

আমি বললুম: ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেবেন একবার, আলাপ করব তাঁর সঙ্গে।

যে ভদ্রলোক আমার পিছনে বসে নিঃশব্দে চা খাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর চেয়ারখানা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন। তারপর নমস্কার করে বললেন: এইজন্যেই আমি আজ বেড়াতে বের হই নি। ভেবেছিলাম, যেভাবেই হোক আপনাদের সঙ্গে পরিচয়টা করতে হবে।

এবারে মিস্টার গিরির আশ্চর্য হবার পালা। তাই দেখে ভদ্রলোক বললেন: আপনি রমেন দাসের কথা বলছেন তো! সে আমাদের দেশের ছেলে, বেড়াতে এসেছিল আমার কাছে। তাকে আমিই এই কাজে লাগিয়েছি।

আমি হেসে বললুম: আপনারা ভাল গোয়েন্দা হতে পারবেন।

মিস্টার গিরি বললেন: ব্যাপারটা যে আরও বেশি হেঁয়ালি হয়ে উঠল।

এ কথার উত্তর আমাদের দিতে হল না। ভদ্রলোক বললেন: গোপালবাবুরা আমাদের খুব পরিচিত মানুষ, খুবই অন্তরঙ্গ পরিচয়। যেদিন ওঁরা মাদ্রাজ মেলে চেপে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করতে বেরলেন, সেদিন থেকে ওঁর সঙ্গে পরিচয়।

মিস্টার গিরি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন আমাদের দিকে। কিন্তু ভদ্রলোক তা উপেক্ষা করে বললেন: এতদিন পরে ওঁদের সঙ্গে দেখা হল, ভারি ভাল লাগছে আজ। ভালো করে দেখে নিচ্ছেন তো এই অঞ্চলটা, আপনার চোখ দিয়ে আবার দেখতে চাই।

ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমাকে দেখালেন,

তারপরে মিস্টার গিরিকে। আমি নিলুম না, মিস্টার গিরি সিগারেট ধরিয়ে বললেন : একটু সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন।

ভদ্রলোক বললেন : গোপালবাবু আমাদের প্রিয় লেখক—

বাধা দিয়ে আমি বললুম : আমাকে লজ্জা দেবেন না।

মিস্টার গিরি সোজা হয়ে বসে বললেন : সত্যি নাকি!

ওঁর ভ্রমণ কাহিনী—

না না, এ সব ব্যক্তিগত কথা—

কিন্তু মিস্টার গিরির গলা সকলকে ছাপিয়ে গেল : আমাকে আগে বলেন নি কেন!

স্বাতি হাসছিল মুখ টিপে, এইবারে বলল : তাহলে কী করতেন?

মিস্টার গিরি বললেন : শুধু দার্জিলিঙ কেন, সমস্ত হিমালয়টা দেখিয়ে দিতুম।

ভদ্রলোক বললেন : তার তো সুযোগ যায় নি, এইবারে দেখিয়ে দিন।

মিস্টার গিরি ঘন ঘন কয়েকটা টান দিলেন সিগারেটে, তারপরে বললেন : ঠিক আছে। কালকের দিনটা বাদ দিন, পরশু শনিবার আমাদের ছুটি, তারপর রবিবার। এই দুদিনেই আপনাদের কালিম্পঙ আর গ্যাংটক দেখিয়ে আনব।

স্বাতি বলল : বাস যাতায়াত করে বুঝি?

বাস নয়, ল্যাণ্ডরোভার। কিন্তু তা দিয়ে আপনার দরকার কী!

স্বাতি বলল : ট্যাক্সিতে বেড়ানো একটা শৌখিনতা।

মিস্টার গিরি বললেন : না হয় বাসেই বেড়াবেন। মাথা পিছু যা নেয় ওরা তাই দেবেন আমাকে, আমার পেট্রলের খরচটা উঠে যাবে।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম : আজ সকালে যে আমরা ফেরার কথা ভাবছিলুম।

ফেরার কথা! এখনও আপনার হাত জোড়া লাগে নি, আপনি

ফিরবেন কী করে। আর ফিরলেই কি কাজে যোগ দেওয়া উচিত হবে।

তারপরে স্বাতিকে বললেন: না না, এখন আপনারা ফেরার কথা ভাববেন না। সন্দকফু ফালুট দেখে আসুন, হিমালয়কে চিনুন ভাল করে, তারপরে ফেরার কথা ভাববেন। কি বলেন মিস্টার—

বলে নূতন ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন।

বোস, রঞ্জিত কুমার বোস।

আমি বললুম: আপনি ওঁর কথায় সায় দেবেন না রঞ্জিতবাবু। আমার চাকরিটা মূল্যবান বেশি, হিমালয় দেখতে গিয়ে চাকরিটা খোয়ানো যাবে না।

একসময় মিস্টার গিরি ফিরে গেলেন, কিন্তু রঞ্জিত বোস আমাদের উঠতে দিলেন না, বললেন: আপনাকে যা বলতে চেয়েছিলাম, সেই কথাটি এখনও বলা হয় নি।

আমি বললুম: বলুন এইবারে।

রঞ্জিতবাবু ইতস্তত করলেন একটুখানি, তারপরে বললেন: বাঙলাদেশের কথা যখন লিখবেন, তখন পূর্ববঙ্গের কথা লিখবেন না?

ঠিক এ রকমের একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। আমি বিব্রত বোধ করছি ভেবে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন: না না, আমি শুধু কৌতূহলের জন্য এ কথা জানতে চাইছি।

খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে আমি বললুম: পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধে আমার যে কোন অভিজ্ঞতা নেই রঞ্জিতবাবু।

কিন্তু—

আমি বললুম: বলুন।

আপনার পাঠকেরা তো এ কথা বুঝবেন না, তাঁরা ভাববেন যে আপনি অবজ্ঞা করেই পূর্ববঙ্গের কথা বাদ দিলেন। অথচ—

বাধা দিয়ে আমি বললুম: না না, অবজ্ঞা আমার একটুও নেই। আমার অভিজ্ঞতার অভাব, পাঠককে তাই ফাঁকি দিতে চাই নে।

রঞ্জিতবাবু থামলেন একটুখানি, তারপরে বললেন: পশ্চিমবঙ্গ আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নয়, একদা যারা পূর্ববঙ্গবাসী ছিল তারাও এখন এই পশ্চিমবঙ্গের প্রজা। তারাও আপনার লেখা সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ছে। তাদের নিরাশ করা কি আপনার উচিত হবে!

আমি বললুম: অন্যায় হবে। কিন্তু কী করতে পারি বলুন। পদ্মার পরপারে আমি কখনও যাই নি, ওদেশের সম্বন্ধে আমার ধারণা এমনই অস্পষ্ট যে কিছু লিখতে গেলেই আমাব মূর্খতা প্রকাশ পাবে উৎকট ভাবে।

আপনি কি না দেখে কিছু লেখেন নি!

আমি দ্বিধা না করে বললুম: লিখেছি। কিন্তু সে নিজের জবানীতে লিখি নি। যাঁর কাছ থেকে শুনেছি, তাঁব জবানীতেই লিখেছি সেই কথা।

স্বাতি এতক্ষণ নীরব ছিল। এইবারে সে বলল: এখানেও তুমি তাই করতে পার। রঞ্জিতবাবু যদি কিছু বলেন—

বলে সে থামল।

রঞ্জিতবাবু বললেন: আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু নিজের চোখে না দেখলে কি আপনার পছন্দ হবে!

কিন্তু নিজের চোখে দেখবার যে আর সুযোগ হবে না!

তা বটে।

বলে রঞ্জিত বোস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভদ্রলোকের কথা এমন পরিষ্কার যে তাঁর দেশ কোথায় বোঝা মুশকিল। কথায় একটু টান আছে। তাইতেই মনে খট্‌কা লাগে যে ভাগীরথীর পশ্চিম পারের মানুষ হয়তো তিনি নন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে উদ্বাস্তু হয়ে তিনি এদিকে আসেন নি, এসেছেন অনেক

আগে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকে অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলেছেন। সরাসরি আমি তাঁর দেশের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, বললুম: আপনার কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই যে আপনি কোন্ বঙ্গের মানুষ।

ভদ্রলোকের মন তখনও ভাবাক্রান্ত ছিল। বললেন: সত্যিই সেকথা ভুলে গেছি।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন: বলব আপনাকে, না বললে যে নিজেদেরই ক্ষতি হবে। কয়েকদিন আছেন তো এখানে?

বললুম: ফেরার কথা ভাবছি।

কাল নিশ্চয়ই ফিরে যাবেন না!

কিছুতেই না।

তবে ঠিক আছে। যতটুকু জানি তা কালই আপনাকে বলব।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন: অবিভক্ত বাঙলাব একখানা ম্যাপ পাওয়া যায় কিনা দেখে আসি।

অনেকক্ষণ স্বাতি কোন কথা কইল না, তারপবে বলল: এই বেদনার কথা তুমি ফুটিয়ে তুলতে পারবে কি?

অকপটে আমি স্বীকার করলুম: পারব না।

পারবে না!

এ বেদনা যে আমার বুকে নেই। ১৯০৫ সন আমরা চোখে দেখি নি, ১৯৪৭ সনের কথাও ভালো বুঝি নি। বাঙালীর প্রয়োজনে বাঙলা বিভক্ত হয় নি, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বাঙলাকে বলি দেওয়া হয়েছিল। পাঞ্জাব আর বাঙলা। পাঞ্জাব কতকটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু গরিব বাঙলা আজও কাঁদছে নানা সমস্যায়। রক্তের দাগ মুছে গেছে, কিন্তু ক্ষতস্থান আজও শুকোয় নি।

স্বাতি নীরবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি থামতে পারলুম না, বললুম: ১৯০৫ সনে সমগ্র বাঙালী

জাতি এই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ভয় পেয়েছিল ইংরেজ সরকার। কিন্তু ১৯৪৭-এ সে রকমের কিছুই হয় নি। দেশের নেতারা রাজী হয়েছেন, কাজেই সাধারণ মানুষের মতামতেব আর দরকার হয় নি। মহাভারতের সেই গল্প তোমার মনে পড়ে?

কোন্ গল্প?

বোধহয় কর্ণের। গল্পটা এখন সঠিক মনে পড়ছে না। ধর্মরক্ষার জন্যে ছেলেকে কাটতে হবে করাত দিয়ে। বাপ মা দুদিকে দুজনে ধরলেন, তারপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফেললেন কেটে। ধর্ম রক্ষা হল, কিন্তু ছেলের কথা তাঁরা ভাবলেন না। চোখ বুজে ভাবলেন যে কোন রক্তপাত বুঝি হয় নি।

বিনয়বাবুর কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল। তিনি আমার পুরনো অফিসে কাজ করেন। দেশ বিভাগের সময় এই মাঝবয়সী ভদ্রলোক ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তাঁর কাছে গল্প শুনেছি গ্রামের হিন্দু মুসলমানের। পাকিস্তান হবে পূর্ববঙ্গ, হিন্দুদের পক্ষে আর নিরাপদ থাকবে না দেশ। হিন্দুরা তাই ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিনয়বাবুও ভেবেছিলেন যে তাঁর গ্রামের জমিজমা বিক্রি করে চলে আসবেন। কিন্তু তা কিনবে কে। কার পয়সা আছে অত! প্রতিবেশী লায়েক আলি আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, চলে যাচ্ছিস কেন? এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিলেন বিনয়বাবু, ভেবেছিলেন, সত্যিই তো, কেন চলে যাচ্ছি! অশিক্ষিতদের মতো তুইও কি ভাবছিস যে আমাদের এমন পুরনো সম্পর্ক এক দিনেই ঘুচে যাবে! বিনয়বাবু বলেছিলেন, সবাই তো তাই বলছে। কিন্তু কে এই সবাইটা! দেশের মানুষ, না কয়েকটা রাজনৈতিক গুণ্ডা! তারপরে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল এখানে ওখানে, হিন্দুদের ঘর পুড়েছিল, ছোরাছুরি চলেছিল। এক এক জায়গায় ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছিল এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেও সাধারণ মানুষে করে নি। রোজই খবর রটাচ্ছিল যে কলকাতায় কত লোক মরেছে, কোন্ ট্রেন

সেদিক থেকে এসেছে কতগুলি মৃতদেহ নিয়ে, নানা ভাবে উত্তেজিত করেছিল দেশের মানুষকে। তারপব সেই লায়েক আলিই বিনয়বাবুকে বলেছিল, না ভাই, তোকে আর থাকতে বলব না। গুণ্ডারা তোদের থাকতে দেবে না। যত দিন তোরা না যাবি, তত দিন এই অশান্তি চলবে। বিনয়বাবুর হাত ধরে কেঁদেছিল লায়েক আলি, আর বিনয়বাবু কেঁদেছিলেন বন্ধুর হাত ধরে। আমরা কি কোন দিন পর ছিলাম, না ধর্ম আমাদের অন্তরায় ছিল আত্মীয়তার।

স্বাতি আমাকে নীরব দেখে জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ?

বললুম : ভাবছি তার পরের ঘটনা।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তার পরেও আবার ঘটনা আছে নাকি! সেই ঘটনার জন্যেই তো বিনয়বাবু আজও চোখের জল ফেলেন। বন্ধুকে রক্ষার জন্যে বুঝি প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি!

আমি বললুম : এ রকম ঘটনা তো অনেক ঘটেছে। হিন্দুকে রক্ষার জন্য মুসলমান, আর মুসলমানকে রক্ষার জন্য হিন্দু অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু লায়েক আলি যে বিনয়বাবুকে রক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন সে কথা তিনি জেনেছিলেন সব শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন পাড়ায় এসে পৌঁছেছে বিনয়বাবুর যাত্রার আয়োজন তখনও শেষ হয় নি। লায়েক আলি বলল, নিজের বাড়িতে আর নয় ভাই। আমার কাছে এসে থাক লায়েক আলি সবাইকে শুধু বাড়িতেই আনল না, নিজের পোশাক দিল বিনয়বাবুকে, আর বোরখা দিল বিনয়বাবুর স্ত্রীকে। এই পোশাকেই তাঁরা পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন। পোশাক বদলেছিলেন ভারত সীমান্তে এসে।

লায়েক আলির কী হয়েছিল?

গুণ্ডারা যখন বিনয়বাবুর বাড়ি আক্রমণ করে, লায়েক আলি

তখন বাড়ি ছিল না। লুঠ হচ্ছিল বাড়ি, আর ছটফট করছিলেন বিনয়বাবু। লায়েক আলির স্ত্রী তাঁকে বের হতে দেন নি। কিন্তু চেঁচামেচি মারামারি কেন হচ্ছিল তা কেউই বুঝতে পারেন নি। রাতের অন্ধকারে সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর দিনের আলোয় সব দেখা গিয়েছিল। জনকয়েক গুণ্ডার সঙ্গে লায়েক আলিরও মৃতদেহ পড়ে আছে। দাড়ি কামিয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে লায়েক আলি বুঝি বিনয়বাবু সেজেছিল।

এবারে স্বাতি আমাকে নীরব থাকতে দিল। আর কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম: বিনয়বাবুর মুখে এই গল্প আমি অনেকবার শুনেছি, ঠিক একই রকম করে সবাইকে তিনি এই গল্প বলেন। আর গল্প শেষ করে বলেন, এ দেশ বুঝি কোনদিন দেশের লোকের হবে না!

রাতে রঞ্জিতবাবু কখন ফিরেছিলেন তা দেখতে পাই নি। দেখা হল সকালবেলায়। ডাইনিং হলে চা খেতে এসে তিনি যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। দরজার দিকে চোখ রেখে তিনি বসেছিলেন, আর এক খণ্ড কাগজের উপরে কিছু লিখছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই নমস্কার করে বললেন: কাল রাতে আপনাদের বিরক্ত করি নি। চা খেয়ে নিন, তারপরে কথা হবে।

আমরাও তাঁকে নমস্কার করলুম। স্বাতি বলল: বাজারে পেলেন কিছু?

ভদ্রলোক বললেন: না। তাতে অসুবিধের কিছু হবে না। ছেলেবেলায় ভূগোল পড়েছি, এখনও কিছু মনে আছে।

বলে কাগজখানা তুলে ধরতেই দেখলুম যে তিনি নিজেই একখানা মানচিত্র এঁকে ফেলেছেন। অবিভক্ত বাঙলার মানচিত্র, ব্রহ্মপুত্র পদ্মা ও মেঘনার ধারা এঁকেছেন অনেক যত্নে। আমরা তাঁরই টেবিলে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসতে তিনি খুশী হলেন। স্বাতি বলল: আজ আপনি আমাদের সঙ্গে চা খান।

ভদ্রলোক বললেন: চা আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

আমি বললুম: তবে কফি খান এক পেয়ালা।

আলাপ সহজ হয়ে গেল। ভদ্রলোক সাগ্রহে আমাদের পূর্ববঙ্গের সীমানা বোঝাতে আরম্ভ করলেন।—

দেশ স্বাধীন হবার আগে বাঙলা দেশে পাঁচটি বিভাগ ছিল। তার মধ্যে তিনটি বিভাগ ভাগাভাগি হয় নি। বর্ধমান বিভাগটি পশ্চিম বাঙলার ভাগে পড়েছে, ঢাকা আর চট্টগ্রাম বিভাগ দুটি পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। ভাগাভাগি হয়েছে রাজসাহী ও

প্রেসিডেন্সী বিভাগ। এই দুটি বিভাগের বোধহয় এক-তৃতীয়াংশ এখন পশ্চিম বাঙলার। বাকিটা পূর্ব পাকিস্তানের। চট্টগ্রাম বিভাগের ত্রিপুরা রাজ্য এখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

একসময় উত্তরবঙ্গ বললে গোটা রাজসাহী বিভাগ বোঝাত। এই রাজসাহী বিভাগের দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলা আর কুচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছে, মালদহ ও দিনাজপুরেরও কিছু অংশ আছে। বাকি সবটাই এখন পূর্ব পাকিস্তান।

সেকালের পশ্চিমবঙ্গ বলতে বোঝাত বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ দুটি। আর কলকাতার খাস বাসিন্দারা যশোহর ও খুলনার মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের লোক বলে মানতে চাইত না। এখন যশোহর খুলনা তো পাকিস্তানে গেছেই, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলারও অনেকটা পড়েছে পাকিস্তানে। পূর্ববঙ্গ বলতে এখন পাকিস্তানকেই বোঝায়, এবং পাকিস্তানী বললে বোঝায় পূর্ববঙ্গের মানুষ। রেফিউজি কথাটা এখনও চলছে। তার কারণ দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যারা চলে এসেছিল, তাদের অনেকেই এখনও পাঞ্জাবীদের মতো স্বাবলম্বী হয় নি। আর এখনও মাঝে মাঝে পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুরা চলে আসছে। সরকারী সাহায্যের উপরে নির্ভর করে যারা দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্যে দুর্নাম হয়েছে পূর্ববঙ্গের পরিশ্রমী বাঙালীর।

আমাদের চা এসে গিয়েছিল। আর কফি এসেছিল রঞ্জিতবাবুর। পরিবেশনের কাজে খানিকটা সময় কাটল। তারপরে আমি বললুম: পূর্ববঙ্গে যাবার একটি পথও আমার জানা নেই।

রঞ্জিতবাবু মেনে নিলেন আমার অনভিজ্ঞতাকে। বললেন: ও পথে যাতায়াত না করলে তো পথ জানা সম্ভব নয়। ট্রেন আপনাকে কলকাতা থেকে পদ্মার উপর সারা ব্রীজ পেরিয়ে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে দেবে। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে জগন্নাথগঞ্জ। কিংবা পদ্মার এপারে ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর বা গোয়ালন্দ ঘাটে

আপনাকে নামিয়ে দেবে। ঢাকা মেল চিটাগং মেল কিংবা সুর্মা মেল—যে কোন মেলেই চাপুন, নামতে হবে গোয়ালন্দ ঘাটে। সেখান থেকে বড় বড় স্টিমার। কেবিন আছে বড়লোকদের জন্যে। গরিবদের জন্যে ডেক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলবে পদ্মার উপর দিয়ে। ঢাকা যেতে চান তো নামুন নারায়ণগঞ্জে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ঢাকা মাত্র এগার মাইল। চট্টগ্রাম যেতে হলে চাঁদপুরের স্টিমারে উঠুন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল লাইন আছে ত্রিপুরা নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে। সুর্মা ভ্যালি আসামের শ্রীহট্ট জেলায়। এখন পাকিস্তানে পড়েছে। চাঁদপুর থেকে সিলেটেরও ট্রেন পাবেন, লাক্‌সাম জংসন কুমিল্লা আখাউরা জংসন হয়ে এই লাইন সিলেট শহরে পৌঁছেছে। সমুদ্রের ধারে নোয়াখালি শহরে যেতে চান তো লাক্‌সাম থেকে সোজা দক্ষিণে চলে যান, মৈমনসিংহ যেতে হলে আখাউরায় গাড়ি বদল করুন। আর আসামে যেতে হলে সোজা উত্তরে চলে যান বদরপুর লামডিং লাইনে। গৌহাটি থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রধান রেলপথটি গেছে লামডিংএর উপর দিয়ে।

কফি খাবার জন্য রঞ্জিতবাবু একটুখানি থামলেন। তারপরে বললেন: ত্রিপুরারাজ্যে কোনও রেল পথ নেই, এই রাজ্যের সীমান্তে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার উপর দিয়ে রেলপথ আছে। আখাউরা জংসন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল।

আমি বললুম: আগরতলা যাবার পরিশ্রমের কথা আমি শুনেছি। কলকাতা থেকে বেরিয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পরিক্রমা করে ত্রিপুরায় পৌঁছতে হয়।

রঞ্জিতবাবু হেসে বললেন: কথাটা মিথ্যে নয়। উড়োজাহাজে গেলে দুশো মাইলের মতো দূরত্ব হবে।

তার মানে কলকাতা থেকে রাঁচীর মতন।

প্রায় তাই।

রঞ্জিতবাবু কফির পেয়ালায় কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললেন : উত্তর বাঙলা থেকে পূর্ববঙ্গে যাতায়াতের পথ কিন্তু অন্য। আমরা যাতয়াত করেছি ফুলছড়ি ঘাট ও বাহাদুরাবাদ ঘাট দিয়ে স্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে।

স্বাতি বলল : সে কোথায়?

রঞ্জিতবাবু বললেন : ফুলছড়ি ঘাট রংপুর জেলায়। কাটিহার থেকে দিনাজপুর পার্বতীপুর রংপুর হয়ে যে লাইন কুচবিহার গেছে লালমনির হাটের উপর দিয়ে, তারই উপরে কাউনিয়া জংসন। কাউনিয়া থেকে গাইবান্ধা বগুড়ার উপর দিয়ে এই লাইন বড় লাইনের সান্তাহার জংসন পর্যন্ত গেছে। ফুলছড়ি ঘাট যেতে হয় এই লাইনের বোনারপাড়া জংসন থেকে। ব্রহ্মপুত্রের নাম এখানে যমুনা। যমুনার এপারে ফুলছড়ি, ওপারে বাহাদুরাবাদ। বাহাদুরাবাদ থেকে ট্রেনে চেপে মৈমনসিংহের উপর দিয়ে ঢাকার পথ।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : কিছু বলবে?

স্বাতি বলল : রঞ্জিতবাবুর কথা শুনে ভারি আশ্চর্য লাগছে।

সচকিত হয়ে রঞ্জিতবাবু বললেন : কেন?

স্বাতি হাসল, বলল : মনে হচ্ছে যে সমস্ত পূর্ব বাঙলা আমরা ঘুরে এলাম।

এ কথা শুনে রঞ্জিতবাবুও হাসলেন, বললেন : গোপালবাবুর মতো বলতে পারি নে।

রঞ্জিতবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম : আপনি পূর্ব বাঙলার কথা বলুন।

রঞ্জিতবাবু ভাবলেন একটুখানি, তারপরে বললেন : পূর্ববঙ্গে জলপথেই ছিল যাত্রীদের যাতায়াত। আমার যত দূর মনে পড়ে, গত শতাব্দীর শেষদিকে বোধহয় ১৮৮৫-তে ঢাকায় রেল পথ বসে। ১৮৯১-এ যখন মণিপুর বিদ্রোহ হয়, তখন ইংরেজ সরকার প্রমাদ

গনেছিলেন। দেশ রক্ষার প্রয়োজনেই তাঁরা আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানীকে সরকারী সাহায্য দিয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে রেল লাইন বসাবার জন্যে। পাহাড়ের উপর দিয়ে বদরপুর লামডিং লাইন খুলতে এগারো বছর সময় লেগেছিল। চট্টগ্রামে রেললাইন বসেছে এই শতাব্দীব গোড়াব দিকে।

আমি বললুম: পশ্চিমবঙ্গে তো রেল পথ খোলার একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল: তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দণ্ডকারণ্য রেলপথে বোধহয় যাত্রী চলাচল এখনও শুরু হয় নি।

রঞ্জিতবাবু তাঁর নিজের কথাই বললেন: পদ্মার উপরে সারা ব্রীজ দেখেছেন?

আমি বললুম: নাম শুনেছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের বছর খানেক আগে বড়লাট হার্ডিঞ্জ সাহেব এই পুলের উদ্বোধন করেছিলেন বলে নাম তার হার্ডিঞ্জ পুল। সে যুগেই খরচ হয়েছিল একুশ লক্ষ পাউণ্ড। পদ্মার প্রকৃতির জন্যে এর মেরামত খরচও প্রচণ্ড। ইংরেজরা মেঘনার উপরেও এক বিরাট পুল তৈরি করেছিল, তার নাম ষষ্ঠ জর্জ ব্রীজ। নদীর এক পারে আশুগঞ্জ, অন্য পারে ভৈরব বাজার।

আমি বললুম: ব্রহ্মপুত্রের উপরে তো তারা কোন পুল তৈরি করে নি।

খরচের ভয়েই বোধহয় পিছিয়ে গেছে। ছেলেবেলায় আমরা শুনেছিলুম যে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে এমনি টান যে পুল তৈরি সম্ভব নয়। কিন্তু তাও সম্ভব হল স্বাধীন ভারতে। দেশরক্ষার প্রয়োজন পেটের ক্ষুধার মতো উগ্র, খরচের ভয়ে পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

আমি বললুম: খাঁটি কথা।

কফির পেয়ালা শেষ করে রঞ্জিতবাবু তা সরিয়ে রাখলেন, বললেন: পূর্ববঙ্গে না গেলে নদীনালার সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না।

ঘরে ঘরে নৌকো ও প্রাত্যহিক নানা কাজে নৌকোয় যাতায়াত, চোখে না দেখলে এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না।

স্বাতি বলল: কাশ্মীরে আমরা এই রকম দেখেছি। জলের ওপরেই জীবনযাত্রা।

বঞ্জিতবাবু বললেন: সেখানে ডাঙাও আছে শুনেছি। কিন্তু বর্ষার কয়েক মাস পূর্ববঙ্গে শুধু জল। নৌকো করে আমরা স্কুলে গিয়েছি, বাজার হাট করেছি নৌকোয়, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যেতে হয়েছে নৌকোয় করে। সত্যি কিনা জানি না, একটা কথা প্রচলিত আছে—যে বাড়ির পাশ দিয়ে নালা কি নদী বয়ে যায় না, বরিশালের লোক নাকি সে বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।

স্বাতি হেসে উঠল।

রঞ্জিতবাবু বললেন: হাসবেন না। নদীনালার সুবিধার কথাটা জানলে আপনিও মেনে নেবেন। এই উত্তরবঙ্গের কথাই ভাবুন। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে হলে আপনাকে হয় হাঁটতে হবে, নয় পাল্কিতে। সব গ্রামে গরুর গাড়ি চলবারও রাস্তা নেই। অথচ পূর্ববঙ্গে বাড়ি হলে ছুতোর মিস্ত্রীকে দিয়ে একখানা নৌকো তৈরি করে রাখুন। বর্ষায় জল আপনার ঘরের দরজায় আসবে, অন্য সময় নদীনালা দিয়ে সেই জল বইছে। জলে নৌকো ঠেলে দিয়ে উঠে বসুন। গরু ঘোড়া চাই নে, লোকজন চাই নে, যেখানে খুশি চলে যান আর যা খুশি নিয়ে আসুন।

স্বাতি বলল: পায়ে হেঁটে ঘরের বাইরে বেরবার উপায় নেই?

রঞ্জিতবাবু বললেন: না।

আমি বললুম: ভারি কষ্ট তো!

এবারে রঞ্জিতবাবু হাসলেন, বললেন: আপনারা কষ্ট ভাবছেন, আর বর্ষার কথা শুনলে আমরা ভাবতাম যে আনন্দের দিন আসছে।

সবিস্ময়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকেই বর্ষাকে অভিনন্দন

জানাবার জন্যে আমরা তৈরি হতাম। যে নালা শুকিয়ে গেছে, তাকে কেটে চেঁচে পরিষ্কার করে রাখা হত। পদ্মার জল আসবে। এক মাইল দু মাইল করে জল আসছে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। রোজ সকালে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের গ্রামে জল আসতে আর দেরি নেই। তারপরে সত্যিই একদিন জল আসে। আর জাল ফেলে ছোট মাছ ধরবার কী ধুম। তারপরে নালার জল উঠবে দু পাশের ক্ষেতে। এক আঙুল দু আঙুল করে জল বাড়বে, ধান আর পাটের গাছ কিন্তু কিছুতেই ডুববে না। জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছ বাড়বে, গাছের মাথা জলের উপরে জেগে থাকবেই। একদিনে তো জল বাড়ে না, বাড়ে অল্প অল্প করে।

স্বাতি বলল: ভারি মজার ব্যাপার তো!

রঞ্জিতবাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন: তার চেয়েও মজার ব্যাপার আছে। সে হল চাষীদের কথা। এক সঙ্গে তারা চার রকমের শস্য লাগাবে। তিল আর কাউন কেটে নেবে বর্ষার আগে। ধান আর পাট ডুবে যাবে জলে। কিন্তু জানেন তো, ধান কাটতে হয় হেমন্তে, আর ভরা বর্ষায় পাট কাটতে হয় জলে ডুবে। এক মানুষের উপর জল, আর ধান পাট একই ক্ষেতে এক সঙ্গে মিলে আছে।

বললুম: এ যে একটা ধাঁধার মতো হল।

রঞ্জিতবাবু বললেন: সত্যিই ধাঁধা। বাঁশের দুটো খুঁটি পুঁতে সেই খুঁটিতে লম্বা দুখানা বাঁশ বাঁধতে হবে জলের নিচে। চাষীরা একটায় দাঁড়িয়ে আর একটা ধরে এগোবে, আর মাঝে মাঝে ডুবে পাটের গাছ গোড়া থেকে কেটে তুলবে। ভুল করে ধানের গাছ কাটলে চলবে না। তাদের দক্ষতা দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আর রঞ্জিতবাবু বললেন: অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তো! আমার কাছেই এখন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

একটু থেমে বললেন: বাঙলা নদীমাতৃক দেশ বলে একটা কথা

আছে। সত্যিকার নদীমাতৃক দেশ বলতে বোধহয় পূর্ববঙ্গকেই বোঝায়।

আমি বললুম: আমি শুধু পদ্মা ও মেঘনার নাম জানি।

রঞ্জিতবাবু বললেন: যমুনা নাম শোনেন নি?

স্বাতি বলল: কালিন্দী যমুনা!

রঞ্জিতবাবু মাথা নেড়ে বললেন: না, কালিন্দী যমুনা হল উত্তর ভারতের নদী। বাঙলার যমুনা ব্রহ্মপুত্রেরই নাম। আসাম ছেড়ে যখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখনই তার নাম যমুনা। এই নামেই সে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে গোয়ালন্দের কাছে। এই দুই নদীর মিলিত ধারার নামই পদ্মা। পদ্মা মেঘনার সঙ্গে মিলেছে চাঁদপুরের কাছে।

আমি হেসে বললুম: আমি দুটি নদী বলেছি, আপনার হিসেবে তিনটি হল।

রঞ্জিতবাবু বললেন: ধলেশ্বরী যমুনা থেকে বেরিয়ে মেঘনায় মিলেছে। ঢাকা শহর বুড়িগঙ্গার ধারে আর শীতল লক্ষার তীরে নারায়ণগঞ্জ। নাম শুনেছেন এসব নদীর?

বললুম: না।

মধুমতী ইছামতীর নাম?

শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

বোধহয় ভাটিয়ালী গানে শুনেছেন।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন: কলকাতা থেকে বেরিয়ে স্টিমারে যে কামাখ্যা যাওয়া যায় জানেন?

বললুম: নিশ্চয়ই যাওয়া যায়। গঙ্গা থেকে ব্রহ্মপুত্র ধরে এগোলেই হল।

রঞ্জিতবাবু অনেক আনন্দে হাসলেন, বললেন: ওপথে নয়, পূর্ববঙ্গের পথেই স্টিমার চলাচল করে। একসময় শৌখিন লোকেরা মালবাহী স্টিমারের কেবিনে চড়ে বেড়াতে বেরতেন। কলকাতা

থেকে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে খুলনায় যেতেন, খুলনা থেকে বরিশাল হয়ে গোয়ালন্দ। তারপর সিরাজগঞ্জ ফুলছড়ি ঘাট ধুবড়ি ও গোহাটি। বাঙলার দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকায় এত নদী নালা যে তার হিসাব রাখা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। নাম শুনবেন কয়েকটা নদীর?

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: শুনব।

ভদ্রলোক বললেন: সাগর দ্বীপের কাছে গঙ্গার নাম হুগলি, তার পাশে একে একে বারাতলা জামীরা মাতলা গুয়াসুবা রায়মঙ্গল মালঞ্চ কাঙ্গা বাঙ্গরা হরিণঘাটা তেঁতুলায় হাতীয়া, সব শেষে মেঘনা।

স্বাতি হেসে উঠল।

লজ্জা পেয়ে রঞ্জিতবাবু বললেন: হাসলেন যে!

স্বাতি বলল: আপনার স্মৃতিশক্তি দেখে।

এবারে রঞ্জিতবাবুও হাসলেন। বললেন: ছেলেবেলায় ম্যাপ দেখে মুখস্থ করেছিলাম নদীর নাম। কিন্তু সে তো শুধু নামেব আরম্ভ, তার শেষ জানে এমন লোক আমার জানা নেই।

আমাদেরও জানবার দরকার নেই। আপনি যা জানেন, তাই বলুন।

তবে নদীর কথা থাক। কেননা কোন্‌টা নদী আর নালা কোন্‌টা, তাও অনেক সময় বুঝবার উপায় থাকে না। দু পাশে ফ্ল্যাট বেঁধে মালভর্তি স্টিমার যখন নদী নালা দিয়ে যাতায়াত করে, তখন শুধু সারেঙ্গরাই বলতে পারে যে কোন্‌টা নদী আর কোন্‌টা নালা, কখন কোথায় দাঁড়াতে হবে উল্টো দিকের স্টিমারের জন্যে, আর কোথায় জোয়ারের অপেক্ষা করতে হবে কম জলের জন্যে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

স্বাতি বলল: লোকার কথা শুনেছিলাম কেরালায়।

বললুম: সে তো একটা সোজা খাল। কেরালা রাজ্যের

মাঝখান দিয়ে গেছে। মাদ্রাজ রাজ্যের বাকিংহাম খালও তেমনি।

মাথা নেড়ে বঙ্কিমবাবু বললেন: বাঙলার নদী-নালার তুলনা এদেশে নেই, বিদেশেও আছে কিনা জানি নে। ভাবতে পাবেন?

বলে বঙ্কিমবাবু একটুখানি থামলেন। তারপরে বললেন: বর্ষাকালে আপনি প্রথম যাচ্ছেন পূর্ববঙ্গে। গোয়ালন্দ ঘাটে এসে নামলেন, তারপরে স্টিমারে উঠলেন, পদ্মার স্রোত বেয়ে এগিয়ে চললেন। বড় নদী, দুধারে শুধু জলই দেখছেন। ভাগ্যকুল ছাড়িয়ে তারপাশা স্টিমার ঘাটে এসে নামলেন। সেখান থেকে দশ মাইল দূরে এক গ্রামে আপনার বন্ধুর বাড়ি। আপনাকে নৌকোয় উঠতে হবে, আর নৌকো থেকেই নামতে হবে বন্ধুর বাড়ি। আপনি নদী দিয়ে এলেন, না নালা দিয়ে, না ক্ষেত-খামারের উপর দিয়ে, তা কি বুঝতে পারবেন? গ্রামগুলি নয়, গ্রামের বাড়িগুলিই শুধু জলের উপরে জেগে আছে। এ দৃশ্য কল্পনা করতে পারবে এ অঞ্চলের বাঙালী?

আমি তখনই স্বীকার করলুম: পারবে না।

ভদ্রলোক বললেন: হয়তো ভাবছেন যে গ্রামের মানুষ মনমরা হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। এ কথা মনে করলে মারাত্মক ভুল করবেন। স্টিমার ঘাটে আপনি যদি দিনের আলোয় নেমে থাকেন, তাহলে কর্মব্যস্ত গ্রামবাসীকে দেখতে পাবেন সর্বত্র। ছেলেরা নৌকোয় চেপে স্কুলে যাচ্ছে মহানন্দে, দুষ্টু ছেলেরা নৌকো উল্টে দিয়ে স্কুল পালাবার কথা ভাবছে। বড়রা অফিস কাছারী হাট বাজারে যাচ্ছে, ডুবে ডুবে ক্ষেতের কাজ করছে চাষীরা, জেলেরা মাছ ধরছে নৌকোয় করে। জল বৃষ্টির পরোয়া কেউ করে না। যদি আপনি সন্ধ্যেবেলায় নেমে থাকেন আর জ্যোৎস্নার আলো থাকে আকাশে তো আরও অপূর্ব দৃশ্য দেখবেন। শৌখিন মানুষেরা নৌকোয় করে বেড়াতে বেরিয়েছেন। গান বাজনা হচ্ছে নৌকোয়।

বাইজীর গান নয়, নিজের পরিবারের লোকই গান গাইছে। পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত শোনেন নি?

বলে তিনি স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল: শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে।

রঞ্জিতবাবু বললেন: লোকসঙ্গীতের মাধুর্য তাতে থাকে না। বন্ধুর বাড়ি যাবেন বলে যখন আপনি তারপাশার স্টিমার ঘাটে নৌকোয় উঠলেন, আকাশে তখন তারা উঠেছে, আর কেউ গাইছে সেই পুরনো প্রিয় ভাটিয়ালি গানখানি—

ওরে সুজন নাইয়া,
কোন্ বা কন্যাব ছাশে যাওরে সাধের তরী বাইয়া!
লক্ষ তারার নয়ন তলে
কার চাহনির মানিক জ্বলে
আব্ছা মেঘের পত্রখানি কে দিল পাঠাইয়া।

রঞ্জিতবাবু গুনগুন করে গানখানি মনে করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না সবটা মনে করতে। শেষ পর্যন্ত শেষের কয়েক লাইন গেয়ে শোনালেন—

নদীর জলের আশিতে হায়
কোন্ সে কন্যা ছাখে তোমায়,
সাঁঝের পিদিম ভাসায় জলে কে তোমারে চাইয়া।

চা খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘরেও ছিলেন না আর কেউ। তাই রঞ্জিতবাবুর গান কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। স্বাতি বলল: তোমাদের দেশে এমন গান নেই? বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: এমন কবিত্বময় গান বোধহয় নেই।

যা আছে তার নমুনা দাও একটা।

বললুম: আমাদের দেশের গানকে ভাটিয়ালি বলে না, বলে ভাওয়াইয়া। আর সুজন নাইয়া হল কৃষ্ণ কানাই। লীলা যে গানটা তোমাকে শুনিয়ে গেল, তাই মনে কর না।—

কানাইরে, কেমন করিয়া হইমুরে দরিয়া পার।

কশিয়া আর এলুয়া

নদী হইছে হুলুস্থুলু রে—

কিন্তু আমি থামতেই স্বাতি বলল: বল তারপরে। অনেক চেষ্টা করেও তার পরের পংক্তি আর মনে করতে পারলুম না। বললুম: দীর্ঘদিন দেশ ছাড়া কিনা, ভুলে গিয়েছি দেশের গান। তবে কবিত্ব যে একেবারে নেই তা নয়। একটি গানে আছে—কলসী ভরেয়া দিব তুই নয়নের জলে।

স্বাতি রঞ্জিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল: আপনি যে গানটি শোনালেন তা আধুনিক কোন কবির লেখা মনে হচ্ছে। লোক-সঙ্গীতের ভাব যেমন সুন্দর, গানের ভাষা তেমন মধুর নয়। কিন্তু আপনার গানের ভাষা নিতান্তই আধুনিক।

রঞ্জিতবাবু কোন প্রতিবাদ করলেন না, বললেন: ভাষার চেয়ে ভাবটাই বড়।

একটু থেমে প্রশ্ন করলেন: পূর্ববঙ্গের ব্রতকথা শুনেছেন?

দুজনে একসঙ্গে বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: মাঘ মণ্ডলের ব্রত একটি অপূর্ব জিনিস। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা এই ব্রত করে পৌষের সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত। সূর্য ওঠার অনেক আগে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। যায় নদীর ঘাটে, কিংবা পুকুরের পারে। জল নিয়ে খেলা করতে করতে বলে—

চোখে মুখে পানি দিতে কি কি ফুল লাগে?

ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।

সেই ফুলে খান কি?

নল ভাইঙ্গা জল খান।

যে জল ছোঁয় না লো কাকে বগে,

সে জল ছুঁই মোরা দুর্বার আগে।

ফুলের গন্ধ জল পুকুরেতে ভাসে,
ওই দেইখ্যা মেলেনীটা খটখটাইয়া হাসে।
হাসিস না লো, খুশিস না লো, তুই তো আমার সই!
মাঘ মণ্ডলের বর্ত করুম, ঘাট পামু কই?

এমনি করে শীতের কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের উদয় হবে।—

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেইলা দিছেন কেশ।
তাই দেইখ্যা সূর্যি ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেইলা দিছেন শাড়ি,
তাই দেইখ্যা সূর্য্যি ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেইখ্যা সূর্য্যিঠাকুর বিয়া করতে চায়।

শেষ পর্যন্ত মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে বিয়ে হয় সূর্যের। তারপর বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়।

স্বাতি বলল: ভারি মজার ব্রত তো!

রঞ্জিতবাবু বললেন: এ রকম ব্রতের তাৎপর্য বুঝতে পারেন?

বলে তাকালেন স্বাতির দিকে।

স্বাতি তৎপর ভাবে উত্তর দিল: না।

ভদ্রলোক বললেন: এই সব মেয়েরা যখন বউ হয়ে পরের সংসারে যাবে, তখন শীতের সকালে ওঠার অভ্যাস তাদের হয়ে গেছে। বিয়ের আগে পাঁচ বছর তারা এই ব্রত পালন করেছে তো!

ভদ্রলোক থামলেন একটুখানি, তারপরে বললেন: তারাব্রতে তাদের সারা দিন উপবাসী থাকার অভ্যাস। বাড়ির সবাইকে খাইয়ে নিজে খেতে বসবার আগে অতিথি এল একজন। অতিথি নারায়ণ, তার সেবা করতেই হবে। কাজেই সেদিন আর আহার জুটল না দিনের বেলায়। তারাব্রত করে একবেলা আহারের অভ্যাসও হয়েছে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এখনও কি পূর্ব বাঙলার মেয়েরা এইসব ব্রত পালন করে ?

রঞ্জিতবাবু সত্যি কথা বললেন : জানি নে। আমি আমার শৈশবে যা দেখেছি, তাই আপনাকে বললাম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : এগুলি কুমারী ব্রত। ব্রতের উপকরণ আহরণ, পুকুর কেটে বা আলপনা এঁকে নিজের কামনাব প্রতিচ্ছবিতে ফুল ধরিয়ে ব্রতকথা শোনা—এই হল কুমারী ব্রত। বিয়ের পরে মেয়েরা যে সব ব্রত পালন করে তাকে আমরা নারীব্রত বলি। পুরোহিতেরা এই সব ব্রতকে শাস্ত্রীয় ব্রতের মতো জটিল করে তুলেছেন। এই সব ব্রতে বৈদিক ব্রতের গভীরতা নেই, আবার লৌকিক ব্রতের সজীবতা ও সরলতাও নেই। ব্রত তাই বাঙলার মেয়েদের আদর হারিয়েছে। অথচ এমন সুন্দর জিনিস বাঙলার বাইরে আর কোথায় আছে জানি নে।

হোটেলেব বেয়ারা আমাদের চায়ের বাসনপত্র অনেকক্ষণ আগে নিয়ে গিয়েছিল। এবারে এসে জিজ্ঞাসা করল : আর কিছু দেব ?

রঞ্জিতবাবু চমকে উঠলেন, বললেন : না না, আর কিছু নয়। আপনাদের অনেক সময় আমি নষ্ট করেছি।

বলে উঠে দাঁড়িয়েই ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেলেন।

আমরাও উঠে পড়লুম।

স্বাতি বলল: লাল সাহেবকে আজ একবার দেখে আসা দরকার।

আমি বললুম: আমরা যে ফিরে যাচ্ছি, সেকথাও জানিয়ে আসব।

তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করবে না?

বললুম: না।

স্বাতি মুখে কোন প্রশ্ন করল না, কিন্তু দৃষ্টি দিয়ে সেই প্রশ্নটি জানিয়ে দিল। আমাকে তাই বলতে হল: ও কথায় তিনি খুশী হবেন, না দুঃখ পাবেন, তা তো জানি নে। তাই কিছু না বলাই ভাল।

স্ত্রীর কথায় পুরুষ দুঃখও পায় বুঝি!

স্বামীর কথাতেও মেয়েরা দুঃখ পায় শুনেছি। ওসব ব্যতিক্রম। ও নিয়ে গল্প লেখা যায়, কিন্তু কোন সত্য প্রমাণ করা যায় না।

নিজেদের ঘরে আমরা ফিরে গেলুম না, হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা পথে এসে নামলুম। রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, হেমন্তের শিরশিরে হাওয়ায় এখন শীতের আমেজ।

স্বাতি বলল: তোমার শীত করছে না তো?

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

কিন্তু স্বাতি চটে উঠল, বলল: হাসলে যে?

তোমার গিন্নিপনা দেখে।

ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা ভারি করে স্বাতি বলল: অসুখ করলে যে আমাকেই ভুগতে হবে।

তা বটে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই এ ভাবনা তোমার এল কেমন করে! আমি তো রোমিও নই, তুমিও নও জুলিয়েট।

সকৌতুকে স্বাতি বলল : কোন্ দিনের কথা বলছ ?

এত তাড়াতাড়ি সে কথা ভুলে গেলে !

স্বাতি সেই পুরনো ঘটনা মনে করবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকে সূত্র ধরিয়ে দিলুম : প্রথম দিনে নয়, দ্বিতীয় দিন। দুপুর বেলায় ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রের ধারে যেতে দিলে না, রাতে ঘুমোতে পারি নি বলে জোর করে আমায় ঘুম পাড়ালে।

স্বাতি হেসে উঠল খিল খিল করে, বলল : সে তো রোমিও জুলিয়েটের গল্প নয়, সে গল্প তো উর্বশী পুরূরবার।

আমি হেসে বললুম : বেশ মনে আছে দেখছি।

স্বাতি বলল : মনে থাকবে না! তুমি পুরূরবা হয়ে ইন্দ্রের সভায় যাবে ভাবছিলে, আর আমি ঠেলা দিয়ে তোমায় মাটিতে ফেলে দিলুম।

তাতেই তো দেখা পেয়েছিলুম উর্বশীর।

স্বাতি আর একবার হেসে উঠল, বলল : তোমার উর্বশীর ধারণা দেখে আমার কান্না পায়।

বললুম : নন্দনবাসিনী উর্বশী তো নয়, এ আমাদের বাঙলা দেশের উর্বশী।

স্বাতি এ কথার কোন উত্তর দিল না, বোধহয় অশোভন কোন প্রত্যুত্তরের আশঙ্কায় অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল। বলল : কাল গ্যাংটকে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে।

আমি বললুম : তুমি পাশে থাকলে কষ্ট কী!

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি ভর্ৎসনা দেখলুম। তাই তাড়াতাড়ি বললুম : ওঠা নামার সময় একটু সাহায্য চাই, আর ঝাঁকানির জন্যে একটা অবলম্বন।

স্বাতি হাসল আমার কৈফিয়ত শুনে। বলল : তোমার ভাগীরথী পর্বে সিকিমের কথা কাজে লাগবে কি ?

বললুম ঃ ভাগীরথী তো এখনও পেঁছিতে পারি নি, তার সম্ভাবনাও চোখের সামনে উজ্জ্বল দেখছি নে।

কেন ?

সিকিম কালিম্পঙ আছে, তারপর ফালুট সন্দকফু। এ সব দেখে ফেরবার পথে যদি গৌড় পাণ্ডুয়া দেখতে মালদহে নেমে পড়, তাহলে তো ভাগীরথীর তীরে পেঁছিতেই পারব না।

গৌড় পেঁছিতে পারলে দুশ্চিন্তা নেই। ভাগীরথীর বদলে গৌড় পর্ব হয়ে যাবে।

তাতে অন্য ভয় আছে, সে আরও মারাত্মক।

স্বাতি আমার কথা বুঝতে পারে নি দেখে বললুম ঃ রঞ্জিতবাবুদের ভয়। তাঁরা আমাকে রেহাই দেবেন না।

খুব ধীরে ধীরে আমরা পথ চলছিলুম। আজ আমাদের কোন তাড়া নেই, ছুটির দিন বলে মনে হচ্ছে। আমাদের ভ্রমণের সময় এমন ছুটির দিন কম এসেছে। গোটা ভারতবর্ষটা আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দেখেছি। ধীরে সুস্থে ভাল করে কিছুই দেখা হয় নি। এমন করে দেশ দেখা সকলের পছন্দ হয় না, তারা রয়ে বসে একটু একটু করে সব কিছু দেখতে চায়। দেশ তো শুধু তীর্থ আর পুরাতত্ত্বের নিদর্শন নয়, দেশের মানুষ ও তার সামাজিক চেতনাকে বাদ দিয়ে দেশের কথা সম্পূর্ণ হয় না। তাড়াহুড়ো করে দেখলে তাই দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এখনও আমাদের অনেক কিছু দেখতে বাকি আছে। আমাকে নিঃশব্দে পথ চলতে দেখে স্বাতি বলল ঃ কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

আমি বললুম ঃ মুখ বুজে থাকা কি কষ্টের লক্ষণ ?

স্বাতি বলল ঃ তোমাকে নীরব দেখলে তাই মনে হয়।

সে আমার দুর্ভাগ্য। আমি জানতুম যে কষ্টে মানুষ কাতরায়। আর চুপ করে থাকে চিন্তার সময়।

স্বাতি বলল ঃ এখন তোমার কিসের চিন্তা ?

বললুম : গৌড় পর্বের। ভাগীরথী পর্ব কি তাহলে গৌড় পর্বে পরিণত হবে ?

তা কেন হবে। ভাগীরথী পর্ব হবে গৌড় পর্বের পরে। তার জন্যে নতুন উদ্যম চাই আরও কিছু। সে পরের ভাবনা।

কথায় কথায় আমরা হাসপাতালের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলুম। লাল সাহেবের সঙ্গেও দেখা হল। তিনি ভাল আছেন, কিন্তু মনের বল এখনও ফিরে পান নি, অবসন্ন মন নিয়ে শয্যায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁকে প্রফুল্ল থাকবার পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

কিন্তু পথে নেমে স্বাতি বলল : একা কি প্রফুল্ল থাকা যায়!

আমি বললুম : সাধনায় তা সম্ভব। সাধকেরা সচ্চিদানন্দ।

স্বাতি বলল : লাল সাহেবকে তাহলে সাধনা করতে বলা উচিত ছিল।

আমি হেসে বললুম : তার দরকার নেই। উনি উঁচু দরের সাধক শুনেছি, এক আসনে এক পিপে পান করতে পারেন। তাঁর স্ত্রী একথা জানেন বলেই বোধহয় নিশ্চিন্ত আছেন।

নিশ্চিন্ত!

বললুম : হ্যাঁ। দুর্ঘটনার সংবাদকে ছলনা ভেবে থাকলেও আশ্চর্য হব না। জানেন যে কিছু দিন বেসামাল থাকবার পরে ভালো ছেলের মতো ঘরে ফিরে আসবেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি এসব জানলে কোথায় ?

বললুম : আসামে সুনাম শুনেছি।

আসামের কথায় স্বাতি মণিপুরের কথা বলল : তুমি তো মণিপুর দেখ নি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

হেসে বললুম : নাচ শিখবে বুঝি!

বলে স্বাতি থেমে গেল। বলল : ফেরার পথে ত্রিপুরাও দেখব।

ত্রিপুরায় কী দেখবে ?

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাজ্য ত্রিপুরা, নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখবার আছে। ত্রিপুরা কি কুচবিহারের মতো আধুনিক রাজ্য ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: না। মহাভারতেও আমি ত্রিপুরার উল্লেখ দেখেছি।

মহাভারতের উল্লেখ করেই আমি লজ্জা পেলুম। কিন্তু স্বাতি আমার লজ্জা লক্ষ্য করে হাসল, বলল: বল না কোন্ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার নাম দেখেছ ?

একবার নয়, দুবার দেখেছি ত্রিপুরার নাম। পঞ্চ পাণ্ডবকে বনে পাঠিয়ে দুর্যোধন ভারতের সম্রাট হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন, কর্ণকে পাঠালেন দিগ্বিজয়ে। কর্ণ যেসব রাজ্য জয় করেন, তার মধ্যে ত্রিপুরার নামও আছে। তারপরে ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায় ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনায়। কোশলপতি বৃহদ্বল ত্রিপুরার সেনা পরিচালনা করেছিলেন।

রাজমালা নামে একখানি বাঙলা কাব্যগ্রন্থে আমরা ত্রিপুরার রাজাদের বংশপরিচয় পাই। এঁরা চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির বংশধর। যযাতির জরা গ্রহণ করবার জন্য তাঁর পঞ্চম পুত্র পুরু রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, আর প্রথম চার পুত্রকে যযাতি নির্বাসিত করেছিলেন, তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুকে যযাতি শাপ দিয়েছিলেন, তোমার যৌবন তুমি আমাকে দিলে না, তোমার বাসনাও কোন দিন পূর্ণ হবে না। এমন দেশে তোমাকে বাস করতে হবে যেখানে রাজার যোগ্য কোন যানবাহন চলে না, যাতায়াতের একমাত্র উপায় হবে ভেলা। নির্বাসিত দ্রুহ্যু ভারতের পূর্ব সীমান্তে হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণে পর্বতময় কিরাতরাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বা কপিলার তীরে কিরাতদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে দ্রুহ্যু হয়েছিলেন এই দেশের রাজা, নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ত্রিবেগ নগরে। দ্রুহ্যুর পরে তাঁর পুত্র ত্রিপুর

হয়েছিলেন দেশের রাজা। রাজমালার মতে এই ত্রিপুরের নামেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে।

স্বাতি বলল : তোমার ইতিহাস কী বলে ?

পণ্ডিতদের কথা শুনেছি। তাঁরা মনে করেন যে বর্তমান রাজবংশ শান জাতি থেকে উৎপন্ন, এই জাতি লৌহিত্য বংশ নামেও পরিচিত। বিদেশীরা বলে টিবেটো-বার্মান।

রাজমালার কি কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই ?

রাজমালা ইতিহাস নয়, কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তার মূল্য আছে। কাশ্মীরে যেমন রাজতরঙ্গিণী, ত্রিপুরায় তেমনি রাজমালা। কিন্তু সাহিত্য বিচারে দুটি গ্রন্থের অনেক তফাত। রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কহ্লনের কবিখ্যাতি দেশবিশ্রুত, আর রাজমালার রচয়িতার নাম আমরা অনেকেই জানি না।

সহসা স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

এ কথা আমারও খেয়াল ছিল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললুম : আমরা তো হোটেলেই ফিরে যাচ্ছি।

কোথাও একটু বসলে ভাল লাগত না !

তা লাগত।

স্বাতি বলল : থাক, এখন আমরা ঘরেই ফিরব। পথে তুমি ত্রিপুরার কথা বল।

আমি বললুম : ত্রিপুরার ইতিহাসের কথা থাক। ওতে ক্লান্তি আসবে। তুমি অন্য কথা বল।

আমি কী বলব ! তুমি বল, আমি শুনি।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে। বললুম : ত্রিপুরা যে একটি পীঠস্থান তা জান ?

না।

শোন তবে পীঠমালার শ্লোক।—

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদৌ দেবতা ত্রিপুরা-মাতাঃ।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ॥

স্বাতি বলল : কী মানে এই শ্লোকের ?

বললুম : ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। দেবীর নাম ত্রিপুরা, আর তাঁর ভৈরব ত্রিপুরেশ সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

কিন্তু এই পীঠস্থানের নাম তো আমরা শুনি নি!

আমরা জানি চন্দ্রনাথ তীর্থের নাম। চট্টগ্রামের পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথ তীর্থ।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল যে চন্দ্রনাথের নামও তার শোনা নয়। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই আমরা রঞ্জিতবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। পিছন থেকে হনহন করে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। আমরা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলুম বলে অনায়াসে ধরে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন : আপনারা কি হোটেলে ফিরছেন ?

বললুম : হ্যাঁ।

স্বাতি প্রশ্ন করে বলল : আপনি চন্দ্রনাথ দর্শন করেছেন রঞ্জিতবাবু ?

রঞ্জিতবাবু আশ্চর্য হয়েছিলেন এই প্রশ্ন শুনে, তারপরে বললেন : শৈশবে গিয়েছিলাম বাবা মার সঙ্গে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ত্রিপুরাও দেখেছেন নিশ্চয়ই ?

রঞ্জিতবাবু এবারে আরও আশ্চর্য হলেন। বললেন : কেন বলুন তো ?

হেসে বললুম : ভয় নেই আপনার। আমাদের ভাগ্যে তো আর এসব জায়গা দেখা হবে না, তাই আপনার কাছেই কিছু শুনতে চাই।

রঞ্জিতবাবু আশ্বস্ত হয় বললেন : এই কথা।

তারপরে ত্রিপুরার কথা আমাদের আগে বললেন, তারপরে চন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের কথা।

আখাউরা জংসনে নেমে মোটরে চেপে তাঁরা আগরতলায় গিয়েছিলেন। একটি আধুনিক শহর বলে তাঁর মনে হয়েছিল। প্রশস্ত রাজপথ, স্বচ্ছ সরোবর ও সাজানো উদ্যান। দূর থেকে দেখেছিলেন মহারাজার প্রাসাদ, নাম তার উজ্জয়ন্ত, পটে আঁকা ছবির মতো মনে হয়েছিল।

আগরতলা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে আর একটি জায়গায় তাঁরা গিয়েছিলেন। সেই জায়গার নাম উদয়পুর, পুরাকালে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। লোকে আজকাল সেই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যায় না, যায় ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে। একটি উঁচু টিলার উপরে নিতান্ত সাধাসিধে একটি মন্দির, রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মন্দিরের জাঁকজমক কেমন?

রঞ্জিতবাবু বললেন : বড় বড় গাছের ছায়া ও জঙ্গলের কথা আমার মনে আছে। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, গড়নেও নেই কোন শিল্পনৈপুণ্য। পীঠস্থান বলেই যাত্রীরা যাতায়াত করে নিয়মিত। এই দেবীর সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শুনেছিলুম, এখনও তা মনে আছে।

তারপরে সেই প্রবাদ শোনালেন আমাদের।

ত্রিপুরা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধন্যমাণিক্য গিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে, শিবকে তিনি নিজের রাজ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করবেন। অনেক চেষ্টা করলেন শিবকে তুলতে, কিন্তু পারলেন না। হাতি লাগিয়েও শিবলিঙ্গ নড়াতে পারলেন না। শেষে স্বপ্ন দেখলেন রাতে, শিব তো স্থানচ্যুত হবেন না, তাঁর বদলে ত্রিপুরাসুন্দরী যাবেন। কিন্তু এক রাত্রিতে যতটা সম্ভব ততটাই যাবেন, রাত্রি প্রভাত হলে তিনি হবেন অচল। রাজা ধন্যমানিক্য অনেক লোক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু উদয়পুরেই প্রভাত হয়ে গেল। উদয়পুরেই প্রতিষ্ঠা হল ত্রিপুরাসুন্দরীর। সেখানেই রাজা তাঁর মন্দির নির্মাণ করলেন।

অনেকে বলেন যে রাজা আগেই এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি এই মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রঞ্জিতবাবু এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে বলির কথা বললেন। সবাই বিশ্বাস করেন যে এই মন্দিরে এক সময় নরবলি প্রচলিত ছিল। মুইছিলি বা মাইছেলে নামে এই রাজ্যের একটি সম্প্রদায়ের উপরে বলির জন্য মানুষ সংগ্রহের ভার ছিল। নীরোগ শূদ্র সন্তান চাই, কিন্তু দীক্ষিত ও বিবাহিত হতে হবে। মুইছিলিরা বাঙলাদেশের গ্রাম থেকে নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত করে এই রকমের মানুষকে ধরে আনত। ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার প্রথম রাজা, যিনি এই নরবলিকে অমানুষিক মনে করলেন। নিজের রাজ্য থেকে তুলে দিলেন এই নৃশংস প্রথা। কিন্তু ধর্মসংস্কারকে তিনিও সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেন নি। শোনা যায় যে ময়দায় মানুষ তৈরি করে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন প্রথাকে সম্মান করা হত।

নরবলির কথা রাজামালাতেও আছে।—

পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি দিত।
সহস্র সহস্র বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত॥
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল॥

রেভারেণ্ড জেমস লঙের লেখাতেও নরবলির কথা আছে। তিনি লিখেছেন যে এই রাজ্যে কত নরবলি হয়েছে তার হিসাব নেই।

রঞ্জিতবাবু একটু থেমে বললেন: শুনে আশ্চর্য হবেন যে এই রাজমালা গ্রন্থ ত্রিপুর ভাষায় রচিত হয়েছিল। সুভাষা বা বাঙলায় অনুবাদ করিয়েছেন রাজা ধন্যমাণিক্য। তাঁর কাল ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম। ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি দিয়েছিলেন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন। মহারাজা রত্ন ফা রত্নমাণিক্য হয়েছিলেন। ত্রিপুরায় দশ হাজার বাঙালী এনে

বাঙলার সংস্কৃতি আমদানি করেন তিনি। তারপরে ধর্মমাণিক্য ও তাঁর রাণী কমলাবতী এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করেন। পথঘাট পুষ্করিণী ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, শুধু বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি নয়, ত্রিহুত থেকে ওস্তাদ আনিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসার করেন। নিজের সেনাদলে জাতিভেদ তুলে দেন। সৈন্যদের পংক্তি ভোজনে বসিয়ে একজন নীচ জাতের কুকি সর্দারকে লোক গণনা করতে বলেছিলেন। হাতে একটা কাঠি নিয়ে সেই সর্দার সকলের মাথা স্পর্শ করে লোক গণনা করে। রাজার ভয়ে সেদিন প্রতিবাদ কেউ করে নি, আর ভবিষ্যতে সেই সৈন্যরা কাঠি-ছোঁয়া নামে পরিচিত হয়েছিল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: রাণী কমলাবতী কী করেছিলেন?

রঞ্জিতবাবু বললেন: রাজার যোগ্য সহধর্মিণী যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এখনও তাঁর নাম শোনা যায় গ্রামে গ্রামে পল্লী-গীতিতে।

তখন আমরা হোটেলের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলুম। স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ঘরে ফিরবে, না কাকঝোরার দিকে গিয়ে যাবে?

রঞ্জিতবাবু বললেন: ঘরে ফিরে করবেন কী, চলুন না একটু এগিয়ে যাই।

স্বাতি বলল: সেই ভাল।

রঞ্জিতবাবু সময় নষ্ট করলেন না, বললেন: বোধহয় জানেন যে ত্রিলোচন নামে এই বংশের একজন রাজা পাণ্ডবদের সমসাময়িক ছিলেন ও যুধিষ্ঠিরের সভায় গিয়েছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। রাজমালায় একশো চুরাশি পুরুষের নাম আছে।

স্বাতি বলে উঠল: সর্বনাশ!

রঞ্জিতবাবু বললেন: কী একটা সম্পর্কে এঁরা আত্মীয় ছিলেন পাণ্ডবদের।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম: খুব ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশে কৃষ্ণ, আর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কৌরব ও পাণ্ডব। ত্রিলোচন জন্মেছেন যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুর বংশে। এই ঘটনা কত পুরুষ পরে চেষ্টা করলে তাও বলতে পারি। চন্দ্রবংশের বংশলতা আমাদের সব পুরাণে আছে।

রঞ্জিতবাবু কতকটা বিহ্বলভাবে বললেন: চেষ্টা করে বলুন না।

হেসে বললুম: পঁয়ষট্টি পুরুষের কম হবে না। কিন্তু সে কথা থাক। আপনি এবারে শ্রীহট্ট ও চন্দ্রনাথের কথা বলুন।

রঞ্জিতবাবু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, কিছু সময় নিলেন আমার কথার উত্তর দিতে। বললেন: সিলেটে আমি যাই নি। কিন্তু শুনেছি যে সিলেট শহর থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে একটি গ্রামে আছে গ্রীবা পীঠ। দেবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্বানন্দ। আটত্রিশ মাইল উত্তর পূর্বে আরও একটি পীঠস্থান আছে প্রাচীন জয়ন্তিয়া রাজ্যের ফালজোর গ্রামে। কালীর নাম জয়ন্তী ও ক্রমদীশ্বর ভৈরবের নাম।

আমি বললুম: চন্দ্রনাথও তো একটি পীঠস্থান।

রঞ্জিতবাবু বললেন: ত্রিপুরায় নাকি আরও একটি পীঠস্থান আছে। দেবীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল সেখানে। দেবীর নাম ত্রিপুরা ও ভৈরবের নাম নল।

স্বাতি বলল: আপনি দেখেছেন এই তীর্থ?

রঞ্জিতবাবু বললেন: না। সত্যি কথা স্বীকার করতে দোষ নেই, এই সব পীঠস্থানের কথা আমি সম্প্রতি শুনেছি। একজন আমাকে ত্রিস্রোতার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি বলেছিলাম যে তিস্তা নদীর নামই ত্রিস্রোতা। তিনি বলেছিলেন, ত্রিস্রোতা একটি পীঠস্থান, সতীর দক্ষিণ জানু সেখানে পড়েছিল। দেবী চণ্ডিকা ও ভৈরব সদানন্দ। এই ভদ্রলোকের কাছেই আমি জেনেছিলাম এই সব তীর্থের নাম। নিজে দেখেছি শুধু উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী ও চন্দ্রনাথের ভবানী।

স্বাতি বলল : এবারে তাহলে চন্দ্রনাথের কথা বলুন।

রঞ্জিতবাবু বললেন : তার আগে জয়ন্তীর পীঠস্থান আবিষ্কারের গল্পটি বলি। তিনশো বছর আগের ঘটনা। ফালজোর গ্রামের কয়েকজন রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে পূজা পূজা খেলছিল। একজন বালককে তৃণের খাঁড়া দিয়ে বলি করা হচ্ছিল। কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল যে সেই তৃণের আঘাতেই মুণ্ডচ্ছেদ হল। এই অলৌকিক ঘটনার পরেই পীঠস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করলুম না। বললুম : চন্দ্রনাথে বোধহয় এরকমের কোন গল্প নেই।

রঞ্জিতবাবু বললেন : আমার একটি পৌরাণিক গল্প জানা নেই। তপস্যার জন্য ব্যাসদেব যখন বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তখন ভৃগু তাকে নীচ জাতি বলে অপমান করেন। দুঃখে ব্যাসদেব কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেন, তাঁর কথায় দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে।—কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে। কলিযুগে শিব চন্দ্রশেখরে অবস্থান করবেন।

আমি বললুম : তন্ত্রচূড়ামণির মতে—

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
বক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা॥

চট্টগ্রামে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল। দেবীর নাম ভবানী আর ভৈরব চন্দ্রশেখর।

স্বাতি বলল : শাস্ত্রের কথা নয়, আপনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কথা বলুন।

রঞ্জিতবাবু বললেন : সব কথা তো ভাল মনে নেই, যেটুকু আছে তাই বলছি। চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুণ্ড মাইল পঁচিশের কম। স্টেশন থেকে চন্দ্রনাথ পাহাড় মাত্র মাইলখানেক দূরে। পাহাড় খুব উঁচু নয়, প্রায় সাড়ে এগারোশো ফুট, সিঁড়ির সংখ্যা সাতশো।

স্বাতি বলল : সীমাচলম পাহাড়ে তো এক হাজার সিঁড়ি।

রঞ্জিতবাবু বললেন : সেখানে বোধহয় শুধুই মন্দির। এখানে মন্দির ছাড়া আর যা আছে, তার তুলনা কোথাও নেই। পাশাপাশি দুটি পর্বতের চূড়া, উঁচুটির উপরে চন্দ্রনাথ ও আর একটিতে বিরূপাক্ষের মন্দির। অনেক দূর থেকে এই মন্দির দুটি দেখা যায়। আবার উপর থেকে দেখা যায় দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ। এক দিকে সন্দীপ দ্বীপ, অন্য দিকে বনরাজিনীলা উপকূলের পর্বতমালাকে পরম রমণীয় করেছে। পাহাড় ও সমুদ্রের এমন অপরূপ মিলন আমি আর কোথাও দেখি নি।

ভদ্রলোকের বর্ণনায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। তাই স্বাতির কথা শুনতে পাই নি। পথের উপরে দাঁড়িয়ে স্বাতি বলেছিল : এইবারে ফেরা যাক।

ফেরার পথে আরও অনেক কথা হল চন্দ্রনাথ ও চট্টগ্রামের সম্বন্ধে। চন্দ্রনাথে ছোট বড় তীর্থ আরও অনেক আছে। স্টেশন থেকে বাজারের পথ ধরে যেতে হয় পাহাড়ের দিকে। পথে ব্যাসকুণ্ড। ব্যাসদেবের জন্য শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ডটি খনন করে দেন। নৈমিষারণ্য থেকে দূত এসে এই কুণ্ডকে সরোবরে পরিণত করেন। এখন এর তীরে ব্যাসেশ্বর শিব ব্যাসদেব ভৈরব ও চণ্ডিকার মন্দির আছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার পথে আরও অনেক তীর্থস্থান। হনুমানের মন্দির, সীতাকুণ্ড, রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড, মন্মথ নদ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বনবাস কালে রাম সীতা এখানে এসেছিলেন। সীতা দেবীর মন্দিরের পিছনে মাঝে মাঝে একটি আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যায়। লোকে এই শিখাকে বলে জ্যোতির্ময়।

চন্দ্রশেখরের পথে ভবানীর মন্দির। মন্দিরে কালী ও দশভুজার মূর্তি। এইটিই চন্দ্রনাথের পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হস্ত পড়েছিল এইখানে। পর্বত চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রশেখর তাঁর ভৈরব। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগে স্বয়ম্ভুনাথ মহাদেবের মন্দির। উত্তরে

নবভৈরব ও দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব। রাম সীতা ও অন্নপূর্ণার মূর্তি মন্দিরের ভিতরে, বাহিরে লক্ষ্মী শিব। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে যে জলের ধারা সারাক্ষণ বইছে, যাত্রীসাধারণের তা বিস্ময় উদ্রেক করছে। এই স্বয়ম্ভুনাথের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনাও প্রচলিত আছে। শম্ভু নামে এক ধোপা এই পাহাড়ের নিকটে বাস করত। তার কপিলা গরুটি রোজ পালিয়ে যেত পাহাড়ে, সারাদিন পরে রাতে ফিরে আসত। একদিন সেই গরুকে অনুসরণ করে শম্ভু দেখল যে গরু দুধ দিচ্ছে একটি পাথরের উপরে। রাতে শম্ভু স্বপ্ন দেখল, আর তার পরের দিন থেকেই স্বয়ম্ভুনাথেব পূজার ব্যবস্থা করল।

এ রকম গল্প আমরা অনেক শুনেছি। ভারতের নানা স্থানে এই রকমের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখানে এর পরে নতুন ধরনের ঘটনা ঘটল। লোকমুখে খবর পেয়ে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য এলেন স্বয়ম্ভুনাথকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে। কিন্তু তাঁকে তুলতে পারলেন না, হাতি লাগিয়েও বিফল হলেন। শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে ত্রিপুরাসুন্দরীকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করলেন উদয়পুরে। যে গল্প রঞ্জিতবাবু আমাদের আগে বলেছিলেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়েও গয়াকুণ্ড আছে, লোকে তাকে পদগয়া বলে। যাত্রীরা পিণ্ড দেয় সেখানে। একটি গুহার মধ্যে আছে শিব-লিঙ্গের মতো অনেক পাথর, অবিরত জল ঝরছে সেখানে। তারই নাম উনকোটি শিব। তারপর দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে বিরূপাক্ষের মন্দির। পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়িয়ে নূতন মন্দির। এখান থেকেও দেখা যায় সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য।

চন্দ্রনাথ এখান থেকে দূর নয়। কিন্তু মন্দির দেখে হতাশ হতে হয়। একটি চতুষ্কোণ গৃহের উপর গম্বুজ, একটি বড় ও ছোট দুটি, বারান্দায় টিনের চালা। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, কোন আকর্ষণ নেই শিল্পনৈপুণ্যের। আকর্ষণ শুধু চন্দ্রশেখর শিবের ও অদূরবর্তী সমুদ্র ও তার সৌন্দর্যের।

চন্দ্রনাথ বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান। মন্দিরের পিছনে এক পাথরে আছে বুদ্ধের পদচিহ্ন। আর তাঁর অঙ্গুলির অস্থি এই শিখরে সমাহিত আছে। চৈত্র মাসে বৌদ্ধ মেলা হয় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দলে দলে বৌদ্ধ যাত্রী তখন বুদ্ধ কূপ নামে একটি কুণ্ডের-মধ্যে মৃত আত্মীয় বন্ধুর অস্থি নিক্ষেপ করতে আসে।

সীতাকুণ্ডের পরের স্টেশন বাড়বা কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলে সারাক্ষণ আগুনের শিখা জ্বলছে. লোকে বলে মহাদেবের তৃতীয় নেত্র এটি। জ্বালামুখীতেও আমরা এমনি কুণ্ড দেখেছি। পীঠস্থান সেটি। সতীর জিহ্বাতীর্থ। সেখানেও আমরা আগুনের শিখা দেখেছি কুণ্ডের জলে ও পর্বত গাত্রে।

এর পরে চট্টগ্রামের কথা।

পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা চট্টল নাম পাই. চট্টল নাম কী করে চট্টগ্রামে পরিণত হল, এই নিয়ে চট্টগ্রামের লোকেই বেশি গবেষণা করেছে। অনেকে বলে যে বাঙলার বর্ধিষ্ণু বন্দর সপ্তগ্রামের অধিবাসীরা এই বন্দরে এসে বসাতি করে। তারা এই বন্দরেরও নাম রেখেছিল সপ্তগ্রাম। এই গ্রামের আদিবাসীরা চট্টভট্ট জাতি নামে পরিচিত ছিল। সপ্তগ্রাম নাম তাই চট্টগ্রামে পরিণত হল অচিরে।

আরাকানী ও মগেরা বলে চাটিগাঁ। চাইতি গাঁও মানে যুদ্ধলব্ধ নগর। চাটি শব্দটিরও একটি সুন্দর অর্থ আছে। একটি প্রদীপের আলোয় যতটুকু স্থান আলোকিত হয়, সেই পরিমাণ জমির নাম চাটি। পীর বদর নামে এক ব্যক্তি রাজার নিকট এক চাটি জমি নিয়ে চেরাগি পাহাড়ে প্রদীপ স্থাপন করেন। অনেকে বলেন যে দৈত্য তাড়াবার জন্য এই প্রদীপ জ্বালাতেন বারো আউলিয়া। এই প্রদীপ থেকেই নাম হয়েছে চাটি গাঁ। আবার বারো আউলিয়ার দেশ বলতেন ফকিরেরা।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম দেখা যায় চাটিগ্রাম। বৌদ্ধ শ্রমণেরা বলতেন রমাবতী। রমাবতী নাম কোথা থেকে এল তা নিয়ে কেউ আলোচনা করে নি। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা নাকি চিৎ-ত-গং বলতেন। এই শব্দটির অর্থ যুদ্ধ জয় করা অন্যায়। পর্তুগীজরা বলত পোর্টো গ্রাণ্ডো বা বড় বন্দর। সপ্তগ্রামকে তারা বলত ছোট বন্দর বা পোর্টো পিকুইনো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমানেরা এসে চট্টগ্রামের নাম পালটে বলত ইসলামাবাদ। কিন্তু ধোপে এ নাম টিকল না। বাঙলায় চট্টগ্রাম বা চাটগাঁ আর ইংরেজীতে চিটাগং নামই আজও চলে আসছে।

সহাস্যে স্বাতি বলল: এই নিয়ে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

রঞ্জিতবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন: এ আমার নিজের কথা নয়, অন্যের লেখায় আমি পড়েছি।

আমি বললুম: চট্টগ্রাম শুনেছি ভারি সুন্দর শহর।

খুশী হয়ে রঞ্জিতবাবু বললেন: ভাবতে তার তুলনা আছে কিনা জানি নে। বম্বে যে সুন্দর শহর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু চট্টগ্রামের সৌন্দর্য অন্য রকম। অফিস আদালত ও আবাসগৃহগুলি সব টিলার উপরে, সেখান থেকে শুধু সমুদ্রের দৃশ্যই সুন্দর নয়, জাহাজ নৌকো ও সাম্পানে পূর্ণ কর্ণফুলী নদীর রূপ আরও অপরূপ। একটি পাহাড়ে আছে চট্টেশ্বরী কালীমন্দির, নবগ্রহের মন্দির সাততলা। বামে মসজিদ ও পীরের দরগাও আছে এই শহরে।

রঞ্জিতবাবু বললেন: মেঘনার মোহনায় সন্দীপ সম্বন্ধে একটি কথা শুনলে বোধহয় আশ্চর্য হবেন। অতীতে এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। আলেকজেন্দ্রিয়ার সুলতান এখান থেকেই জাহাজ তৈরী করাতেন।

বিস্মিত স্বাতি বলল: সত্যি নাকি!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সেই কারখানার চিহ্ন কি এখনও আছে?

রঞ্জিতবাবু বললেন ঃ জানি নে।

আমরা তখন হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলুম। দেখতে পেলুম যে ব্যস্তসমস্ত ভাবে মিস্টার গিরি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম, নমস্কার করে বললুম ঃ কী ব্যাপার!

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন, কোনরকমে হাত দুটো একটু উঁচু করেই বললেন ঃ বাঁচা গেল। ভাবলুম যে সব ফাইনাল করে ফেলবার আগে একবার জিজ্ঞেস করে যাই।

স্বাতি তাঁর ব্যস্ততা দেখে হাসল।

মিস্টার গিরি বললেন ঃ আপনারা তো ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন, তা এখন আপনারা গৌহাটি না কলকাতা যাবেন?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল, বলল ঃ কলকাতা।

যাক, বাঁচালেন আপনি। ভালো করে না জেনে নিয়েই আমি কলকাতার জন্যে একটা কুপে রিজার্ভ করিয়ে বসে আছি।

কুপে!

স্বাতির দু চোখে আমি দুর্ভাবনা দেখলুম।

রঞ্জিতবাবু বললেন ঃ আপনাদের দুজনের জন্যে কুপেই তো ভাল হবে। রাতে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাদের।

এর পরেই স্বাতির দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখলুম। সে হেসে বলল ঃ বাঙ্কের ওপরে উঠবে কে! আমি তো পারব না, হাতভাঙা নিয়ে তুমি উঠতে পারবে তো!

বলে আমার দিকে তাকাল সগৌরবে।

আমি হেসে বললুম ঃ কিছুতেই পারব না।

মিস্টার গিরি বললেন ঃ এই জন্যেই আমি আপনাদের কাছে এসেছিলুম। দেখলেন তো এই অসুবিধার কথা আমার একবারও মনে হয় নি। এখনি বলে দিচ্ছি যে দুখানা লোয়ার বার্থ চাই।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আর আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কবে যাবার ব্যবস্থা করেছেন ?

মিস্টার গিরি বললেন : সে ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। কাল দার্জিলিঙে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সকাল আটটায় তৈরি থাকবেন। লাঞ্চ গ্যাংটকে। পরের দিন গ্যাংটকে ব্রেকফাস্ট, কালিম্পঙে লাঞ্চ, ডিনার শিলিগুড়িতে। ট্রেনে আপনাদের তুলে দিয়ে আমি ফিরে আসব।

আমি বললুম : চমৎকার ব্যবস্থা।

ভদ্রলোক যে খুশী হয়েছেন তা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। রেলের লাইন টপকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠে পড়লেন। রঞ্জিতবাবু বললেন : ভারি উৎসাহী লোক।

তা না হলে কি এমন আনন্দে কেউ ভূতের বোঝা বয়!

হোটেলের দরজার সামনে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। স্বাতি বলল : আপনি কি ফিরবেন এখন ?

রঞ্জিতবাবু এ কথার উত্তর দিলেন না, বললেন : আপনারা ?

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : তোমার বোধহয় বিশ্রামের দরকার।

. রঞ্জিতবাবু এ কথা মেনে নিলেন, বললেন : ঠিক বলেছেন। আপনারা বিশ্রাম করুন এখন। বিকেলবেলায় আবার দেখা হবে।

নিজেদের ঘরে এসে স্বাতি ধপাস করে বিছানার উপর বসে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাসের যেন শব্দ পেলুম। তাই প্রশ্ন করলুম : কী হল ?

স্বাতি বলল : আর কী হল!

আমি হাসলুম তার মুখের দিকে চেয়ে।

স্বাতি রাগ করে বলল : পদে পদে এমন অপদস্থ করার কী মানে বল তো!

অপদস্থ!

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে।

স্বাতি বলল : অপদস্থ নয়! মিস্টার গিরি একটা কুপের ব্যবস্থা করেছেন শুনে কেন কৌতুক বোধ করছিলে! গ্যাংটকে গিয়েও যদি এই রকমের কিছু করেন!

এবারে আমি হেসে উঠলুম সরবে। আর স্বাতি বলল : তুমি একা যাও গ্যাংটক।

কেন, ভয় পাও নাকি আমাকে!

স্বাতি ভয় পায় বলল না, যা বলল তা শুনে আমার রোমাঞ্চ হল। বলল : ভয়ের কথা নয় গোপালদা, এ শ্রদ্ধার কথা। তোমার কাছে তো ছোট হতে পারব না, পারব না তোমার অসম্মান করতে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু স্বাতি নিজেকে সামলে নিল। পরম কৌতুকে বলল : মা বলে দিয়েছেন আমাকে, লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।

আর মেয়েটা?

মেয়েটা ভারি ভাল।

বলে হাসতে হাসতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

১৯

পরদিন ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম যে আমাদের দু ঘরেব মাঝের দরজাটি খোলা, আর আলো জ্বলছে স্বাতির ঘরে। আমি উঠে বসলুম, কিন্তু পর্দা সরিয়ে স্বাতির ঘরে যেতে পারলুম না। মন চাইল না, না পা উঠল না, তা জানি নে। মনে হল যে এক অদ্ভুত ভয়ে আমার দেহ আড়ষ্ট হয়ে বইল। কিন্তু ভয় কেন, কিসের ভয় আমার, তা ভেবে পেলুম না।

শৈশবের কথা আমার মনে পড়ল। তখন আমার বয়স কম, পড়াশুনো আরম্ভ করি নি। স্নান সেরে বাবা পূজোয় বসবেন, তাই মা সাজিয়ে রেখে গেলেন ফুল নৈবেদ্য আর ভোগ। দরজায় দাঁড়িয়ে আমার চোখ পড়ল কলা আর বাতাসাব উপরে। চকচক করে উঠল দু চোখের দৃষ্টি, কিন্তু দরজার চৌকাঠ কিছুতেই পেরতে পারলুম না। পূজার নৈবেদ্যে হাত দেওয়া যায় না, প্রসাদ পাওয়া যায় পূজার পরে। এ তো ভয় নয়, এ ভক্তি। দেবতাকে ভালবাসি বলেই তো সম্মান করি। লোভের হাত বাড়িয়ে প্রিয় জিনিসকে অশুচি করা যায় না।

সহসা স্বাতিব কথা শুনে চমকে উঠলুম। সে বলল: অমন শূন্যদৃষ্টিতে কী দেখছ?

ঘর আমার অন্ধকার ছিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের উপরে পড়েছিল এক ফালি আলো। সেই আলোতে স্বাতি আমার চমকানিও দেখতে পেল। হেসে বলল: ভয় পেলে নাকি?

তখন আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। হেসে বললুম: ভয় নয়, ভক্তি।

স্বাতি আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম: মনে মনে আমি তোমার রূপ দেখছিলুম।

স্বাতি বলল : তামাসা ছেড়ে এবারে তৈরি হয়ে নাও। আটটায় আমাদের বেরতে হবে।

আমি আর দেরি করি নি। মুখ হাত ধোবার জন্যে চলে গেলুম স্নানের ঘরে। ফিরে এসে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জিনিসপত্র গুছিয়ে বিছানা বেঁধে স্বাতি আমার অপেক্ষা করছে। আমি বললুম : একি, আমার জন্যে অপেক্ষা করলে না কেন?

তুমি পারতে এ কাজ?

সত্যিই পারতুম না।

স্বাতি আমাকে গরম জামা পরিয়ে দিল। চাদর জড়িয়ে ঢেকে দিল দেহ। তারপরে ঘড়ি দেখে বলল : সময়মতোই আমরা তৈরি হতে পেরেছি। আজ আমরা ঘরে বসেই চা খাব।

আটটার মিনিট দশেক আগেই মিস্টার গিরি এসে উপস্থিত হলেন। খাবার ঘরে আমাদের দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়েছিলেন, হুড়মুড় করে উঠে এলেন উপরে। তারপরে খুশী হলেন আমাদের তৈরি দেখে। বললেন : রেডি?

চলুন।

বলে স্বাতি উঠে দাঁড়াল।

মিস্টার গিরি বাহিরে বেরিয়ে হাঁকডাক করতেই বেয়ারারা ছুটে এল। তাঁরই আদেশে আমাদের মালপত্র নিয়ে গিয়ে ল্যাণ্ডরোভারে তুলল। ল্যাণ্ডরোভার জীপের মতো গাড়ি, কিন্তু আকারে কিছু বড়। সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজন ও পিছনে মুখোমুখি চারজন যাত্রী বসতে পারে। ডালা খুলে দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ মাল বহনও সম্ভব। দার্জিলিঙ অঞ্চলে এই গাড়িগুলিই ট্যাক্সি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের পৌঁছতে এসেছিলেন। স্বাতি একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল : বিল মেটানো তো হল না।

মিস্টার গিরি কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমার দিকে

তাকাতেই আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন: সে ভাবনা তো আপনাদের নয়। কোম্পানীর কাজে আপনি জখম হয়েছেন, আপনার সব ব্যয় এখন কোম্পানীই বহন করবে।

স্বাতি বলল: কিন্তু আমার ব্যয় কেন বহন করবে!

এইবারে হো হো করে হাসলেন মিস্টার গিরি, বললেন: ঠিক বলেছেন। এখন থেকে সংসারে আপনার হিসেবটাও আলাদা করে রাখবেন। সামনে উঠে পড়ুন দুজনে।

বলে আমাদের ঠেলে দিলেন সামনের দিকে।

আমি বললুম: আপনি কি পিছনে বসবেন? তাহলে আমরাও বসব পিছনে।

ভদ্রলোক বললেন: বেশ, আমিই তাহলে গাড়ি চালাই।

কিন্তু পরক্ষণেই বললেন: না, গাড়ির দিকে মন থাকলে গল্প করতে অসুবিধা হবে। আপনারা সামনে বসুন। আমি আপনাদের কাছেই বসব।

বলে আমাকে মাঝখানে দিয়ে স্বাতিকে ধারে বসতে দিলেন। আর নিজে বসলেন ড্রাইভারের পিছনে। বললেন: দেখুন তো এবারে। মুখোমুখি গল্প করা যায় কিনা।

আমি স্বীকার করলুম: যায়।

তারপরে বিদায় নিলেন সবার কাছে।

গাড়িতে উঠবার আগে হোটেলের বেয়ারাদের হাতে স্বাতি কিছু গুঁজে দিয়েছিল। প্রসন্ন মুখে তারা নমস্কার করল। হোটেলের ম্যানেজার বললেন: আবার আসবেন।

চলতি গাড়ি থেকে স্বাতি বলল: অন্য যাত্রায়।

দার্জিলিঙের কার্ট রোড এখন ভিজে মনে হচ্ছে। শিশির পড়েছে, না রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। হাল্কা কুয়াশায় দূরের পাহাড় ও গাছপালা এখনও আবৃত, রোদ না উঠলে

কুয়াশা কাটবে না। মিস্টার গিরি প্রথমে কথা কইলেন, দার্জিলিঙ শহরের ঘরবাড়ি সব পেরিয়ে এসেই বললেন: আজকের সকালটি বেশ মিষ্টি, তাই না?

স্বাতি বলল: নতুন দেশ দেখতে যাচ্ছি বলেই আরও ভাল লাগছে।

সত্যিই সিকিম একটি নতুন দেশ। মণিপুর ত্রিপুরার মতো রাজাহীন রাজ্য নয়। সিকিমে রাজা আছেন, ভারতের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ়। প্রতিবেশী ভুটান রাজ্যের সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ দুটি রাজ্য ভারতের সঙ্গেই সংযুক্ত। কিন্তু নেপাল স্বাধীন দেশ, সিংহলের মতো, ব্রহ্মদেশের মতো। যাতায়াতের নানা বিধি-নিষেধ আছে, কিন্তু কড়াকড়ি নেই। সিকিমে কিছুই নেই।

মিস্টার গিরি বললেন: ভালো লাগার তো এই শুরু। সন্দকফু ও ফালুট নিয়ে গেলে বোধহয় আপনারা আরও বেশী আনন্দ পেতেন।

এ নাম দুটি আমাদের জানা ছিল না। তাই বললুম: সে জায়গা আবার কোথায়?

দার্জিলিঙের কাছেই।

তারপরে শোনালেন সেখানে যাবার কথা।—

বাতাসিয়া লুপ আমরা ছাড়িয়ে এসেছি। প্রথমে পাব ঘুমের গোম্ফা যাবার রাস্তা, ডান হাতে বেরিয়েছে। তারপরে ঘুম রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের পাশ দিয়ে আরও একটি রাস্তা বেরিয়েছে ডান হাতে। তার নাম সুকিয়া রোড। এটি দার্জিলিঙ অঞ্চলের একটি প্রধান পথ। সুকিয়া পোখরি টঙলু সন্দকফু ও ফালুট যেতে হয় এই পথে। কন্যাকুমারীতে যেমন তিন সমুদ্রের মিলন, ফালুটে তেমনি তিন দেশের মিলন। পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভারত, আর সিকিম হল উত্তরে।

স্বাতি বলল : ভারি চমৎকার জায়গা তো।

মিস্টার গিরি অমনি বললেন : সেই জন্যেই তো বললাম, চলুন একদিন ঘুরে আসি। ও জায়গা না দেখে গেলে আবার আপনাদের আসতে হবে।

আমি বললুম : আপানার জন্যেই আমরা বারে বারে আসব।

মিস্টার গিরি লজ্জা পেলেন, বললেন : আপনাদের যে রকম কষ্ট দিচ্ছি, ভয়ে বোধহয় আর কখনও আসবেন না।

স্বাতি বলল : আপনি ফালুটের গল্প বলুন। এমনি করে মোটরে যাওয়া যায় না ?

মিস্টার গিরি বললেন : এইবারে বিপদে ফেললেন। সন্দকফু পর্যন্ত মোটর যাতায়াত করে। মনিভঞ্জন হল নেপাল সীমান্তে, সেখান থেকে একদিনেই ঘুরে আসা যায়। এমন কি টঙ্গলুও যাতায়াত করা যায় এক দিনে। কিন্তু সন্দকফু গেলে একরাত সেখানে থাকতে হয়। যাতায়াতে ট্যাক্সি ভাড়া বোধহয় দুশো টাকার কম লাগে। সন্দকফু কথাটার মানে জানেন তো! বিষাক্ত গাছের পাহাড়। এই পাহাড়ে নাকি সেঁকো বিষের গাছ জন্মায়। আর ফালুট বা ফাকলুটের মানে খোলা ছাড়ানো পাহাড়। বৃক্ষলতাহীন শুকনো পাহাড় বলে নাম ফালুট।

স্বাতি বলল : আপনি বুঝি ফালুট যান নি ?

অনেক দিন আগে গিয়েছি, আর পায়ে হাঁটা পথে গিয়েছি দল বেঁধে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে যে সঙ্গী পেলে আবার একবার যাই।

আমি বললুম : এর পরের বারে আপনার সঙ্গী হয়ে যাব।

স্বাতি বলল : আমাকে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

মিস্টার গিরি বললেন : আমরা বেরিয়েছিলুম বৈশাখ মাসে। ট্রেকিঙের জন্যে এপ্রিল আর মে মাসই সবচেয়ে প্রশস্ত। অক্টোবর থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বেরোনো চলে, কিন্তু নভেম্বরের পরে

শীতে বেশ কাবু করে। যাঁরা ফুলপাতা ভালবাসেন কিংবা পতঙ্গ ও প্রজাপতি, দার্জিলিঙ অঞ্চল তাঁদের কাছে স্বর্গের মতো। চোখ জুড়োবে, আশ মিটবে। ঝুলি ভরে যাবে তাঁদের। এ সব শখ আমার ছিল না, কিন্তু আমিও যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। অরণ্যময় পাহাড় দেখেছি, আর তুষারাবৃত পাহাড়। তার উপরে আলোছায়ার খেলা। কখনও মেঘ, কখনও রৌদ্র। বাতাসে ফুলের সৌরভ। আমি নিতান্তই বেরসিক ছিলাম। তাই কবিতা লিখি নি, ছবিও আঁকি নি কোনও।

স্বাতি বলল: আপনার সঙ্গীরা?

অজস্র ছবি তুলেছেন ক্যামেরায়।

তারপরে বললেন: যদি যেতে চান, তাহলে আমাকে আগেভাগে জানাবেন। ব্যবস্থা করতে বেশ সময় লাগে।

ব্যবস্থা আবার কিসের?

আমরাও সব জানতাম না বলে অসুবিধা হয়েছিল প্রচুর। ডাকবাংলো রিজার্ভ করতে হয় সময় মতো, নেপাল বা সিকিমের জন্যে পারমিট নিতে হয় দরকার হলে। তারপর খাদ্যদ্রব্য দরকারী জিনিসপত্র কুলির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ সব তু একদিনের কাজ নয়। হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লে অসুবিধায় আপনাদের পড়তেই হবে।

তারপবে বললেন: নেপাল সীমান্তের মনিভঞ্জন পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম মোটর গাড়িতে। সেখান থেকে টঙ্গলুর ডাকবাংলো ন মাইল পথ ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়। সমুদ্র সমতল থেকে দশ হাজার সাড়ে সাতশো ফুট। দিনের শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকবাংলোয় পৌঁছে দেখলাম হিমালয় আর দার্জিলিঙ শহর। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, সিকিমের পাহাড়ও দেখা যায় টঙ্গলু থেকে। অন্ধকার নামবার পর যখন একটা একটা করে দার্জিলিঙের বাতি জ্বলতে লাগল, তখন মনে হল যেন জোনাকির হাট বসেছে দূরের

পাহাড়ে। নিজের চোখে না দেখলে এমন রূপ বুঝি কল্পনাও করা যায় না।

স্বাতি বলল: সিকিমের পাহাড়ে আমবা এই দৃশ্য দেখেছি-- প্রস্‌পেক্ট হিল থেকে সিমলা শহরের বাতি।

আমি বললুম: সে তো খুব কাছের দৃশ্য। দূরের বাতি ঠিক জোনাকির মতোই মনে হবে।

কখন আমরা ঘুম রেল স্টেশন পেরিয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই বুঝতে পারলুম যে শিলিগুড়ির পথ ছেড়ে আমরা গ্যাংটকের পথ ধরেছি। শুধু গ্যাংটক নয়, কালিম্পঙেরও পথ এটি। তিস্তানদীর পুলের কাছে শিলিগুড়ি-কালিম্পঙ পথের সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু মিস্টার গিরি এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না, তিনি তাঁর পুরনো প্রসঙ্গেই পড়ে রইলেন। বললেন: টংলু থেকে সন্দকফু মাত্র চৌদ্দ মাইল পথ। সেখানে যদি পরিষ্কার দিনে পৌঁছতে পারেন তাহলে আর ফালুট যেতে বলব না। ফালুট আরও সাড়ে বারো মাইল দূরে, কিন্তু দৃশ্য প্রায় একই রকম। কাঞ্চনজঙ্ঘার আরও কাছে পৌঁছে আরও অন্তরঙ্গভাবে দেখবেন হিমালয়কে। এ দুটো জায়গাই প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দার্জিলিঙ থেকে দূরত্ব কত?

ফালুটের? তা মাইল পঞ্চাশেক হবে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও কাছে। ত্রিশ মাইলেরও কম মনে হয়।

একটু থেমে বললেন: টাইগার হিল থেকে মাউণ্ট এভারেস্ট ভাল দেখতে পান নি তো, সন্দকফু থেকে অনেক ভাল দেখতে পাবেন। পাশাপাশি তিনটি শিখর। সামনের বড় শিখরটি এভারেস্ট নয়, মাঝেরটি এভারেস্ট। সেটি পিছনে বলে আকারে ছোট ও নিচু দেখায়। ছবি দেখেছেন তো?

আমি বললুম: দেখেছি।

কই, আমি দেখি নি তো!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : আমি তোমার গাইড বইএ দেখেছি। তোমাকে দেখিয়ে দেব।

মিস্টাব গিরি বললেন : আমরা দার্জিলিঙে ফিরেছিলুম অন্য পথে। ফাল্ট থেকে সাত মাইল দূবে রম্মন আর খেলা নদী, উৎরাই পথে নেমে আসতে হয। নদী পেরিয়ে দু মাইল দূবে রম্মন বাংলো। বিমবিক বাংলো বাবো মাইল দূরে, একটি চৌদ্দ গোম্ফা আছে সেখানে। তারপবে ঝেপি বাংলো এগার মাইল দূরে। সেখান থেকে দার্জিলিঙ এক দিনেব পথ। রঙ্গিত নদী পেরিয়ে আট মাইল এমন কঠিন চড়াই যে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। পুলবাজার হয়ে আমরা দার্জিলিঙ ফিরেছিলাম। আগে জানা থাকলে একটা গাড়িতে চেপে শেষ চাব মাইল আসতে পাবতাম। তাতে কষ্ট অনেক কম হত।

আমি জিজ্ঞাসা কবলুম : এই যাতায়াতে কত দিন সময় লাগে?

মিস্টার গিরি বললেন : আট নয় দিন। সময়ের অভাব থাকলে আজকাল গাড়িতেই সন্দকফু ঘুরে আসা উচিত। তাতে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার চেয়ে সন্দকফুর সূর্যোদয় দেখে অনেক বেশি আনন্দ পাবেন।

স্বাতি বলল : এ কথা আমাদের আগে বলেন নি কেন?

দুঃখিত ভাবে মিস্টার গিবি বললেন : সব কথা বলবার সময় পেলাম কই!

আমি বললুম : সত্যি কথা। দোষটা আমাদেরই।

না না, দোষের কথা বলবেন না। দোষ যদি হয়ে থাকে তো সে আমারই। কিন্তু এখনও তো সময় আছে। গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ি না গিয়ে দার্জিলিঙেই আবার ফিরে আসতে পারি।

কিন্তু আপনার বোধহয় টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

পরম উৎসাহে মিস্টার গিরি বললেন : তার জন্যে ভাবনা কী! টিকিট ফেরত দিলেই হল।

আমি তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললুম, আর লজ্জিত হলেন মিস্টার গিরি। কিন্তু স্বাতি তাঁকে নীরবে থাকতে দিল না, বলল : দার্জিলিঙ থেকে আর কোথায় যাওয়া যায় বলবেন না?

মিস্টার গিরি বললেন : যাওয়া যায় আর একটি সুন্দর জায়গায়, কিন্তু আমরা সেখানে যাই নি। ফালুট থেকে পামিয়ঙ্গি, ন দিনে ফেরা যায় দার্জিলিঙ।

পামিয়ঙ্গির কথাও মিস্টার গিরি আমাদের বললেন। সিকিম রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ গোম্ফাটি আছে সেখানে। যেমন পথের শোভা, তেমনি কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য। ফালুট থেকে সিঙ্গলিলা পাহাড়ের উপর দিয়ে ডেনটাম হয়ে আসতে হয়, আর ফেরার পথ রিমবেনপঙ চাকুঙ ও বাদামতাম হয়ে। অনেকে চাকুঙ থেকে ডবলমার্চ করে দার্জিলিঙ চলে আসেন এক দিনে। কুড়ি মাইল পথ সিঙ্গলা বার্ণস্‌বেগ ও টাক্‌ভার চা বাগানের ভিতর দিয়ে।

মিস্টার গিরি বললেন : গ্যাংটক থেকেও সিকিমের মানুষ পামিয়ঙ্গি গোম্ফা দেখতে আসে। শুধু তীর্থস্থান বলে নয়, সৌন্দর্যের টানেও আসেন অনেকে।

আমার এক সিকিমবাসী পেন ফ্রেণ্ডের কথা মনে পড়ল। তিনিও পায়ে হেঁটে ঐ গোম্ফাটি দেখে এসে আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি ভুটানেও একবার গিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসেন। ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। আমি বললুম : আমার বন্ধুর একবার খোঁজ করব। যদি দেখা পাই, তাহলে সিকিমের সব কথা জেনে নেব তাঁরই কাছ থেকে।

স্বাতি বলল : কে তোমার বন্ধু?

বললুম : নাম বলব না। নাম বলে অনেককে আমি বিপদে ফেলেছি।

আশ্চর্য হয়ে মিস্টার গিরি বললেন : বিপদ কিসের ?

আমি হেসে বললুম : সে কথা পরে বুঝতে পারবেন।

ঘুম শহর আমরা অনেকক্ষণ আগে ছাড়িয়ে এসেছি। আমাদের গাড়ি তখন নিচের দিকে নামছে। তিস্তানদীর তীর পর্যন্ত ক্রমাগত নামবে।

যে পথ ধরে আমরা চলেছি তার নাম পেশক রোড। পেশক একটি সুবৃহৎ চা বাগানের নাম। ঘুম থেকে বারো মাইল দূরে লপচু চায়ের বাগান, তার উচ্চতা পাঁচ হাজাব তিনশো ফুট। আরও চার মাইল এগিয়ে পেশক, কিন্তু তার উচ্চতা মাত্র দু হাজার ছশো ফুট। তিস্তার পুল সেখান থেকে তিন মাইল। সমুদ্র সমতল থেকে তার উচ্চতা সাতশো দশ ফুট। দার্জিলিঙের পাহাড় তিস্তার এক পারে শেষ হয়ে গিয়ে ওপার থেকে কালিম্পঙের পাহাড় শুরু হয়েছে। কালিম্পঙের উচ্চতা চার হাজার একশো ফুট।

মিস্টার গিরি আমাদের এই সব খবর দিচ্ছিলেন। স্বাতি প্রশ্ন করল: আর গ্যাংটকের?

পাঁচ হাজার আটশো। তিস্তার পুল পেরিয়ে আটত্রিশ মাইল পথ উত্তরে যেতে হয়।

আমি আবার পায়ে-হাঁটা পথের কথা তুললুম: পায়ে হাঁটার পথ নিশ্চয়ই সংক্ষেপ!

নিশ্চয়ই।

বলে মিস্টার গিরি থামলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন: আমি তিনটি পথের কথা জানি। একটি পামিয়ঞ্জি থেকে বেওজির টেমি সাঙ্ হয়ে গ্যাংটক। দ্বিতীয় পথ দার্জিলিঙ থেকে মাঞ্জিটারের ঝুলন্ত পুলের উপর দিয়ে নাম্‌চি হয়ে টেমিতে মিলেছে। তৃতীয় পথ এই রাস্তার উপরে লপচু চা-বাগান থেকে রাঙ্গপো পৌঁছেছে মেল্লির উপর দিয়ে, আবার রাঙ্গপো থেকে গ্যাংটকে গেছে পেকিয়ঙ্গ হয়ে। রাঙ্গপোর উপর দিয়ে আমরাও যাব। সিকিম এলাকা শুরু হবে রাঙ্গপো নদীর পরপার থেকে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এখন কি আমরা বাঙলা দেশে আছি?

মিস্টার গিরি বললেন: নিশ্চয়ই। এ পাহাড় দার্জিলিঙ জেলার। কয়েক মাইল উত্তর দিয়ে বইছে গ্রেট রঙ্গিত নদী। নদীর দক্ষিণে বাঙলাদেশ, উত্তরে সিকিম।

আমি বললুম: গোলমাল হয়ে গেল। একবার বললেন রঙ্গিত নদী, আর একবার বললেন রাঙ্গপো নদী সিকিমের সীমানায়। হয়তো দুটোই ঠিক। কিন্তু বুঝিয়ে না বললে বুঝব না।

তাহলে একেবারে পশ্চিম থেকেই ধরুন। ফালুটের উত্তরে সিঙ্গলিলা, সেখান দিয়ে বইছে রুম্মম নদী পশ্চিম থেকে পূর্বে। এই নদী গ্রেট রঙ্গিতে এসে মিলেছে। পূর্ববাহী গ্রেট রঙ্গিত তিস্তার সঙ্গে মিলে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। সিকিমের রাঙ্গপো নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে দক্ষিণবাহী তিস্তার সঙ্গে মিলেছে অনেকটা উত্তরে। এইবারে বুঝবার চেষ্টা করুন। সিকিম ও বাঙলার সীমানায় প্রবাহিত হচ্ছে রুম্মম গ্রেট রঙ্গিত তিস্তা ও রাঙ্গপো নদী।

তারপরে ড্রাইভারকে বললেন: ভিউ পয়েণ্টে দাঁড়াবে।

সে আবার কোন্ জায়গা?

মিস্টার গিরি বললেন: রঙ্গিত ও তিস্তা নদীর সঙ্গম দেখতে পাবেন। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে দু রঙের জল দেখেছেন তো, এখানেও তাই দেখবেন। আরও স্পষ্ট, আরও সুন্দর। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুটি নদীর মিলন দেখবেন নিচে।

স্বাতি বলল: অপরূপ দৃশ্য।

আমি হেসে বললুম: তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?

উত্তর দিলেন মিস্টার গিরি, বললেন: কল্পনায় সব দেখা যায়।

আমাদের গাড়ি তখন গড়গড় করে গড়িয়ে নিচে নামছে। উনিশ মাইল পথে প্রায় সাত হাজার ফুট নিচে নামবে। দুধারে চাবাগান ও বনজঙ্গল। বুনো জানোয়ারও আছে এই সব জঙ্গলে।

স্বাতি বলল: সত্যি নাকি!

মিস্টার গিরি এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন : আপনি কি বাঘের কথায় ভয় পান ?

স্বাতি বলল : বাঘের কথায় ভয় পাব কেন ?

তাহলে আপনাকে একজন মহারাণীর গল্প বলি। তিনি এই পথে যাবার সময় গল্প বলছিলেন যে বাঘ দেখলেও তিনি ভয় পান না। অনেকবার শিকারে গেছেন, হাতীর পিঠে থেকে বাঘ দেখেছেন অনেক, বন্দুক চালাতেও জানেন। বেলা তখন পড়ে এসেছিল, স্থানে স্থানে অন্ধকারও জমে উঠেছিল। এমনি সময় হালুম করে একটা বাঘ লাফিয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে। সরু পথ, সামনে যাবার উপায় নেই, পিছনেও যাওয়া যায় না। গাড়ির হেড লাইট জ্বেলে ড্রাইভার হর্ন বাজাল গোঁ গোঁ করে। শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে বাঘটাই পালিয়ে গেল।

স্বাতি বলল : এ আপনার সত্যি গল্প ?

মিস্টার গিরি বললেন : গল্প তো শেষ হয় নি। গল্প শেষ হবে দার্জিলিঙে পৌঁছবার পরে। মহারাণী গ্যাংটক থেকে দার্জিলিঙে ফিরছিলেন, ঘুমের কাছাকাছি এসে বাঘ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু দার্জিলিঙে পৌঁছবার পরও তিনি গাড়ি থেকে নামছিলেন না। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মহারাণী অচল। এ. ডি. সি. কম্পানিয়ানেরা অন্য গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এলেন মহারাণীকে নামাতে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মহারাণীর হার্ট ফেল করল নাকি!

মিস্টার গিরি বললেন : উঁহু, মূর্ছা গিয়েছিলেন মহারাণী। অনেক সেবা শুশ্রূষা করে তাঁর জ্ঞান হয়েছিল।

খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাতি, বলল : আপনিও আমাকে মহারাণী ভাবছেন নাকি ?

স্বাতির প্রশ্ন শুনে মিস্টার গিরিও হাসলেন।

এক সময় তিনি আমাদের একটি পথ দেখিয়ে দিলেন।

বললেন : এই পথ ধরে মংপুতে যাওয়া যায়। মংপুতে সিনকোনার চাষ জানেন তো ?

স্বাতি বলল : রবীন্দ্রনাথ এসে মংপুতে থাকতেন জানি।

মিস্টার গিরি বললেন : সেই মংপু। কিন্তু এ পথে বেশি লোক যায় না। শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ লাইনের সোনাদা স্টেশন থেকেও পৌঁছনো যায়। পথ এগারো মাইল। কিন্তু মংপুর প্রধান পথ হল শিলিগুড়ি-কালিম্পঙ রাস্তার পঁচিশ মাইলে রিয়াং থেকে। রিয়াঙের তিন-চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রিয়াং নদীর উত্তরে মংপু শহর।

সিনকোনা আমাদের দেশে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে। আণ্ডিজ পাহাড় এর জন্মস্থান। লোকে বলত, পেরুভিয়ান বার্ক, পেরু দেশের গাছের ছাল। রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় কিনা শব্দের মানে গাছের ছাল, কিনা থেকেই বোধহয় কুইনাইন এসেছে। কিন্তু সিনকোনা শব্দটি এসেছে কাউন্টেস চিনচন নাম থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই কাউন্টেস ছিলেন স্পেনের রাজপ্রতিনিধির পত্নী। জ্বরে তিনি ভুগছিলেন। এই গাছের ছাল ব্যবহার করে তিনি আরোগ্য লাভ করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর নামেই নাম হয়েছে সিনকোনা।

একশো বছর আগে দার্জিলিঙ পাহাড়ে সিনকোনার চাষ আরম্ভ হয়। প্রথমে নীলগিরি পাহাড়ে চাষ হয়েছিল, তারপর সিঞ্চল পাহাড় ও রেবঙে। এখন মংপুতে হচ্ছে। সিনকোনা গাছের ছাল গুঁড়ো করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কুইনাইন তৈরি হয়। এই কুইনাইন এক সময় ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত বাঙলাকে রক্ষা করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

চায়ের বাগানগুলো পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভেবেছিলুম যে গাড়ি বিকল হয়েছে, কিংবা ড্রাইভার দাঁড়িয়েছে কোন প্রয়োজনীয় কাজে। কিন্তু তারপরেই

ভুল বুঝতে পারলুম। শুধু ড্রাইভার নয়, মিস্টার গিরিও নামছিলেন। আমাদেরও নামতে বললেন।

তাঁর কথামতো আমরাও নেমে পড়লুম। একধারে পাহাড়, অন্যধারে খাদ। পথের বাঁ ধারে একটুখানি বিশ্রামের জায়গা। মিস্টার গিরি সেই দিকেই এগিয়ে গেলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে সেইখানে উপস্থিত হলুম।

নিচের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখতে পেলুম তার তুলনা নেই। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে আসছে একটি নদী। আর একটি নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে আসছে। একটির জল সবুজ, আর অন্যটির সাদা স্বচ্ছ টলটলে জল। চোখের সামনেই দুই নদীর মিলন দেখতে পাচ্ছি, তাদের মিলিত ধারা দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। সহসা আমাদের মুখে কোন কথা যোগাল না।

মিস্টার গিরি জিজ্ঞাসা করলেন: কেমন দেখছেন?

উত্তর দিল স্বাতি, বলল: অপরূপ।

চেনেন এই নদী দুটি?

আমি বললুম: আপনার কাছেই নাম শুনেছি রঙ্গিত আর তিস্তা। পূর্ব দিক থেকে রঙ্গিত এসে দক্ষিণবাহী তিস্তার সঙ্গে মিলেছে।

ঠিক বলেছেন। এদের জলের রঙের তফাত লক্ষ্য করেছেন? সঙ্গমের পরেও তাদের রঙ বদলায় নি।

দেখলুম, সত্যিই তাই। অনেক দূর পর্যন্ত তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে।

মিস্টার গিরি বললেন: জলে হাত দিতে পারলে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারতেন। রঙ্গিতের চেয়ে তিস্তার জল অনেক বেশি শীতল।

স্বাতি আশ্চর্য হল। তাই দেখে মিস্টার গিরি বললেন: আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রঙ্গিতের জন্ম হয়েছে নিম্নহিমালয়ে, বৃষ্টির

জলে তার পুষ্টি। আর তিস্তা বরফ গলা জল আনছে তুষারাবৃত হিমালয়ের হিমবাহ থেকে।

অনেকক্ষণ ধরে আমরা এই দৃশ্য দেখলুম। তারপরে মিস্টার গিরি বললেনঃ আসুন।

গাড়িতে উঠে আবার আমরা যাত্রা কবলুম। গড়গড় করে আমাদেব গাড়ি তিস্তার বাজারে নেমে এল। এই ভিউ পয়েণ্ট থেকে তিস্তার পুল তিন মাইল দূরে। লোকজন দোকান পাটে নদীর এপারটায় ব্যস্ততা আছে। শিলিগুড়ির বাস যাতায়াত করে কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। এই সব বাস এখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। যাত্রীরা চা জলখাবার খায়। তিস্তার পুলের ওপর উঠে চারিদিকের শোভা দেখে। দার্জিলিঙ থেকেও নানারকমের গাড়ি যাতায়াত করে। পুরো গাড়ি ভাড়া নেবার দরকার নেই। কালিম্পঙ যাবার ভাড়া মাথাপিছু ছ টাকা আর আট টাকা। গ্যাংটকের ভাড়া দশ আর বারো টাকা। সামনের সীটের জন্যে ভাড়া বেশি দিতে হয়। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পঙের ভাড়া কম। বাসে মাথাপিছু সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হয়। তিনজন বসবার উপযোগী গাড়ি পঁয়ষট্টি টাকায় যাতায়াত করে। একদিকের ভাড়া চল্লিশ টাকা। দার্জিলিঙ থেকে ল্যাণ্ডরোভারে একদিকের ভাড়াই আশি টাকা, ছোট গাড়ির ষাট টাকা ভাড়া। একশো কুড়ি টাকা দিলে একটা ছোট গাড়ি দার্জিলিঙ থেকে গ্যাংটক ঘুরিয়ে আনে, এক রাত থাকতে হয় গ্যাংটকে।

তিস্তার পুলের নাম অ্যাণ্ডারসন ব্রিজ, কোনও থাম নেই নদীর মাঝখানে। নদী এখানে প্রশস্ত নয়। দুধারের জমির উপরে দুটি থামের উপরে একটি বিরাট খিলান, তারই উপরে পুল। পুলটা দুধারে বাড়িয়ে রাস্তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

মিস্টার গিরি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখানে একটু চা খাবেন?

স্বাতি বললঃ না।

আমি বললুম : আপনি খেলে আমরাও খাব।

মিস্টার গিরি বললেন : চা খেয়েই তো বেরিয়েছি। রাঙ্গপোয় চা বেশি ভাল লাগবে।

আমি বললুম : তাহলে সেখানেই আমরা চা খাব।

আমাদের ড্রাইভার তাই আর চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল না, পুলের দিকে এগিয়ে গেল।

মিস্টার গিরি বললেন : পুলের উপরে কি একটু হেঁটে বেড়াবেন?

স্বাতি বলল : গাড়ি থেকে নামবার ইচ্ছা আর নেই। আস্তে আস্তে এগোলেই সব দেখতে পাব।

মিস্টার গিরি বললেন : সেই ভাল। গ্যাংটকে তাহলে সময় মতোই পৌঁছতে পারব।

লোহার পুল নয়, শহরের রাজপথের মতো বাঁধানো ও প্রশস্ত। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে গিয়ে ওপারে পৌঁছলুম। এ ধারে দোকান পাট নেই, লোকজন নেই, নির্জন পাহাড় আছে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। কালিম্পঙের পথে আমরা এগোলুম না, আমরা বাঁ হাতে গ্যাংটকের পথ ধরলুম। তিস্তার তীরে তীরে এই পথ সোজা উত্তরে গেছে। বড় সুন্দর রাস্তা, পরিবেশ আরও সুন্দর। নিঃশব্দে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে ইচ্ছা করে।

তিস্তার পুল থেকে রাঙ্গপোর দূরত্ব চোদ্দ মাইল। পূর্ব দিক থেকে রাঙ্গপো নদী এসে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে। রাঙ্গপোর উপরে লোহার পুল। বাঙলা ও সিকিমের সীমানা। এপারে বাঙলা, ওপারে সিকিম। সকল যানবাহন ও যাত্রীকে এপারেই থামতে হবে। আমাদের ও সিকিম রাজ্যের পুলিশ সব খানাতল্লাসী করবে। তার জন্যে আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিলুম। পুলিশের লোক এগিয়ে এসে আমাদের ড্রাইভারকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল। তার উত্তরে সে বলল : ইণ্ডিয়ান টুরিস্ট।

বাস, তাতেই কাজ হয়ে গেল। আর কোন পরিচয়-পত্র বা পারমিটের দরকার নেই, প্রয়োজন নেই খানাতল্লাসীর। নিশ্চিন্ত হলুম আমরা। নিকটের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলুম গলাটা ভেজাবার জন্যে। দোকানে জল মিষ্টিও পাওয়া যায়। চায়ের সঙ্গে আমরা মিষ্টি খেলুম। মিস্টার গিরিকে পয়সা দিতে দিল না স্বাতি। বলল: এ তো দার্জিলিঙ নয়, এখন আপনি আমাদের অতিথি।

সংকীর্ণ পুল আমরা সাবধানে অতিক্রম করলুম। তারপর আশ্চর্য হলুম ওপারের ব্যবস্থা দেখে। ফুলপাতা দিয়ে ফটক সাজানো হয়েছে, আর উর্দিপরা পুলিস দাঁড়িয়ে আছে কোন মাননীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কে আসছেন জানি নে, ভুল করে আমাদেরও একটা নমস্কার জানাল তারা।

রাঙ্গপো নদীর তীর ধরে রেনক নামে একটি ছোট শহরে যাওয়া যায়। কালিম্পঙ থেকেও সিকিমের এই শহরটিতে আসা যায়।

আমরা তিস্তার তীর ধরে উত্তরে এগিয়ে গেলুম। মিস্টার গিরি সাংখোলা নামে একটা জায়গা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এই নামের একটি নদীও আছে। এই নদীর বন্যার কথা বললেন মিস্টার গিরি। আর সাংখোলার পাওয়ার হাউসটিও দেখিয়ে দিলেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা তিস্তাকে পরিত্যাগ করে রঙ্গিনি নদীর তীর ধরে এগোলুম। এ নদী রঙ্গিনীর মতো উপলে উপলে নৃত্য করে নিচে নামছে। গ্যাংটকের কাছাকাছি এসে এ নদীকে পরিত্যাগ করলুম। বেলা তখন বারোটা বেজেছে, মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে। তবু ভাল লাগছে এগোতে।

বাঙলার সঙ্গে সিকিমের প্রভেদ এখনও দেখতে পাই নি। বোধহয় প্রভেদ কিছু নেই। কী করে থাকবে। বাঙলার দার্জিলিঙ জেলা তো সিকিম রাজ্যেরই অধীনে ছিল। বড় লাটের ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে হয়েছিল এই অঞ্চল। সিকিমপতি রাজা বড়লাটকে

উপহার দিয়েছিলেন দার্জিলিঙ জেলা। দার্জিলিঙের সঙ্গে সিকিমের তাই প্রভেদ নেই। মনে হচ্ছে যে একই পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা চলেছি।

স্বাতি বলল : একটু আগে আমার কী মনে হচ্ছিল জানো?

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : রঙ্গনি নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে আমার কাশ্মীরের কথা মনে আসছিল। পহলগামে যাবার সময় আমরা লীডার নদীকে এইরকম দেখেছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে মিস্টার গিরি বললেন : একই রকম দৃশ্য নাকি!

বললুম : তফাত নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মনে হয় একই রকম। নদীর ধারে ধারে পথ দেখলেই কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে যায়।

মিস্টার গিরি বললেন : তিস্তা ব্রিজ থেকে শিলিগুড়ির দিকেও এমনি। তিস্তার ধারে ধারে পথ।

দেখতে দেখতেই আমরা লোকালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেলুম। ঘর বাড়ি লোকজন কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। স্বাতি ফিরে তাকাল মিস্টার গিরির দিকে। আর আমি জিজ্ঞাসা করলুম : গ্যাংটকে পৌঁছে গেলুম নাকি?

প্রসন্ন মুখে মিস্টার গিরি বললেন : তাই তো দেখছি।

আমাদের যাত্রার শেষ হতে আর দেরি নেই।

পথের নানা স্থানে আমরা ফুলপাতার ফটক দেখেছি। সরকারী ও বেসবকারী লোকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ভুল করে আমাদেবও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন অনেকে। গ্যাংটকেও অভ্যর্থনা পেলুম। তারপবে মিস্টার গিরির নির্দেশক্রমে একটি হোটেলের দরজায় এসে নামলুম।

নিচের তলায় দোকানপাট, দোতলা ও তিনতলায় হোটেল। সিঁড়ি উঠেছে বাইরে থেকে। মিস্টার গিরি বললেন: আপনারা একটুখানি অপেক্ষা করুন, হোটেলে জায়গা আছে কিনা আমি দেখে আসি।

বলে তিনি তবতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমবা গ্যাংটক শহরটি দেখতে লাগলুম। এ জায়গাটি একটি সমতল ক্ষেত্র। অতি প্রশস্ত পথ, দুধারে নানা পণ্যের দোকানপাট, আর গাড়ি পার্ক করবার জায়গা পথের মাঝখানে। এটি যে গ্যাংটকের বাজার এলাকা তা বুঝতে অসুবিধা হল না। ছোট্ট বাজাব, এক নজরেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে একটি পায়ে চলার পথ উপরে উঠেছে, আব একটি পথ একটু ঘুরে এগিয়ে গেছে। সামনের দোকানপাটগুলির পিছনেই উঁচু পাহাড়, তার গায়েও ঘর বাড়ি আছে, পথঘাট আছে। যে কোন পাহাড়ী শহরের সঙ্গেই এর তুলনা করা যেতে পারে। রাস্তায় যারা আনাগোনা করছে, তাদের নানা ধরনের পোশাক সবাই পাহাড়ী, কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের যেন মিল নেই। চেহারায় নয়, পোশাকের পার্থক্যেই তা বোঝা যাচ্ছে।

অল্পক্ষণ পরেই মিস্টার গিরি নেমে এলেন। বললেন: আসুন উপরে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: রাত কাটাবার মতো জায়গা পাওয়া গেল?

মিস্টার গিরি হ্যাঁ বললেন না, নাও বললেন না। বললেন: হবে একটা ব্যবস্থা।

স্বাতি বলল: কী রকম ব্যবস্থা শুনি।

মিস্টার গিরি বললেন: আপনাদের জন্যে একটা তিন বেডের ঘর পাওয়া গেছে। আমার জন্যে ভাবনা নেই।

স্বাতি বুঝি অপরিসীম খুশী হল, বলল: তা হলে তো ভালই হল। তিনজনেই এক ঘরে থাকতে পারব।

পরম বিস্ময়ে মিস্টার গিরি তাকালেন স্বাতির মুখের দিকে। আর স্বাতি বলল: ট্রেনের কামরায় আমরা চারজন থাকি না!

আমি সহাস্যে বললুম: থাকি বৈকি।

মিস্টার গিরি বললেন: কিন্তু—

আসুন আসুন।

বলে স্বাতি সোৎসাহে এগিয়ে গেল।

মিস্টার গিরি বললেন: মালপত্র এখন গাড়িতে থাক। আগে আমরা মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নিই। ড্রাইভারও খেয়ে নিক কিছু।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: পথে এমন অভিনন্দন কেন পেলুম তা কি জানতে পেরেছেন?

মিস্টার গিরি হো হো করে হেসে উঠলেন আমার প্রশ্ন শুনে। বললেন: সকলের আগে তো ঐ খবরটিই নিয়েছি। সিকিমের মহারাজা আজ অ্যামেরিকা থেকে আসছেন সপরিবারে। বাগডোগরায় প্লেন থেকে নামবেন, তারপরে মোটরে আসবেন। সকাল থেকেই সবাই সেজেগুজে অপেক্ষা করছে।

হোটেলের দোতলায় মস্ত বড় খাবার ঘর। কিন্তু চেয়ার টেবিলগুলো হোটেলের উপযোগী নয়। সমস্ত ঘর জুড়ে অনেকগুলি সোফা সেট পাতা আছে, খাবার ব্যবস্থা সেণ্টার পিসের উপরে।

এইটুকু টেবিলে কী করে খাওয়া যাবে সেই কথা যখন ভাবছিলুম, তখন বেয়ারা এসে ছোট ছোট টেবিল পাশে জুড়ে দিয়ে গেল। স্বাতি তাই দেখে বলল : কী রকম কায়দা দেখেছ ?

আমরা জানালার ধারে বসেছিলুম। মাথা উঁচু করে আমি নিচের রাস্তায় লোক চলাচল দেখবার চেষ্টা করছিলুম। সংক্ষেপে উত্তর দিলুম : দেখেছি।

মিস্টার গিরি মুখ হাত ধুয়ে টেবিলের কাছে আসছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : কী দেখছেন ?

কোন পরিচিত লোক দেখতে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখছি।

এখানে আপনার পরিচিত লোক আছে!

মিস্টার গিরির বিস্ময় দেখে আমি হেসে বললুম : আছে বৈকি।

স্বাতি বলল : তোমার পেন ফ্রেণ্ডের কথা ভাবছ! কিন্তু তাকে চিনবে কী করে!

স্বাতির কথা শুনে মিস্টার গিরি হাসলেন, বললেন : অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন : নাম ঠিকানা আছে ?

আমি আমার বন্ধুর নাম ঠিকানা বললুম। মিস্টার গিরি চলে গেলেন ম্যানেজারের কাছে, তাঁকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আবার ফিরে এলেন।

খেতে খেতেই আমার পেন ফ্রেণ্ডের খবর পেয়ে গেলুম। মহারাজাকে অভ্যর্থনার জন্য তিনিও রাজপথে দাঁড়িয়ে আছেন। খবর দিয়েছেন যে মহারাজা সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাবেন। কাজেই তাঁর গলায় একখানা মালা দিয়েই তিনি হুড়মুড় করে নেমে আসবেন। খুশী হয়েছেন আমরা এসেছি জেনে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলে আরও খুশী হবেন। গ্যাংটকের দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি সযত্নে দেখিয়ে দিতে পারবেন।

ম্যানেজারের কাছে এই খবর পেয়ে মিস্টার গিরি খুশী হলেন

আমাদের চেয়ে বেশি। বললেন: এ খুবই ভাল হল। সবকিছু তো আমার জানা নেই, আমারও অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।

খেয়েদেয়ে যখন আমরা নিচে নামলুম, তখন দেখলুম বাজারের অনেক লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। সামনের রাস্তায় নাকি মহাবাজার গাড়ি দেখা গেছে। সে অনেকটা দূরে। পর পব কয়েকখানা গাড়ি নিচের রাস্তা থেকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

মিস্টার গিরি বললেন: এই সুযোগে আমি একটুখানি ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

চাক্‌রি করে আসি দু মিনিট। আমাদেব এজেণ্ট আছে এখানে, একবাব তার দেখা পেলেই—

আমি হেসে বললুম: বুঝেছি।

পেট্রোলের খরচটাও তাহলে পকেট থেকে যাবে না।

বলে মিস্টার গিরি এগিয়ে গেলেন। ড্রাইভারকে বলে গেলেন আমাদের মালপত্র উপরে পৌঁছে দিতে।

এইবারে স্বাতি আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল: এই সময়ে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি।

আমি বললুম: কোন গোপন কথা নয় তো!

ভারি গোপন কথা। এইবেলা সাবধান না হলে বিপদ আছে।

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে, আর স্বাতি হাসল মুখ টিপে। বলল: সিকিম নিয়ে বেশি মাতামাতি কোরো না।

কেন?

দার্জিলিঙ আর সিকিম নিয়ে তো বাঙলা দেশ নয়, এখনও আমরা পাহাড়েই পড়ে আছি।

তাই বলে এমন একটা সুন্দর দেশকে আমরা উপেক্ষা করব!

দরকার হলে সিকিমের কথা আলাদা লিখো।

স্বাতির এই উপদেশের জবাব আমি দিতে পারলুম না। আমার

দৃষ্টি তখন দূরের পাহাড়ে নিবদ্ধ হয়েছিল। আমি একজন ভদ্রলোককে দেখছিলুম পাহাড়ের পথ ধরে দ্রুত নেমে আসতে। যেন গড়িয়ে নামছেন, কিন্তু ঋজু দেহ সোজা হয়ে আছে। স্বাতির দৃষ্টিও পড়ল ভদ্রলোকের উপরে, বলল : তোমার পেন ফ্রেণ্ড নাকি?

আমি বললুম : তাই মনে হচ্ছে।

এ কথা বলতে না বলতেই ভদ্রলোক হারিয়ে গেলেন। কয়েক মূহূর্ত তাঁকে দেখতে পেলুম না। তারপরেই তাকে সামনের রাস্তায় দেখলুম একেবারে চোখের সামনে। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন দু হাত জুড়ে। বললেন : বড্ড দেরি হয়ে গেল, তাই না।

আমরাও তাঁকে নমস্কার করলুম।

স্বাতি বলল : আমাদের চিনলেন কী করে?

সহাস্যে ভদ্রলোক বললেন : চোখের সামনে যে আপনাদের দেখতে পাই।

তারপরে বললেন : এখনি বেরবেন, না বিশ্রাম করবেন?

আমি বললুম : বিশ্রাম করব না, তবে বেরব একটু পরে। আমাদের একজন সঙ্গী একটুখানি কাজে বেরিয়েছেন।

মিস্টার গিরির গলার স্বর তখনই শুনতে পেলুম। তিনি বললেন, এই তো ফিরে এসেছি আমি।

আমি বললুম : দেখা পেলেন না বুঝি?

পেয়েছি। পরে দেখা করতে বলে এলাম।

বলে মিস্টার গিরি আমাদের গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন : আপনার নাম আমরা জানতে চাইব না, আপনাকে আমরা মনিবাবু বলে ডাকব।

মনিবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকালেন আমাদের দিকে। মিস্টার গিরিই আবার বললেন : আপনার আসল নামটি প্রকাশ হয়ে পড়লে নাকি আপনারই বিপদ হবে।

ভদ্রলোক এবারে বুঝতে পারলেন কথাটা, বললেন : এখানে সে ভয় নেই, বেড়াতে বেশি লোক আসে না। বিপদ যদি কিছু হয় তো আপনার হবে। আপনি তো দার্জিলিঙের বন্ধু।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, সেই দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল : বৃষ্টি নামবে নাকি ?

মনিবাবু বললেন : তাব দেরি আছে।

মিস্টার গিবি বললেন ° সেকি মশাই, এদিকে এখন বৃষ্টি হচ্ছে !

মনিবাবু হেসে বললেন : গ্যাংটকেব এ একটা বৈশিষ্ট্য। দিনেব বেলায় পরিষ্কাব আকাশ, যত বেলা বাড়বে মেঘও জমবে তত, বিকেল থেকে ঝিবঝিবে বৃষ্টি, সন্ধ্যেবেলাটা ঘবে বসে কাটাতে হবে।

সাবা বছব এমনি ?

দিন কয়েক থেকে এমনি চলছে।

স্বাতি বলল : বৃষ্টি নামবার আগেই তাহলে দ্রষ্টবা স্থানগুলো দেখে আসি।

সেই ভাল।

বলে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লুম। মনিবাবু বললেন : প্রথমেই আপনাদের মহাবাজার প্যালেসে নিয়ে যাই।

মনিবাবু ড্রাইভাবকে পথের নির্দেশ দিলেন।

স্বাতি বলল : রাজবাড়িতে আজ ঢুকতে দেবে কেন ?

মনিবাবু বললেন : রাজবাড়ি আমরা দূর থেকে দেখব, আর ভেতরে ঢুকব রাজবাড়ি সংলগ্ন গোম্ফার। গ্যাংটকেব এটি প্রধান দর্শনীয় স্থান।

আমরা সোজা এগিয়ে ডান হাতের পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম। ঘরবাড়ি দেখলুম। দেখলুম স্যর টি. এন. অ্যাকাডেমি নামে গ্যাংটকের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। স্বর্গত মহারাজা টাশি নামগিয়েলের নামে এই প্রতিষ্ঠান। আরও এগিয়ে আমরা

পাহাড়ের একেবারে মাথায় পৌঁছে গেলুম। রাজপথ এখানে খুব প্রশস্ত, সুন্দর দৃশ্য। দূর থেকে দেখলুম রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদ বললে যে রকমের ধারণা হয়, সে রকম বিরাট কিছু নয়। পাহাড়ের কোলে একটি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি। উপরে রঙীন ছাদ চালার মতো। গাছপালা ও ফুলের বাগান সাধারণ ধরণের। এমন বাড়ি আমরা অনেক পাহাড়ী শহরে দেখেছি।

মনিবাবু বললেন: এখানে আমরা নামব না, নামব প্রাসাদের পিছনে গিয়ে। পিছনের দরজা দিয়ে গোম্ফায় যেতে হয়।

আমরা এগিয়ে গেলুম। নেমে গেলুম খানিকটা। মনিবাবু একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে বললেন: এটা সিকিমের সেক্রেটারিয়েট, ফেরার পথে এখানে নামব। পার্ক দেখাব একটা।

সেক্রেটারিয়েটের গেট পেরিয়ে আবার আমরা উপরে উঠে গেলুম। পৌঁছে গেলুম রাজপ্রাসাদের এলাকার মধ্যে। গাড়ি থেকে নেমে মনিবাবু সবকারী রক্ষীদের সঙ্গে কথা কইলেন স্থানীয় ভাষায়, তারপরে আমাদের ডেকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দূর থেকেই গোম্ফাটি দেখা যাচ্ছিল। দোতলা বাড়ি, তার ছাদ ছু থাক। বড় বড় জানালা দরজার উপরে পর্দা ঝুলছে। আমরা এগিয়ে গিয়ে গোম্ফার ভিতরে ঢুকে পড়লুম, ঘুরে ঘুরে দেখলুম সব কিছু। ঘুমের গোম্ফা দেখে একটা ধারণা জন্মেছিল। এখানকার গোম্ফাটি ঠিক তেমন নয়। এখানে একটি বড় ঘরে প্রার্থনা সভার মতো ব্যবস্থা। রাজপরিবারের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া এইখানেই হয়ে থাকে। গোম্ফার দেওয়ালে আছে বুদ্ধের জীবনের কাহিনী চিত্রিত।

মনিবাবু বললেন: সিকিমে সবশুদ্ধ চুয়াল্লিশটা গোম্ফা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল সঙ্গচেলিং পামিয়ঙ্চি টাশিডিং ফোডাং ও রুমটেক গোম্ফা।

রুমটেক গোম্ফা মনিবাবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, বললেন:

এই দিকে মাইল আষ্টেক দূরে। এ ছাড়া ছোরটেন আর মেনডঙের সংখ্যার গোনাগুনতি নেই।

গোম্ফা শব্দটি আমরা জানি। মিস্টার গিরির কাছে ছোরটেন শব্দটিও শুনেছি, কিন্তু মেনডঙ শব্দ কোন দিন শুনি নি। কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: ছোরটেন হল সমাধি স্থান, শুধু বুদ্ধের নয়, বড় বড় লামাদেরও ছোরটেন আছে। আর পথের ধারে নিচু দেওয়ালের গায়ে ওঁ মনিপদ্মেহুঁ বা ঐ ধরণের যেসব প্রার্থনা মন্ত্র লেখা থাকে, তারই নাম মেনডঙ। সিকিমে কত লামা আছে জানেন? বারশো। তাদের লামা ধর্ম ভারতীয় বৌদ্ধদের মতো নয়, বৌদ্ধ ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে তন্ত্র মন্ত্র ও জাদু ঢুকে পড়েছে। রাজা ও প্রজা প্রায় সকলেরই এই ধর্ম।

রাজধর্মের কথায় রাজবংশের কথাও উঠে পড়ল। মনিবাবু বললেন: সিকিমের রাজবংশ খুব প্রাচীন নয়। সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো পরিবার। তিব্বতের অন্তর্গত খাম প্রদেশের মৈনাক থেকে এঁরা এই দেশে এসেছেন। এই বংশের পূর্বপুরুষেরা হিমাচল প্রদেশের লোক, হিমাচলের রাজা ইন্দ্রবোধির বংশে এঁরা জন্মেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিকিমের লেপচারাও এসেছে আসামের পার্বত্য প্রদেশ থেকে। আর লাসার লামারা এসে এদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে গেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ফুন্‌ছোগ নামগিয়েল হলেন ডেনজঙের প্রথম ছোগিয়েল।

কয়েকটা নূতন শব্দ শুনে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বুঝতে পেরে মনিবাবু বললেন: ছোগিয়েল মানে রাজা, আর তিব্বতীভাষায় সিকিমের নামই ডেনজঙ, মানে চালের দেশ। সিকিম শব্দটি এসেছে সুখিম থেকে, তার মানে নতুন বাড়ি। অন্য দেশ থেকে রাজারা এসে এখানে বাড়ি করেছিলেন বলেই বোধহয় সুখিম নাম হয়েছিল। সুখিম শব্দটিই এখন সিকিমে পরিণত হয়েছে।

গোম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে একটি ঢালু পথে আমরা সেক্রেটারিয়েট ভবনে নেমে গেলুম। যেমন সুন্দর বাড়ি তেমনি সুন্দর এর বাগানটি। পিছনে একটি চিড়িয়াখানার মতোও আছে। ধাপে ধাপে নেমে সব দেখতে হয়। আকাশে রোদ ছিল না, মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে মনিবাবু বললেন : এই বাগানে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে সময় কাটাতে বেশ লাগে, কিন্তু আজ তার উপায় নেই। এর চেয়েও একটি ভাল জায়গায় যেতে আমাদের বাকি আছে।

আমি বললুম : অনেক দূর বুঝি?

খুব কাছে, কিন্তু তার রূপ বোধহয় এতক্ষণে ঢাকা পড়ে গেছে। এখান থেকে আমরা পলিটিকাল অফিসারের বাড়ি যাব।

আবার আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হলুম। পথ বেশি নয়। এইটুকু যেতে যেতেই মনিবাবু আমাদের পলিটিকাল অফিসারের ইতিহাস শোনালেন। দুশো বছর আগে সিকিম একটি মস্ত রাজ্য ছিল। ধীরে ধীরে এই রাজ্যের আয়তন ছোট হয়েছে। কিছু তিব্বত কেড়েছে, কিছু ভুটান ও কিছু নেপাল। ভারত থেকে সাহায্য করতে এসে ইংরেজও কিছু চেয়ে নিয়েছে। দার্জিলিঙ জেলাটি বড়লাট বেন্টিঙ্ককে দান করে সিকিমের আর এক বিপদ হয়েছিল। তিব্বত সিকিমকে নিজের অনুগত ভাবত, ইংরেজের সঙ্গে এই বন্ধুতার জন্য রাজাকে শাস্তি দিল। তিব্বতের রাজধানী লাসা বৌদ্ধ লামাদের প্রধান তীর্থ। ইচ্ছামতো লাসায় যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সিকিমের রাজা আট বছরে একবার যেতে পারবেন। তারপরে এক ইংরেজ উদ্ভিদবিদ হুকার সাহেবকে বন্দী করার জন্য ইংরেজের সঙ্গেও সিকিমের বিবাদ বাধল। সিকিমের রাজধানী তখন টুমলুঙে, সেই দিকে এগিয়ে এল ইংরেজ সেনা। ১৮৬১ সালে যে সন্ধি হল, তাতে সিকিম একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল। বছর পঁচিশেক পরে তিব্বতীরা সিকিমে ঢুকে পড়েছিল। আর তার উত্তরে ইংরেজ লাসা

অভিযান করেছিল দু বছর পরে। এই সময়েই গ্যাংটকে একজন পলিটিকাল অফিসার এসে বসলেন সর্বময় কর্তা হয়ে। মহারাজার ক্ষমতা খর্ব হয়ে গেল বহুলাংশে। স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারত এই পলিটিকাল অফিসার রেখেছেন সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে।

পাহাড়ের অন্যধারে আমরা পলিটিকাল অফিসারের বাড়িতে পৌঁছে গেলুম। খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে আমরা এই বাড়ির ফটকে পৌঁছলুম। বন্দুকধারী পুলিস ছিল দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমাদের তারা বাধা দিল না। বোধ হয় কাউকেই বাধা দেয় না। সরাসরি আমরা এই বাড়ির বাগানে এসে পৌঁছলুম। আকাশের মেঘ আরও ঘন হয়ে অনেক নিচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনিবাবু বললেন: আমাদের দুর্ভাগ্য। উত্তরের আকাশ আজ মেঘে একেবারে ঢেকে গেছে।

ফুলেভরা বাগানের শেষ প্রান্তে আমরা এগিয়ে গেলুম। গ্যাংটক পাহাড়ের শেষ এইখানে। এর পরে স্তরে স্তরে পাহাড় ডিঙিয়ে যে হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরগুলি দেখা যায়, মনে মনে তা কল্পনা করে নিলুম। মনিবাবু বললেন: দার্জিলিঙে যে দৃশ্য দেখেছেন, এখানে দাঁড়িয়ে তা আরও সুন্দর দেখতেন।

একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছিল। বোধহয় বাড়ির ভৃত্য। জিজ্ঞাসা করল: আপনারা কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উত্তর দিলেন মনিবাবু, বললেন: সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে বোলো যে আমরা তাঁর বাগান দেখতে এসেছি। তাঁকে কষ্ট দিতে চাই না।

শিরশির করে একটুখানি ঠাণ্ডা হাওয়া এল উত্তর দিক থেকে। স্বাতি বলল: এইবারে বোধহয় বৃষ্টি নামবে।

মনিবাবু তাঁর ঘড়ি দেখলেন। বললেন: এত আগে বৃষ্টি নামার

কথা নয়। অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। সূর্যাস্ত তো হয় নি, সূর্য ঢাকা পড়েছে মেঘে।

গ্যাংটকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলুম না। বিফল মনোরথে ফিরে এলুম গাড়িতে।

ধর্মশালার কথা আমার মনে পড়ল। শুনেছিলুম যে কাংড়া উপত্যকার ঐ শহরটিতে রোজ বৃষ্টি হয়। জ্বালামুখী থেকে আমরা ধর্মশালায় যাচ্ছিলুম। সারা দিন রোদ দেখে ভেবেছিলুম যে সেদিন বোধহয় বৃষ্টি হবে না। কিন্তু কাংড়ায় পৌঁছে সবাই ব্যস্ত হল গাড়ির উপরের মাল ঢাকবার জন্যে। অনেক দেরি হয়েছিল এই কাজে, আর আমরা তার দরকার নেই ভেবে দেরির জন্য বিরক্ত হয়েছিলুম। তারপরে পাহাড়ের আধখানা উঠতে না উঠতেই আকাশের রূপ বদলে গেল। মেঘে ঢাকা পড়ল আকাশের সূর্য। ধর্মশালায় পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হয়ে গেল পাহাড়ের পথ, জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। গাড়ির বাতি জ্বেলে ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হলুম। শহরের বাতি দেখবার আগেই আমরা বৃষ্টি পড়ছে দেখতে পেলুম। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বাস থেকে নেমেছিলুম, বৃষ্টি একটু কমবার পরে গিয়েছিলুম টুরিস্ট বাংলোয়। সন্ধ্যাবেলায় কোথাও বেরতে পারি নি, বেরিয়েছিলুম পরদিন সকালে। প্রসন্ন আলোয় চারিদিক তখন ঝকঝক করছে।

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ বলতো ?

বললুম : ধর্মশালার কথা।

স্বাতি বলল : সেখানেও খুব বৃষ্টি দেখেছিলুম, তাই না।

গাড়ির ভিতর থেকে মিস্টার গিরি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন : ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে যে !

পড়ছে ! আজ তাহলে আগেই শুরু হয়ে গেল।

বলে মনিবাবুও হাত বাড়িয়ে দেখলেন। তারপরে আশ্বস্ত হয়ে বললেন : না, শুরু হয় নি। নোটিশ দিচ্ছে সবাইকে।

বলে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে নূতন পথ ধরে এগিয়ে চললেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মনিবাবু বললেন : দেখাবার মতো আর কিছু তো নেই, শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসব। সাধারণ দৃশ্য দেখতে পাবেন।

এক সময় আমরা একটি ফুলের নার্সারীর সামনে উপস্থিত হলুম। মনিবাবু বললেন : ফুলের শখ থাকলে দেখতে পারেন। ক্যামেলিয়া বিগোনিয়া গ্লক্সিনিয়া প্রভৃতি পাহাড়ী ফুল সিকিম থেকে বাংলায় যায়।

স্বাতি বলল : তুমি তো ফুল ভালবাস, নেমে দেখবে একবার?

মনিবাবু বললেন : ফুল আপনি ভালবাসেন বুঝি। তাহলে আপনি দিন কয়েক এখানে থেকে যান।

পৃথিবীর যে কোন বোটানিস্ট এখানকার গাছপালা ও ফুল দেখে আশ্চর্য হবেন।

তারপরে একটা ফিরিস্তি দিলেন আমাদের। প্রায় চার হাজার জাতের ফুল ও আড়াইশো জাতের ফার্ন। ছশো ষাট রকমের অর্কিড, কুড়ি জাতের পাম আর তেইশ রকমের বাঁশ। এই উদ্ভিদের তিনটে জোন আছে—সাতশো থেকে চার হাজার ফুট, চার হাজার থেকে সাড়ে এগারো হাজার ফুট, সাড়ে এগারো থেকে আঠারো হাজার ফুট পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের গাছপালা জন্মায়।

সবিস্ময়ে মিস্টার গিরি বললেন : অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার। এসব সংখ্যা মনে রাখলেন কী করে!

মনিবাবু হেসে বললেন : এন্টমলজি ভালবাসেন? তাহলে আরও কিছু দিন বেশি থাকতে হবে। মাত্র ছশো জাতের প্রজাপতি, আর মথজাতীয় প্রজাপতি সাত হাজার।

স্বাতি বলল : সর্বনেশে সংখ্যা। সারাজীবন ধরে দেখতে হবে দেখছি।

কিন্তু ইচ্ছা হলেও নার্সারিতে আমরা নামতে পারলুম না। বৃষ্টি তখন শিপশিপ করে পড়ছে। ফুলের বাগানটি তো সমতল ভূমিতে

নয়, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে এই বাগান। সংকীর্ণ পথ ধরে ওঠানামা করতে হবে বলে মনিবাবুই বারণ করলেন নামতে। আমরা তাই গাড়ির মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

মিস্টার গিরি বললেন: এখন তাহলে হোটেলেই ফেরা যাক। চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

মনিবাবু বললেন: গরিবের কুঁড়ে একবার দেখবেন না?

আপত্তি করলেন মিস্টার গিরি, বললেন: আমাদের প্রাসাদেই এখন চলুন।

বলে আপন মনে হাসতে লাগলেন।

গ্যাংটকের পথ তখন বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল হয়ে উঠছে।

২২

হোটেলের ডাইনিং হলে বসে আমরা যখন চা খাচ্ছিলুম, বাহিরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। দিনের আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার নেমেছিল চারিদিক ঘিরে। নানা প্রশ্নে মনিবাবুকে আমরা অস্থির করে তুলেছিলুম। স্বাতি বলল : বাজারের রাস্তায় আমরা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু তারই মধ্যে বিচিত্র বেশের নরনারী দেখেছি। এরা সবাই কি সিকিমের মানুষ ?

মনিবাবু বললেন : সিকিমে সিকিমের মানুষ কারা, সেইটে জানতেই আপনার সময় লাগবে। নেপালী আছে, ভুটানী আছে, তিব্বতী আছে, আর লেপচারা। এরা সবাই সিকিমের মানুষ। নেপালী তাই আজকাল জং বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে, তার মানে তারা সিকিমের নেপালী।

আমি বললুম : চেহারা বা বেশভূষা দেখে আপনি এদের চিনতে পারেন ?

মনিবাবু হেসে বললেন : পারি। দিনকয়েক থাকলে আপনারাও পারবেন। শুধু চেহারা আর বেশভূষা নয়, কথাবার্তাতেও প্রভেদ আছে।

মিস্টার গিরি বললেন : আপনি নিশ্চয়ই এদের ভাষা জানেন ?

লজ্জিত ভাবে মনিবাবু বললেন : অনেকদিন আছি কিনা এদেশে, তাই শিখতে হয়েছে।

এতে লজ্জার কী আছে !

জীবনযাত্রায় এদের মতোই হয়ে গেছি।

স্বাতি বলল : আপনি খুব ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন বলে শুনেছি।

মনিবাবু বললেন : ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু তার সুযোগ পাই নে।

কেন ?

শীতকালে আমাদের ছুটি। তখন আর এদেশে থাকা সম্ভব নয়। তাই পালিয়ে যাই বাঙলাদেশে। শীতের পরে যখন ফিরে আসি তখন কাজ আর কাজ। তা ছাড়া বর্ষা এখানে বড় উৎপাত করে। মে মাস আর অক্টোবর মাস ছাড়া অন্য সময় এখানে বেড়ানো যায় না।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: সম্প্রতি নাথুলা ঘুরে এসেছি। সে কথা বোধহয় আপনাকে জানাই নি।

আমি বললুম: না।

শুনেছিলুম সুন্দর জায়গা। দেখে চোখ সার্থক করে এলুম। নাথুলা আর জেলেপ লা কাছাকাছি। কিন্তু পথ ভিন্ন। নাথুলা গ্যাংটক থেকে যেতে হয় পঁয়ত্রিশ মাইল, মোটরের পথ কার্পোসাঙ ও ছাঙ্গুলেক হয়ে উপরে উঠেছে। জেলেপ লা এ পথে নয়, জেলেপ লা যেতে হয় কালিম্পঙ থেকে। লা মানে জানেন তো ?

আমি বললুম: লা মানে বোধহয় গিরিবর্ত্ম।

মনিবাবু বললেন: ইংরেজীতে পাস বলে। সাধারণ লোকে অবশ্য নাথুলা পাস জেলেপ লা পাসই বলে। অনেক ইংরেজী বইএও তাই দেখেছি। তাতে সুবিধেই হয়।

স্বাতি হাসল তাঁর কথার ধরণে।

মনিবাবু বললেন: এই নাথুলা ও জেলেপ লা কত উঁচু জানেন ? প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট। আর তার ওপরেই চুম্বি উপত্যকা একসময় সিকিমেরই অধীন ছিল। এখন তিব্বতের কবলে।

কী দেখলেন সেখানে ?

ভারতীয় সেনা টহল দিচ্ছে এধারে, আর ওধারে চীনা সৈন্য। বন্দুকের আওয়াজও নাকি মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু আমি তো খবরের কাগজের রিপোর্টার নই। আমি প্রাকৃতিক শোভা দেখতে গিয়েছিলুম, আর পরম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছি।

আমরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে বললেন: বাঁদিকে

অনেকগুলি পাহাড়ের চূড়ো সিকিম ও তিব্বতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে, আর ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসছে ঝর্নার মতো জলের ধারা। উপরের পাহাড়ে ঝাউএর শ্যামলিমা, নিচে রডডেনড্রনের আগুন। চোখ আপনাদের জুড়িয়ে যাবে।

খানিকক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ভুটানে যান নি?

মাথা নেড়ে মনিবাবু বললেন : না।

কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে আপনি ভুটানেও একবার গিয়েছিলেন।

আমি যাই নি। গিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু। কাগজে তখন অনেক লেখালেখি হয়েছিল।

আমি বললুম : এবারে তাহলে ভুটানের গল্প বলুন।

মনিবাবু বললেন : সত্যি কথা বললে বোধহয় বিশ্বাস করবেন না। ভুটান সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি না। এই সেদিনও আমার ধারণা ছিল যে ভুটানের রাজধানী হল পুনাখা। ছেলেবেলায় ভূগোলে তাই পড়েছিলাম। এখন জেনেছি যে থিম্বু হল ভুটানের বর্তমান রাজধানী, আর কিছুদিন আগে নাকি পারোতে রাজধানী ছিল। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভুটান সরকার নিজের দেশে পথঘাট তৈরি করতে রাজী ছিল না, পছন্দ করত না বিদেশীদের আনাগোনা। কিন্তু এর পরের বছরেই ভুটান সরকার সহসা তার মত বদলাল। বোধহয় তিব্বতের অবস্থা দেখেই ভয় পেল যে চীনারা এসে ঢুকে পড়তে পারে। শুনে আশ্চর্য হবেন যে ভারতীয় সাহায্যে এখন ভুটানে অনেক পথঘাট তৈরি হয়ে গেছে ও এখনও হচ্ছে। বাঙলার সীমান্তে ফুনছোলিঙ নামে একটা জায়গা থেকে পারো ও থিম্বু পর্যন্ত সড়ক তৈরি হয়েছে দু বছরে। পূর্ব-পশ্চিমেও যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়েছে। খচ্চরের পিঠে চেপে যে পথ অতিক্রম করতে আগে ছদিন লাগত, এখন জিপে তা দশ ঘণ্টায় যাওয়া যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এই ফুনছোলিঙ জায়গাটি কোথায়?

মনিবাবু বললেন: জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী নামে একটি জায়গা আছে। পাহাড়েব উপবে একটি বেল স্টেশন, আলিপুব জংসন থেকে যেতে হয় প্রায় ভুটানেব সীমান্তে। এধারে জয়ন্তী, ওধাবে ফুন্‌ছোলিঙ। মাঝখানেব যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাব জানা নেই।

আমি বললুম: অতি শৈশবে আমি জয়ন্তী বেড়াতে গিয়েছি। যত দূর মনে পড়ে ভুটান সীমান্তের দিকে মোটর যেতে দেখেছি। ম্যাপে আমি আব একটি পথ দেখেছি ভুটানে যাবাব। আসামেব রঙ্গিয়া থেকে সে পথ ভুটানেব উপর দিয়ে তিব্বতে গেছে।

মিস্টাব গিবি বললেন: কালিম্পঙ থেকেও চুম্বি উপত্যকাব উপব দিয়ে তিব্বতে যাওযা যায়। আবাব নেপালের বাজধানী কাটমাণ্ডু থেকেও তিব্বতে যাবার পথ তৈবি কবেছে চীনাবা। এই সব পথ গিয়াঞ্চে হয়ে লাসা গেছে।

ঠিক এই সময়ে এক ভদ্রলোক এলেন মিস্টার গিরির সঙ্গে দেখা কবতে। তাঁকে দেখতে পেয়েই মিস্টার গিরি উঠে পড়লেন। এগিয়ে গিয়ে ইংরেজীতে বললেন: এই বৃষ্টিতে আপনি বেরিয়ে পড়েছেন?

ভদ্রলোকও উত্তর দিলেন ইংবেজীতে, বললেন: বৃষ্টি থেমেছে বলেই বেরিয়েছি।

বৃষ্টি থেমেছে বুঝি।

বলেই মনিবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বললেন: আর সময় নষ্ট করব না আপনাদের। নমস্কাব।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!

যেতে যেতেই মনিবাবু বললেন: এবারে নামলে বৃষ্টি আর থামবে না। সারা বাত আপনাদেব সঙ্গে বসে থাকতে হবে।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: কাল আছেন তো?

বললুম: কাল সকালেই আমরা ফিরে যাচ্ছি।

মনিবাবু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন: কাল সকালেই চলে যাবেন! কোন কথাই যে হল না আপনাদের সঙ্গে! নিজের কাছে নিয়েও যে যেতে পারলাম না!

আমি বললুম: পরের বারে সব হবে।

স্বাতিও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল: কলকাতায় এলে দেখা করবেন।

অগত্যা।

বলে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালবেলায় চা খেয়ে আমরা কালিম্পঙ যাত্রা করলুম। সেই পুরনো পথেই যাত্রা। পথের উপরে রূপোলী রোদ এখন ঝকঝক করছে। প্রসন্ন হয়েছে সিকিমের সুন্দর আকাশ। অল্প খানিকটা পথ অতিক্রম করতেই গ্যাংটকের ঘরবাড়ি আমরা ছাড়িয়ে এলুম।

তিস্তার পুল গ্যাংটক থেকে চল্লিশ মাইলের কম। এবারে আমাদের পুল পেরতে হবে না। তিস্তার এপার থেকেই আমরা কালিম্পঙ যেতে পারব। কালিম্পঙ থেকে শিলিগুড়ি যাবার পথে আমাদের তিস্তা পার হতে হবে। শুধু পার হওয়া নয়, তিস্তার তীরে তীরেই আমাদের পথ বাঙলার সমতল ভূমি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

অনেকক্ষণ আমরা কথা বলি নি। মিস্টার গিরি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন: গ্যাংটক আপনাদের কেমন লাগল?

আমি সংক্ষেপে বললুম: ভাল।

মিস্টার গিরি বললেন: কতটুকুই বা দেখতে পেলেন! বৃষ্টির জন্যে সব পণ্ড হয়ে গেল।

এ কথার আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মিস্টার গিরি আবার বললেন: এমন ধারা বৃষ্টি হচ্ছে জানা থাকলে প্রোগ্রামটা একটু অন্য রকম করতাম। সারা সকাল ঘুরে

বেড়িয়ে দুপুরে লাঞ্চের পর এখান থেকে বেরতাম। রাত কাটাতাম কালিম্পঙে। পরদিন কালিম্পং দেখে শিলিগুড়ি। একটা দিন বেশি লাগত বটে, কিন্তু ভাল করে দেখতে পেতেন সব।

স্বাতি বলল: বরফের পাহাড় ছাড়া আর সবই তো দেখেছি।

মিস্টাব গিরি বললেন: না। ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি আমাদের দেখা হয় নি। তাদেব লাইব্রেরিতে অনেক মূল্যবান তিব্বতী পুঁথি আছে।

কোথায় সে ইনস্টিটিউট?

সে কথাই তো জেনে নেওয়া হয় নি। এক দিকে তিব্বতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, অন্য দিকে টিবেটোলজির চর্চা হচ্ছে। কেমন একটা খটকা লেগেছে মনে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কার কাছে এ কথা শুনলেন?

আমাদেব এজেন্টের কাছে। আরও অনেক কথা শুনেছি তাঁর কাছে। কিছুদিন আগে নাকি গ্যাংটকের বাজাব বসত কয়েকটা কাঠের ঘরে। যে বাজার আমরা দেখলাম, তার নাম লালবাজার, খুব সম্প্রতি তৈরি হয়েছে এই সব দোকানপাট ও হোটেলগুলি। উপবেব প্রশস্ত রাস্তাটির নাম রিজ, আর গাছের যে সারি দেখেছি তা চেরি গাছ। সপ্তম এডোয়ার্ডের স্ট্যাচু দেখেছেন?

বললুম: খেয়াল কবি নি।

সরকারী অফিসের মাথায় পতাকা উড়তে দেখেছেন?

দেখেছি।

ওগুলো যে প্রার্থনার পতাকা তা লক্ষ্য করেছেন?

বললুম: না।

মিস্টার গিরি বললেন: সরকারী অফিসে লক্ষ্য করবার জিনিস আরও আছে। বাহিরের দেওয়ালে তিব্বতী অক্ষরে অনেক নক্সা করা আছে, ভিতরে আছে বৌদ্ধ মুনিদের মূর্তি। প্রবেশ পথের পাশের থামে জন্তু জানোয়ারের মাথার খুলি সাজানো আছে।

সরকারী অফিসে ভূতপ্রেতের অত্যাচার এড়াবার জন্তে এই ব্যবস্থা।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : এখনও এরা এ সবে বিশ্বাস করে।

মিস্টার গিরি বললেন : নিজের চোখে দেখলাম না তো, পরের কথা তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

আমি বললুম : ভুল হয়ে গেল আমাদের। আর একবার সেখানে গিয়ে বাহিরের দৃশ্যটা দেখে এলে ভাল হত।

মিস্টার গিরি বললেন : আপনার পেন ফ্রেণ্ডকে চিঠি লিখে সত্যি কথা জেনে নেবেন। ভুটানে নাকি কুসংস্কারের শেকড় আরও অনেক গভীর।

আমি বললুম : সেখানে তা খুবই স্বাভাবিক। মাত্র পাঁচ ছ বছর আগে তারা বিদেশীদের ঢুকতে দিয়েছে। তার আগে তো দেশের দরজা তারা বন্ধ করে রেখেছিল। উত্তরের গিরিবর্ত্ম দিয়ে তারা চাল বেচে নুন কিনতে যেত তিব্বতে, আর দক্ষিণে বাঙলা ও আসামে আসত লুটপাট করতে। সেদিন অবশ্য অনেক কাল আগে গত হয়েছে। এখন শান্তিপ্রিয় ভুটানীরা বাজার হাটে আসে শুধু ব্যবসা করতে।

স্বাতি বলল : এ অঞ্চলের কথা ভাল করে কেউ লেখে নি।

আমি বললুম : পার্সি ব্রাউনের লেখা একখানা ভাল বই আছে শুনেছি, তার নাম টুর্স্ ইন সিকিম। হিমালয়ান পিল্‌গ্রিমেজ নামে আরও দুখানা দিশী ও বিলেতী বই আছে।

মিস্টার গিরি বললেন : আপনি পড়েছেন এ সব বই ?

বললুম : হিমালয় সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু পড়ি নি। হিমালয় দেখতে বেরবার আগে সব পড়ে ফেলব।

এক জায়গায় আমাদের থামতে হল। লোকে লোকারণ্য পথ। তিল ধারণের আর স্থান নেই। আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ব্যাপার কী ?

মুখ বাড়িয়ে দেখে মিস্টার গিবি বললেন : হাট বসেছে। পাহাড়ী অঞ্চলে সপ্তাহে দু দিন করে হাট বসে। এ একটা উৎসবের মতো ব্যাপার। শুধু কেনাবেচা নয়, দেখা সাক্ষাৎ গল্প গুজব আনন্দ ফুর্তি সবই হয়। তা না হলে পাহাড়ী জীবনে আর কী বৈচিত্র্য আছে!

স্বাতি বলল : এরা কারা? নেপালী ভুটিয়া না তিব্বতী?

মিস্টার গিবি বললেন : সিকিমের আদিবাসী এরা, নাম এদের লেপচা। নিজেদের এরা বঙ্ বলে, আর তিব্বতীরা বলে মেরি। ইতিহাস বলে যে এরা আসাম ও ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ থেকে এ অঞ্চলে এসেছে। কিন্তু এরা তা স্বীকার করে না। বলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে এদের বাস ছিল। এদের মধ্যে অনেক গল্প প্রচলিত আছে—পৃথিবীর জন্ম মানুষের জন্ম ও লেপচা জাতির জন্ম নিয়ে নানা রকমের গল্প। জলময় সৃষ্টিতে কীভাবে মাটি এল, মানুষ এল, সমাজে পাপ এল কেমন করে, ভগবান তার কী শাস্তি বিধান করলেন, এসব গল্প সকল জাতির গল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

একটু থেমে বললেন : আমার ভাল লেগেছে একটি গল্প। দুই নদীর মিলনের গল্প সেটি। সিকিমের একটি বহু প্রচলিত প্রিয় গল্প।

আমাদের ড্রাইভার তখন জনতার ভিতর থেকে গাড়িটা বার করে এনেছিল। সামনে আর বাধা নেই দেখে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালাতে লাগল।

স্বাতি বলল : গল্পটা আমাদের বলবেন না?

মিস্টার গিবি বললেন : এ সব ছেলেমানুষি গল্প কি আপনাদের ভাল লাগবে?

আমি বললুম : নিশ্চয়ই লাগবে।

সহাস্যে মিস্টার গিবি বললেন : দুই নদী, একটি পুরুষ ও আর একটি নারী। নাম তাদের রঙ-নিত ও রঙ-নিও। বনের বাহিরে

সমতল ভূমিতে তাদের মিলন হবে কী করে সেই পরামর্শ তারা করল। সে জায়গার নাম হল পা-সঙ। রঙ-নিও একটি সাপকে বলল, পথ দেখিয়ে আমায় তুমি সেইখানে নিয়ে চল। সাপ বলল, চল। বলে সরসর করে সোজা গিয়ে পৌঁছল তাদের গন্তব্যস্থলে। তাকে অনুসরণ করে রঙ-নিও এসে রঙ-নিতের অপেক্ষা করতে লাগল। রঙ-নিতের খুব দেরি হচ্ছিল। সে একটা তিতির পাখীকে বলেছিল পথ দেখাতে। তিতির একবার এদিকে আর একবার ওদিকে উড়ে উল্টোপাল্টা পথে অনেক দেরিতে এসে পৌঁছল। রঙ-নিত এসে দেখল যে রঙ-নিও অনেক আগে এসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। খুশী না হয়ে সে গেল রেগে। বলল, আমি ফিরে যাব। বলে পিছন দিকে ফিরল ফিরে যাবার জন্যে। নদীর জল উঠল ফুলে, বন্যা এল পাহাড়ে। ডান-ডঙ নামে একটি লেপচা দম্পতি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রক্ষা পেল, আর সব মানুষ গেল জলে ডুবে। রঙ-নিও একজন পূজারীকে বলল, করছ কী, রঙ-নিতকে খুশী করবার জন্য একটা বলি দাও। পূজারী এই বলি দিতেই রঙ-নিত শান্ত হল, তার জল গেল নেমে। রঙ-নিও বলল, আমি মেয়ে, আমি নিচে তোমার অনুগত হয়ে থাকব, তুমি আমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হও। তারপরে মিলন হল দুই নদীতে, রঙ-নিওর উপর দিয়ে প্রবাহিত হল রঙ-নিত।

স্বাতি অনেক কৌতূহল নিয়ে বলল : এই দুই নদীর নাম তো শুনি নি!

মিস্টার গিরি বললেন : শুনেছেন বৈকি। এই যে নদীর ধার দিয়ে আমরা চলেছি, তারই নাম তো রঙ্-নি, তিস্তায় পড়েছে এই নদী।

তবে কি তিস্তার নাম রঙ-নিত?

মিস্টার গিরি বললেন : না। রঙ্গিতের নাম রঙ-নিত। এটি রঙ্গিতের সঙ্গে তিস্তার মিলনের গল্প। তিস্তা প্রবাহিত হচ্ছে নিচের উপত্যকা দিয়ে। আর রঙ্গিত সিঙ্গলিলা পাহাড়ের উপত্যকা দিয়ে

বয়ে এসে তিস্তার উপরে পড়েছে। তিস্তা প্রবাহিত হয়েছে সোজা সরল গতিতে। আর রঙ্গিতের প্রবাহ কুটিল। গল্পটি তাই সার্থক হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আমি বললুম : একটা বিলিতি বইএ আমি রঙ্নী নামে আর একটি নদীর নাম পড়েছিলুম। সিঞ্চল পাহাড় থেকে নেমে দার্জিলিঙের দশ মাইল দূরে সেই নদীটি রঙ্গিতের সঙ্গে মিলেছে। তার খাদ খুব গভীর। গর্জন শোনা যায়, কিন্তু জলস্রোত দেখা যায় না। রঙ্গিতের প্রবাহ সেখানে অনেক উপরে।

সবিস্ময়ে মিস্টার গিরি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : এই বইএ আরও একটি কথা পড়েছি। তাঁর মতে তিস্তার জল সমুদ্রের মতো সবুজ ও ঘোলা, আর রঙ্গিতের গাঢ় সবুজ জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আমরা কীরকম দেখলাম?

আমি বললুম : মনে নেই।

আমাদের গাড়ি তখন কালিম্পঙের দিকে সবেগে ছুটেছে।

২৩

কালিম্পঙ বাংলার শহর। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক আর শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে তার দূরত্ব প্রায় সমান, সাতচল্লিশ আর ছেচল্লিশ মাইল। দার্জিলিঙ থেকে পেশক রোড ধরে এলে দূরত্ব অনেক কম, মাত্র বত্রিশ মাইল। গ্যাংটকের উচ্চতা পাঁচ হাজার আটশো ফুট, কিন্তু কালিম্পঙের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি হল চার হাজার একশো ফুট। কাজেই কালিম্পঙের শীত তীব্র নয়, গরমও অসহ্য হয় না। সারাবছরই আবহাওয়া প্রায় নীতিশীতোষ্ণ।

রঙনি নদীর তীর ছেড়ে আমরা তিস্তার তীরে এসে পড়লুম। তারপরে সিকিমকে বিদায় দিলুম রাংপোতে। এবারে আমরা ক্রমাগত নিচে নামছি। তিস্তার পুল পর্যন্ত এমনি করেই নেমে যেতে হবে, কিন্তু সেই পুল আর পার হতে হবে না। বাম হাতে ফিরে আমরা কালিম্পঙের পথ ধরব। মাত্র দশ মাইল পথ সেখান থেকে। সুন্দর প্রশস্ত পথে তিন হাজার মাইল উপরে উঠতে একেবারেই কষ্ট হয় না। এ দুটো ভিন্ন পাহাড়। দার্জিলিঙের পাহাড় যত উঁচু, কালিম্পঙের পাহাড় তত উঁচু নয়। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে উত্তর বাঙলার প্রধান নদী তিস্তা।

বেলা এগারটার আগেই আমরা কালিম্পঙে পৌঁছে গেলুম। মিস্টার গিরি বললেন: আসুন, এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিই কোথাও, তারপরে আমরা শহর দেখব।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আমরা শিলিগুড়ি রওনা হব কখন?

মিস্টার গিরি বললেন: দুপুরে লাঞ্চ খাবার পরে। অন্ধকার হবার আগেই আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব। শিলিগুড়ি নয়, নিউ-জলপাইগুড়ি স্টেশনে আপনাদের বড় লাইনের ট্রেন। শিলিগুড়ি

থেকে খানিকটা দূরে সেই স্টেশন, তাই বলে জলপাইগুড়ি শহরের কাছে নয়।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: হাসছেন যে!

ভদ্রলোক বললেন: নতুন যাত্রীরা মারাত্মক ভুল করেন। জলপাইগুড়ি যাবার জন্যে নেমে যান নিউ-জলপাইগুড়িতে, তারপরে আবার আসতে হয় শিলিগুড়িতে। এখন শুনছি যে জলপাইগুড়ি শহরের কাছেও একটা বড় লাইনের স্টেশন হয়েছে, সে লাইন কুচবিহাবের উপব দিয়ে আসামের বনগাঁইগাঁও যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের যাত্রী এখন খেজুরিয়া ঘাটেই নিজেদেব ট্রেনে উঠবেন। শিলিগুড়িতে নামা চড়ার আর দরকার হবে না।

ড্রাইভার একটা পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। মিস্টার গিরি লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আমাদেরও নামতে অনুরোধ করলেন, বললেন: বেশি দেরি করব না, গলাটা ভিজিয়ে নিয়েই উঠে পড়ব।

কফি খেতে খেতে স্বাতি বলল: এখানে আমাদেব কী দেখাবেন?

মিস্টার গিরি বললেন: কালিম্পঙে দর্শনীয় স্থান বলতে একটি, তার নাম ডক্টর গ্র্যাহামের সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলোনিয়ান হোম্‌স্‌, সবাই বলে কালিম্পঙ হোম্‌স্‌। পথে আপনাকে তিব্বতী গোম্ফা দেখাব একটা।

স্বাতি বলল: কালিম্পঙ হোম্‌সের নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই শুনেছেন। ১৯০০ সালে রেভারেণ্ড ডক্টর গ্র্যাহাম য়ুরোপীয়ানদের অনাথ ছেলেমেয়ের জন্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন। শহরের উত্তরে দিওলো পাহাড়ের মাথায় এই হোম্‌স্‌, সাড়ে চার হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে চার শো একর জোড়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি নিজের চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। এখানে শুধু লেখাপড়া নয়, কারিগরি শিক্ষাও দেওয়া হয়।

কাঠের কাজ বোনার কাজ চামড়ার কাজ ধাতুর কাজ ছবি আঁকা সবই শেখানো হয়। যে সব সৌখিন জিনিস তৈরি হয় তা বিক্রির ব্যবস্থা কালিম্পঙ আর্টস্ ও ক্রাফ্‌ট্স্ এম্পোরিয়ামে।

কফি শেষ করার আগে মিস্টার গিরি বললেন: এই দিওলো পাহাড়ের নিচে আর একটি বাড়ি দেখাব আপনাকে। বাজার থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন ভুটানের প্রধান মন্ত্রী উগ্যেন দোরজি। চীনা সরকারের দৌরাত্ম্যে দলাই লামা একবার দেশ থেকে পালিয়ে এসে এই বাড়িতে সাড়ে চার মাস বাস করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর ব্যবহৃত একটি ঘর এখনও নাকি সসম্ভ্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি বললুম: দলাই লামা তো কাঙড়া উপত্যকার ধর্মশালায় আছেন শুনে এসেছি।

মিস্টার গিরি বললেন: আপনি তো এখনকার কথা বলছেন। এ ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটেছিল বলে শুনেছি। আপনার আমার জন্মেরও আগে, বোধহয় ১৯১২ সালে।

কফির পেয়ালা শেষ করে, স্বাতি পয়সা মেটাতে এগিয়ে গেল। মিস্টার গিরি উঠে ছুটে গেলেন, বললেন: ওকি করছেন! আমি এখানে ডিউটিতে এসেছি, খরচ পাব যে কোম্পানীর কাছে।

বলে নিজেই তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিলেন।

আবার আমরা গাড়িতে এসে বসলুম। এখান থেকে সোজা আমরা হোম্‌সে যাব। মিস্টার গিরি বললেন: বুধবার আর শনিবার এখানে হাট বসে। খুব বড় হাট, জমজমাট ব্যাপার। তিব্বতের সঙ্গে যখন বাণিজ্য চলত, তখন এই হাটের চেহারা অন্য রকম ছিল। জেলেপ লার ভিতর দিয়ে তিব্বতীরা চলে আসত এখানে। এখন সিকিমের সঙ্গেই শুধু সম্পর্ক আছে। অর্ধেক সিকিম রাজ্যের সঙ্গে এখন পাকা সড়কে কালিম্পঙের যোগাযোগ।

একটুখানি ঘুরে গিয়ে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের পথ ধরল। শহর এ দিকে বিস্তৃত হয় নি, পাহাড়ের গায়েও নেই বেশি ঘর বাড়ি। গাড়ি ঘোড়া লোকজনও দেখতে পেলুম না। মিস্টার গিরি বললেন: এই গোটা পাহাড়টিকেই কালিম্পঙ হোম্‌স্‌ বলতে পারেন; হোম্‌সে ওঠার জন্যেই এই রাস্তাটি তৈরি হয়েছে।

সত্যিই তাই। অনেকটা পথ উঠবার পরে আমরা দু একজন মানুষকে নামতে দেখলুম। তারপরে দেখলুম দু একটি ঘর বাড়ি। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের প্রায় চূড়াতেই পৌঁছে গেলুম। চূড়া নয়, মালভূমি একটি। বাঁধানো পথ ও বড় বড় অট্টালিকায় শহরের মতো মনে হল। একটি সুন্দর গির্জাও দেখতে পেলুম, আর দেখলুম খেলার ময়দান। আজ ছুটির দিন বলে সব বন্ধ আছে, ছেলেমেয়েরা ছাত্রাবাসে জটলা করছে।

পায়ে হেঁটে ময়দান পেরিয়ে আমরা উত্তরের দিকে চলে গেলুম। সেখান থেকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। কিন্তু উত্তরের আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বরফের পাহাড় আমরা দেখতে পেলুম না। মিস্টার গিরি বললেন: আমার কপালটাই মন্দ। না গ্যাংটকে, না কালিম্পঙে, কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

স্বাতি বলল: কপাল তো আমাদের মন্দ। আমরা কিছু দেখতে পেলাম না।

মিস্টার গিরি বললেন: সন্ধ্যার সময় দার্জিলিঙ পাহাড় দেখা যায় এখান থেকে। অন্ধকারে বাতি জ্বলে উঠলে মনে হবে যে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী পোকা বসেছে পাহাড়ের গায়ে। সেও এক অপরূপ দৃশ্য। এই পাহাড়ের নাম ঝাণ্ডিদাঁড়া, আর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়টির নাম দুরবীনদাঁড়া। সেখান থেকে তিস্তা নদী দেখা যায় অনেক নিচে।

হাল্কা মেঘের মতো কুয়াশায় দূরের গাছপালা মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছিল। রৌদ্রে উত্তাপ একেবারে নেই। নির্জন নিস্তব্ধ

চারিদিকের আবহাওয়া। ফিরে আসবার পথে স্বাতি বলল: ভারি অদ্ভুত জায়গাটি।

মিস্টার গিরি বললেন: ছুটির দিন না হলে আরও অনেক কিছু দেখতে পেতেন।

উগ্যেন দোরজির বাড়িতে একটি গোম্ফাও আছে। পাহাড় থেকে নামবাব সময় তা দেখতে পাওয়া গেল। আরও অনেক কিছু আমরা দেখলুম। বৃহৎ একটি গথিক গির্জা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গেট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জ মূর্তি। মিস্টার গিরি বললেন: এই তোরণটি কিন্তু তিব্বতী রীতিতে তৈরি। সিকিমের লামারা এসে কার্নিসেব কারুকার্য করেছিল।

আমি বললুম: কালিম্পঙের বাজার দেখাবেন না?

মিস্টার গিরি বললেন: আপনি কি শাকসব্জীর বাজার দেখবেন?

আমি বললুম: বাজার না দেখলে কোন শহব সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকে।

কাজেই আমাদের গাড়ি থেকে আবার নামতে হল। পায়ে হেঁটে আমরা বাজারের ভিতরে প্রবেশ করলুম। সব্জি নিয়ে পুরুষ বসে নি একজনও। সব মেয়ে, সারি দিয়ে তারা বসেছে হাত পা ছড়িয়ে, গল্প করছে অন্যের সঙ্গে। বাজারে এখন খদ্দের নেই। একনজরেই সব দেখতে পাওয়া গেল।

দোকানপাটের মধ্য দিয়ে অনেক দূর ঘুরে আমরা আবার গাড়ির কাছে ফিরে এলুম। মিস্টার গিরি ঘড়ি দেখলেন, বললেন: আর দেরি কেন, এবারে একটা হোটেলে যাওয়া যাক।

বলে ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পরে মিস্টার গিরি একটু বেরিয়ে গেলেন। বলে

গেলেন : আপনারা একটু বিশ্রাম করুন। আমাদের নতুন ব্রাঞ্চটা একবার দেখে আসি।

হোটেলের লাউঞ্জে আমরা বসেছিলুম। আর কেউ এখন এখানে নেই। গভীর মনোনিবেশে স্বাতি একখানা সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাতে লাগল।

সকৌতুকে আমি বললুম : মেজাজটা কিছু রুক্ষ মনে হচ্ছে।

স্বাতি বোধহয় এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। বলল : এমন জানলে আমি কিছুতেই আসতাম না।

কালিম্পঙে ?

কালিম্পঙে কেন, দার্জিলিঙে যত সব অশোভন ব্যাপার। এদের তুমি বুঝিয়ে বললে না কেন ?

ব্যাপারটা তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল। তবে তো আমি অন্যকে বোঝাব।

বেশ ভাল মানুষ সাজতে শিখেছ দেখছি। তোমার সঙ্গে যে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, সে কথাটা কেন প্রথম থেকেই চেপে যাচ্ছ ?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : তুমি চেপে যাচ্ছ বলে।

হাতের কাগজখানা নামিয়ে স্বাতি সোজা হয়ে বসল। বলল : মানে।

মানে খুবই সোজা। আমার বিপদের খবর পেয়ে তুমি দিল্লী থেকে উড়ে চলে এলে। যে টানে এলে তাকে অস্বীকার করি কেমন করে! তোমাকে তো অসম্মান করতে পারি নে। যে অসম্মান—

থাক আধিক্যেতা।

বলে স্বাতি আমাকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু আমি থামলুম না। বললুম : নতুন কিছু ঘটেছে নাকি ?

স্বাতি বলল : কালকের রাতের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। কী অভদ্র সব ইঙ্গিত, আর তুমি একবারও আপত্তি করলে না।

এইবারে আমি হেসে ফেললুম। গত রাত্রির কথা আমার মনে পড়ে গেল। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছিল, আর মিস্টার গিরি আমাদের সঙ্গে এক ঘরে শুতে মহা আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, এমন বেরসিকের কাজ করলে আমার স্ত্রী আমাকে ক্ষমা করবেন না। দোহাই আপনাদের, আমাকে বাইরে শুতে দিন।

সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। সত্যি কথা আমরা বলতে পারি নি, হাত ধরে বলেছিলুম, না না, তা হয় না, আপনি বাইরে পড়ে থাকলে ঘরে আমরা কিছুতেই ঘুমোতে পারব না।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে মিস্টার গিরি বলেছিলেন, খুব পারবেন।

তবু আমি তাঁকে যেতে দিই নি, তবু বলি নি সত্যকথা।

স্বাতি বলল : অসভ্যের মতো এখন হাসবেই তো।

আমি বললুম : এ অভিযোগ তোমার শিরোধার্য করি। ভক্তরা বলে যে দেবীর প্রসাদ পাওয়া যায় এর পরে।

স্বাতি রাগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। বলল : তোমার সৌজন্য তুমি দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছ, রুচির অভাব ঘটলে জীবনের সৌন্দর্য হবে নষ্ট।

অনুতপ্ত ভাবে আমি বললুম : আর তো একটি রাত। মেনে নাও এই অসম্মান।

স্বাতি বলল : অসম্মান নয় গোপালদা, আমি বলছি অভিনয়ের কথা। আর আমি অভিনয় করতে পারছি না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

স্বাতি বলল : আবার হাসছ!

তাহলে কী করব! সত্যকে যদি স্বীকার করতে না চাও তো মিথ্যাকেই সত্য বলে স্বীকার কর।

স্বাতি এবারে হেসে ফেলল, বলল : পেটে পেটে দুষ্টু-বুদ্ধি দেখছি। কলকাতায় ফিরে এবারে দেখাচ্ছি মজা।

তাহলে কলকাতায় কেন, গৌহাটিতেই চল না। সেখানে মজা দেখাবার সুযোগ পাবে বেশি।

মজা কি আমি দেখাব! দেখাবেন বাবা-মা। কলকাতায় আসছেন তাঁরা।

সত্যি নাকি!

বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। স্বাতি বলল: চল না কলকাতা।

মিস্টার গিরি ফিরতে বেশি দেরি করেন নি। গাড়ি থেকে নেমে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন: বিশ্রাম হয়েছে তো খানিকটা?

আমি বললুম: বিশ্রাম আর হল কোথায়! আপনি চ'লে যাবার পর থেকেই স্বাতি আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

সহাস্যে মিস্টার গিরি বললেন: কলহ লেগেই থাকে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ঘরে একটু-আধটু কলহ না হলে জীবনটা পানসে মনে হয়। কয়েক দিন নির্বিবাদে কাটলে আমি চেষ্টা করে কলহ বাধাই।

মিসেস গিরি কী বলেন?

আর বলেন কেন! তিনিও আজকাল চালাক হয়ে গেছেন। আমার মতলবটা বুঝতে পারলেই হেসে ফেলেন।

স্বাতি আর আমাদের অগ্রসর হতে দিল না, বলল: এখন কি আমাদের বেরুতে হবে?

আমি বললুম: বসে থেকে আর করব কী!

মিস্টার গিরি বললেন: এখন বেরিয়ে পড়লে সন্ধ্যার আগেই শিলিগুড়ি পৌঁছতে পারব।

গাড়িতে উঠে আমি বললুম: এক কাজ করলে হত না? দার্জিলিঙে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা শিলিগুড়ি যেতে পারি।

মিস্টার গিরি হেসে উঠলেন হো হো করে, বললেন: ঠিক

বলেছেন। শিলিগুড়িতে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি আর দার্জিলিঙ ফিরতে পারব না।

স্বাতি বলল: বাড়ি পৌঁছতে যে আপনার অনেক রাত হয়ে যাবে।

আর দার্জিলিঙ হয়ে গেলে যে আপনাদের ট্রেন ফেল হবে!

কাজেই আমাদের নীরব হতে হল।

সেই পরিচিত পথ। কালিম্পঙ থেকে তিস্তার পুল। পুল পেরিয়ে আমরা একটা চায়ের দোকানে দাঁড়ালুম। মিস্টার গিরির অনুরোধে চা খেতে হল। বললেন: শিলিগুড়ির আগে তো আর চা পাওয়া যাবে না, তাই এখানেই একটু খেয়ে নেওয়া যাক।

তিস্তার পুল থেকে ডান হাতে আমরা দার্জিলিঙের দিকে গেলুম না। বাঁ হাতে তিস্তার তীরে তীরে নতুন পথে অগ্রসর হলুম। প্রায় সমতল পথ। প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। ডান দিকে অন্ধকার অরণ্য। একে তরাই বলে না ডুয়ার্স, তা জানি নে। তরাই শব্দটা বেশি শুনি উত্তর প্রদেশের দিকে, বাঙলায় দুয়ার বা ডুয়ার্স কথাটাই প্রচলিত। ডুয়ার্সের চা-বাগান। এই চা শিল্পই উত্তর বাঙলা ও আসামকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আবার এই চা শিল্পের প্রসারের জন্যই বন্যজন্তু আশ্রয়চ্যুত হয়েছে। বড় বড় বন কেটে পরিষ্কার করে চা বাগান তৈরি হয়েছে। বন্যজন্তুরা আশ্রয় নিয়েছে গভীরতর বনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি দার্জিলিঙ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় বন্যজন্তুর কয়েকটি আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছেন। সিঞ্চল মহানন্দী গরুমারা চাপড়ামারি ও জলদাপাড়ায় শুধু বাঘ ভালুক হরিণ আর হাতি নয়, গণ্ডার ও অজগর সাপও দেখা যায় কোন কোন জায়গায়। রাত্রিবাসের জায়গা ও দেখাবার সুব্যবস্থা আছে বলে আজকাল অনেকে এই সব দেখতে যাচ্ছেন।

মিস্টার গিরি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শিকারের শখ আছে কিনা। আমি নেই বলেছিলুম। তারই উত্তরে এই খবর দিলেন মিস্টার গিরি। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন: মাছ ধরার শখ আছে?

এবারেও আমি হেসে বললুম: ধৈর্য নেই।

মিস্টার গিরি বললেন: মাছ ধরার খুব ভাল জায়গা রিয়াং নদী। একটু আগে আমরা ছেড়ে এলাম জায়গাটা। আর একটি ভাল জায়গা হল সিঙ্গলা, ছোট বড় রঙ্গিত আর রম্মস নদী এসে মিলেছে। পিকনিক করুন, আর মাছ ধরুন।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললেন: আসতে না আসতেই তো এবারে চলে গেলেন, এর পরে হাতে সময় নিয়ে আসবেন।

এই অঞ্চলের একটি উপজাতির কথা আমি শুনেছিলুম। তার নাম টোটো। বাঙলা সরকার নাকি এই উপজাতিটিকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছেন। একটি গ্রামে তাদের বাস, জনসংখ্যা পৌনে চারশোর কম। মিস্টার গিরিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: আমাদের দার্জিলিঙ জেলায় এ রকমের কোন উপজাতি নেই, বোধ-হয় জলপাইগুড়ি জেলায় আছে।

আমি বললুম: এরা কিন্তু নেপালী বা ভুটিয়াদের মতো হিমালয়েরই মানুষ।

মিস্টার গিরি অস্বীকার করলেন না। বললেন: তা হবে।

বেগে অগ্রসর হচ্ছিল আমাদের গাড়ি, আর বনভূমি হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। আমরা যে শস্যশ্যামল সমতলভূমির দিকে চলেছি তা বুঝতে পারছিলুম।

এক সময় আমরা সেবকের পুল দেখতে পেলুম। এই পুল পেরিয়ে আসামের দিকে যাওয়া যায়। কিন্তু আমরা তিস্তার ওপারে গেলুম না, সোজা পথেই নেমে আসতে লাগলুম।

রেলের পুলটি কিছু নিচে। ঐ পথে মিটার গেজের ট্রেন শিলিগুড়ি

থেকে আসামের দিকে যায়। আমরা শিলিগুড়ি যাব ঐ লাইন পেরিয়ে।

দেখতে দেখতে পাহাড় শেষ হয়ে গেল। সমতল ভূমির উপরে আমরা নেমে এলুম। শালের বন বেশি অন্ধকার ঘনিয়ে রাখতে পারে নি। আমরা মিলিটারির ছাউনি দেখতে পাচ্ছিলুম মাঝে মাঝে। তাদের তাঁবু ও যানবাহন সমস্ত এলাকাটিতে ছড়িয়ে আছে।

শিলিগুড়ি শহরটি আর আগের মতো নেই। সেই শান্ত নিরিবিলি শহরটি এখন প্রয়োজনের তাগিদে সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকে। অসংখ্য বাড়ি হয়েছে নতুন, দোকানপাটের অন্ত নেই। এই শহর যে রাতা-রাতি গড়ে উঠেছে, সর্বত্র তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা কিন্তু শিলিগুড়িতে নামলুম না। আমাদের গাড়ি এসে নিউ-জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়ালো।

কয়েকজন যাত্রী হুড়মুড় করে ছুটে এসেছিল। ভেবেছিল বুঝি ভাড়াটে গাড়ি। ড্রাইভারের তাড়া খেয়ে তারা ফিরে গেল।

মিস্টার গিরিকে আমি ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করলুম। কিন্তু মিস্টার গিরি বললেন: তা কি হয়, একটু চা খেয়ে যাব না!

এ যে তাঁর ছল, তা আমি বুঝি। কিন্তু চা খেয়ে তাঁকে বিদায় দেবার সময় স্বাতির চোখ ছলছল করে উঠল। মিস্টার গিরি তাঁর চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। পকেট থেকে দুখানা টিকিট বার করে আমার হাতে দিলেন। আর এক তাড়া নোট। আমি বললুম: টাকার দরকার নেই।

মিস্টার গিরি আর অপেক্ষা করলেন না, কথাও বললেন না কোনও। পিছন ফিরে হনহন করে চলে গেলেন।

আমি বললুম: পালিয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু সে কথা যে গলায় আটকে গেল তাও বুঝতে পারলুম।

২৫

রাত্রির আহারের পর কলকাতাগামী দার্জিলিঙ মেল ছাড়ল। ভোর বেলায় খেজুরিয়া ঘাটে পৌঁছবে। স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে ফরাক্কা থেকে কলকাতার ট্রেন, শেয়ালদহে পৌঁছবে বিকেল বেলায়। ফরাক্কার উপরে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এই বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে তার উপরে রেললাইনও বসবে। তখন আর স্টিমারে গঙ্গা পার হবার প্রয়োজন থাকবে না। আর এত দেরি করেও ছাড়বে না দার্জিলিঙ মেল। রাত আটটায় ছেড়ে সকাল আটটায় হয়তো কলকাতা পৌঁছে দেবে। ঘুমিয়ে আমরা ফরাক্কার বাঁধ পার হয়ে যাব। যাত্রীদের ঘুমোতে দেবার জন্যেই আজকাল দেরিতে ট্রেন ছাড়ছে, আর ভোর বেলায় পৌঁছে দিচ্ছে গঙ্গার ধারে।

ট্রেন ছাড়বার অনেক আগেই আমরা গাড়িতে এসে উঠেছিলুম। দুখানা নিচের বার্থ পেয়েছি। আরও দুজন ভদ্রলোক আমাদের গাড়িতে এলেন। একজন কলকাতায় যাবেন আর একজন নামবেন মালদহে। রাত চারটে নাগাদ এই ট্রেন মালদহে পৌঁছবে। তখন শেষরাত, অনেক সময় নাকি সকাল হয়ে যায়।

স্বাতি আমার দিকে কেন তাকিয়েছিল আমি জানি। এই ভদ্রলোকের কাছে মালদহের খবর পাওয়া যাবে। ট্রেন ছাড়তে তখনও দেরি ছিল বলে আমি প্রসঙ্গটা তুলে ফেললুম। বললুম: উত্তরবঙ্গে এই দার্জিলিঙ ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু সাড়া দিলেন আমার কথায়। বললেন: এ আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা।

যিনি কলকাতায় যাবেন, তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে বাইরে ছুটোছুটি করছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক মালপত্র আছে, সঙ্গীরা যাচ্ছে অন্য গাড়িতে। বোধহয় ব্যবসা আছে শিলিগুড়িতে। সেইজন্যেই এই

ব্যস্ততা। খোলা দরজাটা ঠেলে ভেজিয়ে দিয়ে আমি বললুম: সাধারণ যাত্রীরা আসে তীর্থের টানে, ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতেও আসে অনেকে। কিন্তু উত্তর বাঙলায় সেরকম দ্রষ্টব্য কী আছে?

ভদ্রলোকের হাতে একখানা সাময়িক পত্র ছিল, তিনি সেখানা মুড়ে রাখলেন। তারপরে বললেন: বাঙলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্থান হল গৌড় ও পাণ্ডুয়া। আপনারা বোধহয় দেখেন নি এ দুটি স্থান।

আমি স্বীকার করলুম যে সত্যিই দেখি নি।

ভদ্রলোক বললেন: বুঝতে পেরেছি যে দেখেন নি বলেই এমন একটা মন্তব্য করে বসেছেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: গৌড়-পাণ্ডুয়ার নাম শুনেছি, কিন্তু কোথায় তা জানি নে।

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন: মালদহে।

মালদহ শহরে, না সেখান থেকে দূরে যেতে হয়!

আমি নিজে দেখি নি, তাই কত দূরে বলতে পারব না। তবে গাড়ি করে একদিনেই যে এ দুটো জায়গা দেখে আসা যায়, তা জানি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

বললুম: কলকাতায়।

যদি কাজের ক্ষতি না হয় তো কাল দিনের বেলায় দেখে যান না। বিকেলে পাবেন কলকাতার গাড়ি, ভোর বেলাতেই পৌঁছে যাবেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর ভদ্রলোক বললেন: আপনি ঐতিহাসিক স্থানের কথা বললেন বলেই এই পরামর্শ দিলাম। গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখতে তো কখনও আসবেন না, এই সুযোগে নেমে পড়লে দেখা হয়ে যাবে।

আমি বললুম: তা ঠিক।

আর স্বাতি বলল: কলকাতায় রাতে পৌঁছনোর চেয়ে সকালে পৌঁছনোই ভাল।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরা মালদহে নামব, তিনিই আমাদের সময় মতো জাগিয়ে দেবেন।

কিন্তু আলোচনার শেষ এইখানে হল না, ভদ্রলোক বললেন: উত্তর বাঙলায় কোন তীর্থস্থান নেই বলছিলেন, তাও ঠিক নয়। দূর দূর দেশে আমরা তীর্থ করতে যাই, কিন্তু ঘরের কাছের তীর্থস্থানের মহিমা জানি না।

আমি নীরবে ছিলুম। ভদ্রলোক বললেন: জল্পেশ্বরের নাম শোনেন নি?

শুনেছি। কিন্তু জানি না বিশেষ কিছু।

ভদ্রলোক বললেন: সম্ভব হলে শিবরাত্রির সময় একবার যাবেন। বুঝতে পারবেন যে বৈদ্যনাথ বা বিশ্বনাথের চেয়ে জল্পীশ কম যাত্রী আকর্ষণ করেন না। মেলা হয় একমাস ব্যাপী, আর সেই মেলায় জীবজন্তু ভুটিয়া কুকুরও আমদানী হয়। হরিহর ক্ষেত্রের মতো বলব না কিন্তু বাঙলা দেশের আর কোথায় এমন মেলা হয় তা আমার জানা নেই।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এই জল্পেশ্বর শিব কি জলপাইগুড়িতে?

ভদ্রলোক বললেন: না। জলপাইগুড়ি থেকে অনেকটা দূরে। তিস্তার পশ্চিম তীরে জলপাইগুড়ি শহর, আর পূর্ব পারে বার্নেস ঘাট। বার্নেস ঘাট থেকে জল্পেশ্বরের বাস যায়। ময়নাগুড়ি স্টেশন থেকেও বাস ছাড়ে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়।

প্রবাদ আছে যে প্রায় দু হাজার বছর আগে প্রাগজ্যোতিষপুরের এক রাজা গভীর বনের মধ্যে এই অনাদি শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। তিনি যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তা ভেঙে পড়েছিল। প্রায় তিনশো বছর আগে কুচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেন। এই মন্দিরকে সংস্কার করে বর্তমান রূপ দিয়েছেন জল্পেশ টেম্পল কমিটি। কালিকা পুরাণে এই শৈবপীঠের উল্লেখ আছে, আর শিব শতনাম স্তোত্রেও আছে জল্পেশ্বরের নাম।

ভদ্রলোক বললেন: মন্দিরটি মস্ত বড়, কিন্তু শিবের দর্শন পেতে হলে মন্দিরের ভিতরে ধাপে ধাপে অনেক নিচে নামতে হয়।

স্বাতি বলল: সোমনাথে আমরা এইরকম দেখেছিলাম, তাই না?

ভদ্রলোক বললেন: সোমনাথ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নি। তাই সোমনাথের সঙ্গে তুলনা করতে পারব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোন পৌরাণিক মাহাত্ম্য নেই জল্পেশ্বরের?

ভদ্রলোক বললেন: আমার জানা নেই।

সেইজন্যেই এই তীর্থের নাম চারিদিকে ছড়ায় নি। বিশ্বাসের উপরেই আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মবিশ্বাসেই দেবতার মাহাত্ম্য দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়। জল্পেশ্বরের প্রতিষ্ঠার পিছনে সত্যযুগের কোন পৌরাণিক কাহিনী নেই, ত্রেতা ও দ্বাপরের মহানায়ক অথবা কোন ঋষি বা অসুরের উপাসনার কথা নেই, পীঠস্থান নয়, নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করে তীর্থের মাহাত্ম্য আজও লেখা হয় নি। জল্পেশ্বর তাই আজও উত্তরবঙ্গবাসীর কাছেই পরিচিত। তাঁর আকর্ষণ নেই সমগ্র ভারতের হিন্দু অধিবাসীর কাছে।

পরে আমি অনুসন্ধান করে জেনেছিলুম যে কুব্জিকাতন্ত্রের মতে জল্পেশ্বরও একটি পীঠস্থান। দেবীর নাম ত্রিশূলিনী ও শিব ত্রিশূলী। সতীর কোন্ অঙ্গ এখানে পড়েছিল তার উল্লেখ নেই। সাধারণভাবে আমরা যে একান্ন মহাপীঠ ও ছাব্বিশ উপপীঠ জানি, তার মধ্যে জল্পেশ্বরের নাম নেই। কিন্তু আর একটি মহাপীঠের নাম পাওয়া যায় করতোয়া তট। সতীর বাম কর্ণ সেখানে পড়েছিল। করতোয়া উত্তরবঙ্গের নদী। শহর বা গ্রামের নামের উল্লেখ নেই। দেবী এখানে অপর্ণা ও শিব বামেশ। ত্রিস্রোতাও একটি মহাপীঠ। ত্রিস্রোতা তিস্তা নদীর নাম। দেবীর দক্ষিণ জানু পড়েছিল ত্রিস্রোতায়। দেবী চণ্ডিকা ও শিব সদানন্দ। অনেকে বলেন যে

বগুড়া জেলার ভবানীপুরও একটি পীঠস্থান। কিন্তু পীঠস্থানের তালিকায় তার নাম নেই। করতোয়া নদীর তীর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বলে তাঁরা মনে করেন যে কোন সময় এই পীঠস্থানই ছিল করতোয়া তটে। পীঠস্থানের এমন অনেক নাম আছে যে নাম আমাদের কাছে পরিচিত নয়, ভারতের মানচিত্রেও তার উল্লেখ নেই। সে সব স্থান কোথায়, তা আবিষ্কার করবার চেষ্টা বোধহয় কেউ করেন নি। পুরাণের বর্ণনা মিলিয়ে এ সব স্থান খুঁজে বার করা বোধহয় কঠিন নয়। পুরাতাত্ত্বিকেরা তো ঐতিহাসিক স্থানগুলো একে একে খুঁজে বার করছেন। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার মতো প্রাচীন শহরও মাটি খুঁড়ে বার করা সম্ভব হয়েছে।

খানিকক্ষণ থেমে ভদ্রলোক বললেন: তীর্থস্থানের আকর্ষণ আজকাল দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সে এক দিন ছিল যখন পায়ে হেঁটে লোকে তীর্থযাত্রা করত, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, দুর্গম পর্বতে গভীর অরণ্যে ও সমুদ্র তীরে। কিন্তু মানুষ এখন কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হয়েছে। কেদারনাথের বদলে বিশ্বনাথ দর্শনে যাচ্ছে। তাতে শুধু কায়িক পরিশ্রম বাঁচে না, একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা হয়। বিশ্বনাথ দর্শনের পরে বিশ্বনাথ গলি থেকে বেনারসী শাড়ি কিনে ফেরা যায়। বৈদ্যনাথ দর্শনে গেলে হাওয়া বদলটাও হয়। কিন্তু জল্পেশ্বরে গেলে তো সে সব কিছু হয় না, শুধু পরিশ্রমটাই সার হয়।

স্বাতি বলল: মন্দিরের স্থাপত্যকলা কি যাত্রীকে মুগ্ধ করে না?

ভদ্রলোক বললেন: না। দুটো প্রমাণ আকারের হাতির শুঁড়ের উপরে মহাদেব বসে আছেন। তা দেখে গ্রামবাসীরা তাকিয়ে থাকে, কিন্তু শিল্পরসিকের মন ভরে না। শিল্পরসের সন্ধানী হলে চলে যাবেন পাহাড়পুরে।

পাহাড়পুর!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আমাকে কিছু

বলতে হল না। ভদ্রলোক নিজেই লেন: পাহাড়পুর রাজসাহী জেলায়। সেখানে একটি প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এত বড় বৌদ্ধ বিহার বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি দেখেছেন এই জায়গাটি?

ভদ্রলোক বললেন: দেখেছি শৈশবে, বাঙলা দেশ বিভক্ত হবার আগে।

তবে আপনার নিশ্চয়ই কিছু মনে আছে?

যা মনে আছে, তার চেয়ে বেশি ভুলে গেছি। এখন পাহাড়পুরের কথা ভাবতে গেলে চোখের সামনে একটা বিরাট মাঠ ভেসে ওঠে, তার স্থানে স্থানে ইটের ভিত মাটির উপরে জেগে আছে। এক জায়গায় তিনটি স্তূপের নিম্ন ভাগের পিছনে একটি টিলা দেখেছিলাম। সেইটিই নাকি পাহাড়পুরের মন্দির।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এ সব কতদিনের পুরনো?

অসঙ্কোচে ভদ্রলোক বললেন: তা জানি নে।

স্বাতি এবারে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: অষ্টম শতাব্দীর শেষে ধর্মপাল একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্তমান পাহাড়পুরের নিকটে সোমপুরে।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন: ওমপুর নামে একটি গ্রাম এখনও আছে।

আমি বললুম: তিব্বতী লেখক তারানাথ বলেছেন যে পাল-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে ধর্মশিক্ষার জন্য পঞ্চাশটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় নাম ছিল বিক্রমশীল, এই নামে মগধে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ে অবস্থিত এই বিহারটি নালন্দার মতো দেশে ও বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বরেন্দ্রভূমিতে তিনি স্থাপন করেছিলেন সোমপুর বিহার। সত্যিই নাকি এত বড় বিহার

ভারতবর্ষে আর ছিল না, কিন্তু এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমরা জানি নে।

কেন?

পণ্ডিতরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

স্বাতি বলল: তোমার কিছু মনে হয় নি?

আমার মনে হয়েছে যে সোমপুর বিহার আর কিছু প্রাচীন হলে আমরা তার লিখিত বিবরণ পেতুম। এই বিহার প্রতিষ্ঠার অনেক আগে চীন পরিব্রাজকেরা এদেশে এসেছিলেন। ফা হিয়েন এসেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়, আর হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এসেছিলেন হিউএন চাঙ। এঁরা এসে সোমপুর বিহার দেখতে পেলে আমরাও এই বিহারের বিষয় জানতে পেতুম। মাটি খুঁড়ে যা বেরিয়েছে, তার থেকে ইতিহাস রচনা করা কি সহজ কথা!

ভদ্রলোক বললেন: পাহাড়পুরে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন?

স্বাতি বলল: না।

কিন্তু আমি উত্তর দিলুম: দেখেছি।

খুব সুন্দর মূর্তি নয়?

সবগুলিকে সুন্দর বলব না।

তারপরে স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললুম: পাহাড়পুরের কিছু মূর্তির ছবি নিশ্চয়ই দেখেছ। সাময়িক পত্রে এর আলোচনা বেরিয়েছে। মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই করা মূর্তি ও পোড়া মাটির যেসব ফলক পাওয়া যায়, তাই হল বাঙলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের প্রথম নিদর্শন। বেশির ভাগই লোকশিল্পের নমুনা—তাতে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, কৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর লীলা, দেবদেবী দৈত্য দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও নাগ, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্র, এমন কি পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎ কথার হাসির গল্পও খোদাই করা

আছে। এগুলি উঁচু দরের শিল্পের নমুনা নয়, লোকশিল্প বলতে যে অস্বাভাবিক লাবণ্যহীন নিকৃষ্ট শিল্প বোঝায় ঠিক তাই।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন: কিন্তু আমি যে সব মূর্তি দেখেছি, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীব শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

আমি হেসে বললুম: আপনার কথাও ঠিক। পাথরে খোদাই করা এই সব মূর্তির সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু বাঙলা দেশে তখন যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীও ছিল, এই সব মূর্তি তাবই প্রমাণ দিচ্ছে। কৃষ্ণের কেশী বধ, যমুনা বা সেই বহুবিতর্কিত বাধাকৃষ্ণের মূর্তি —ভারতের যে কোন মন্দির ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয়।

স্বাতি বলল: রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বহুবিতর্কিত কেন?

অনেকে বলেন যে বাঙলায় তখনও রাধার জন্ম হয় নি, তাই কৃষ্ণের এই যুগল মূর্তি রুক্মিণী বা সত্যভামার সঙ্গে, রাধার সঙ্গে নয়। আবার অনেকে এ কথা মানেন না। তাঁদেব মতে এইটিই রাধাকৃষ্ণের প্রাচীনতম যুগলমূর্তি।

পাহাড়পুরে আরও এক রকমের মূর্তি আছে. তাতে লোকশিল্পের সঙ্গে এই অভিজাত শিল্পের মিশ্রণ হয়েছে অদ্ভুত ভাবে। কেন এ বকম হয়েছে, তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়।

আমি থামতেই আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক একটা অন্য প্রশ্ন করে বসলেন: আপনি মহাস্থান গড়ের কথা কিছু জানেন?

বললুম: সে স্থানটিও তো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বগুড়ার সাত মাইল দূরে এই মহাস্থান গড়, পণ্ডিতরা বলেন যে এইটিই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ। পুণ্ড্র একটি উত্তরবঙ্গের প্রাচীন জাতি, এবং এক সময় পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্ধন বললে গঙ্গার পূর্বে সমগ্র বাঙলাকেই বোঝাত। এই দেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন! বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে উত্তরবঙ্গে আরও একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মাঝে। সে জায়গার বর্তমান অবস্থান আমার জানা নেই।

আমাদের ট্রেন ছাড়ার বিলম্ব ছিল না, কিন্তু সহযাত্রী আর একজন ভদ্রলোক এখনও ফিরে আসেন নি বলে দরজা বন্ধ করতে পারছিলুম না। একটা ঘণ্টাও পড়ল। তাই শুনে ভিতরের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু উপরের বাঙ্কে উঠবার আগে বললেন: দিনাজপুরে বাণগড় নামে একটা জায়গার নাম শুনেছি। সেটিও কোন ঐতিহাসিক স্থান নাকি?

উত্তরে আমি বললুম: কোটিবর্ষ বিষয় একটি প্রাচীন স্থান বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। কিন্তু অসুররাজ বাণের রাজধানী ছিল কিনা, তা কেউ বলতে পারে না। এ অঞ্চলের লোক অবশ্য তাই দাবী করে। বলে যে আসামের তেজপুরের লোকেরা মিথ্যা প্রচার করে যে তেজপুর বা শোণিতপুর ছিল বাণরাজার রাজধানী।

আমি আর বেশি কিছু বলবার অবকাশ পেলুম না। গাড়ি চলতে শুরু করতেই বাহিরের ভদ্রলোক এসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তখনও বোধহয় তাঁর কাজ শেষ হয় নি, তাই চেঁচিয়ে আরও কিছু নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত দরজা তাঁকে বন্ধ করতেই হল।

স্বাতি বলল: আর দেরি নয়, শেষরাতে আবার উঠতে হবে তো।

বলে আমাকে সাহায্য করল শুয়ে পড়তে। সকলের পরে বাতি নিবিয়ে সে শোবে।

শেষ রাতে যখন আমার ঘুম ভাঙল, গাড়ির অন্য যাত্রীরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নীল বাতিটা এখন বেশ তীব্র মনে হচ্ছে। সেই আলোয় আমি ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করলুম।

স্বাতি যে জেগে ছিল তা বুঝতে পারলুম তার কথা শুনে। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল : ঘুম ভাঙল !

তারপরে একটা বাতি জ্বেলে সময়টা দেখে নিয়েই আবার সেটা নিবিয়ে দিল।

আমি বললুম : সকাল হয় নি বুঝি।

স্বাতি বলল : মালদহ পৌঁছবার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম : নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু উপরের ভদ্রলোক যে ঘুমিয়ে রইলেন !

খেজুরিয়াঘাট থেকে তিনি ফিরে আসতে পারবেন। বাস যাতায়াত করে শুনেছি। ট্রেন তো আছেই।

উপর থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন : তার দরকার হবে না, মালদহ এখনও আমরা পৌঁছই নি।

আমি লজ্জা পেলুম তাঁর কথা শুনে, বললুম : আপনি যে জেগে আছেন তা বুঝতে পারি নি।

ভদ্রলোক বললেন : সাড়াশব্দ না দিলে কী করে পারবেন !

বলে উঠে বসলেন বাঙ্কের উপরে, আর আমাদেরও উপদেশ দিলেন উঠে পড়তে, বললেন : ঘুম যখন ভেঙেছে, তখন বিছানা পত্র বেঁধে ফেলতে পারেন। মালদহ পৌঁছতে আর দেরি নেই।

তাঁর পরামর্শ মতো আমরাও উঠে পড়লুম। স্বল্প আলোয় স্বাতি

আমাদের বিছানাও বেঁধে ফেলল। উপর থেকে ভদ্রলোক নামলেন না, বললেন: ব্যস্ত হবার দরকার নেই। মালদহে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, আর কলরবে ঘুম আপনার ভাঙবেই।

তারপরে বললেন: এদিকের ট্রেন এমনি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, খেয়াঘাটে তবু ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

গাড়ির গতি বেশ মন্থর হয়ে এসেছিল, এবারে গমগম করে ঢুকে পড়ল একটা স্টেশনের ভিতরে। ভদ্রলোকও অমনি তড়াক করে উপর থেকে নেমে পড়লেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: পৌঁছে গেলুম নাকি?

ভদ্রলোক তাঁর কাপড় জামা সামলে বললেন: হ্যাঁ।

তারপরেই ব্যস্তভাবে ছিটকিনি সরিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। গাড়ি না থামতেই হাঁক দিলেন: কুলি, এই কুলি।

সারিবদ্ধ ভাবে কুলিরা দাঁড়িয়ে ছিল, হাতল ধরে একজন উঠে পড়ল। নিজের জিনিসপত্র তাকে বুঝিয়ে দিয়েই ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে নেমে গেলেন। বাহির থেকে বোধহয় নমস্কার করেছিলেন হাত তুলে, স্বাতির প্রতিনমস্কার আমি দেখতে পেলুম।

ধীরে সুস্থে আমরাও নামলুম।

স্বাতি বলল: চল একটা হোটেলে।

আমি বললুম: হোটেলের চেয়ে ওয়েটিং রুম বোধহয় এখানে পরিচ্ছন্ন হবে।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করল না, বলল: দেখা যাক ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা খুব ভাল নয়, কিন্তু মফস্বল শহরে হোটেলের ব্যবস্থা আরও মন্দ হতে পারে, ভেবে ওয়েটিং রুমেই আমরা আশ্রয় নিলুম। মুখ হাত ধুয়ে ক্লোক রুমে মালপত্র জমা করে আমাদের বেরতে হবে। তার আগে ফরাক্কা থেকে রাতের গাড়িতে একটু জায়গার চেষ্টাও করতে হবে। রাতে ঘুমিয়ে যাতে কলকাতায় পৌঁছতে পারি।

কিন্তু এই জায়গা পেলে যে একটা কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তখন তা বুঝতে পারি নি।

একজন একজন করে আমরা তৈরি হয়ে নিলুম, তারপরে বেরিয়ে দেখলুম যে প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। স্বাতি বলল: মালপত্র আগে জমা করে দিই, তারপরে চায়ের ভাবনা ভাবব।

আমরা তাই করলুম। কিন্তু কোন রিফ্রেসমেণ্ট রুম দেখতে পেলুম না। তাই প্ল্যাটফর্মের একটা খাবারের দোকানেই কিছু খেয়ে নিলুম।

স্বাতি বলল: তোমার শরীরে কোন কষ্ট নেই তো?

না থাকলে কী করবে?

মনের আনন্দে বেরিয়ে পড়ব।

বললুম: তাহলে তাই করবে চল।

কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ যে বাকি আছে। ফরাক্কা থেকে আমাদের রিজার্ভেসন চাই।

আব এখানকারও খবর নিতে হবে। সব কিছু দেখবার জন্যে একটা বাহন চাই তো!

রেলের লোকের সঙ্গে দেখা করে সে ব্যবস্থাও হল। আমাদের টিকিটের পিছনে ব্রেক জার্নি লিখে ফরাক্কায় তারা তার করে দিল। আর খবব দিল যে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলে চার পাঁচ ঘণ্টায় সব দেখিয়ে দেবে। ভাড়া দিতে হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা।

কিন্তু ট্যাক্সি কোথায় পাব?

স্টেশনের বাইরে না পেলে রিক্সায় করে ইংলিশ বাজারে চলে যাবেন।

সে আবার কোথায়?

মালদা হল স্টেশনের নাম, আর শহরের নাম ইংলিশ বাজার। ইংরেজ বাজারও বলতে পারেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : মালদহ নামে কোন শহর নেই ?

আছে, সে পুরনো মালদা। ওল্ড মালদা স্টেশনও আছে।

তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা স্টেশনের বাহিরে চলে এলুম।

কিন্তু ট্যাক্সি নেই, আছে খানকয়েক রিক্সা। তারই একটির উপরে চড়ে বসে স্বাতি আমাকে ডাকল : এস।

নিঃশব্দে আমি উঠে বসলুম।

রিক্সাওয়ালাকে স্বাতি বলল : আমাদের একটা ট্যাক্সি চাই, ট্যাক্সির আড্ডায় নিয়ে চল।

চলতে চলতে রিক্সাওয়ালা বলল : আপনারা কি গৌড় দেখবেন ? আমি আপনাদেব দেখিয়ে আনতে পারি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা কবল : পথ কত ?

দশ মাইল।

আর পাণ্ডুয়া ?

এগারো।

একই দিকে ?

রিক্সাওয়ালা বলল : উল্টো দিকে। গৌড় দক্ষিণ পশ্চিমে, আর পাণ্ডুয়া উত্তর পূর্বে। আজ গৌড় আর কাল পাণ্ডুয়া আপনাদের দেখিয়ে দেব। একটা একটা করে চিনিয়ে দেব সব জায়গা।

স্বাতি বুঝতে পেরেছিল যে রিক্সায় চেপে গৌড় পাণ্ডুয়া দেখা এক দিনের কাজ নয়। তাই বলল : থাক।

'মহানন্দা নদীর উপরে মালদহ শহর। কালিন্দী নামে আর একটি নদী এসে পুরনো মালদহের কাছে মিলেছে। ইংরেজ বাজার থেকে সে স্থান প্রায় মাইল দুই দূরে। ইতিহাসে আমি পড়েছিলুম যে গঙ্গার তীরে ছিল প্রাচীন গৌড়। কিন্তু বর্তমান মানচিত্র অন্য রকম দেখি। গঙ্গা সরে গেছে মাইল পঁচিশেক দক্ষিণে। গৌড় যখন বাঙলার রাজধানী ছিল, তখন এই গঙ্গা অনেক উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হত। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ছিল গৌড়

নগর। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বোধহয় এই রকমই ছিল। তখন গঙ্গার জল বয়ে যেত ভাগীরথী দিয়ে। এখনকার মতো তার প্রধান প্রবাহ পদ্মা দিয়ে বইত না।

ট্যাক্সি পেতে আমাদের অসুবিধা হল না। গৌড় পাণ্ডুয়া দেখাবার জন্য পঁয়ত্রিশ টাকা দাবী করল। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বললুম: দরাদরি আমরা করব না। কিন্তু কাজের কথা আগেই জানিয়ে রাখি। সঙ্গে আমাদের গাইড নেই, দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর একটা ভাল হোটেলে দুপুরের খাওয়া খাইয়ে স্টেশনে পৌঁছতে হবে।

ড্রাইভার এক কথায় রাজী হয়ে গেল। মনে হল যে আমরা বোধহয় কিছু বেশি ভাড়া কবুল করলুম। কিন্তু স্বাতি খুশী হয়েছিল। বলল: এ বেশ ভাল ব্যবস্থা হল। দুপুরে একটু বিশ্রামও হবে।

শহর ছাড়িয়ে আমরা প্রশস্ত রাজপথ ধরে অগ্রসর হলুম। বাঙলার প্রধান পথ এটি, নাম ন্যাশনাল হাইওয়ে। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরের উপর দিয়ে ফরাক্কায় পৌঁছেছে, ফরাক্কার বাঁধ এখনও হয় নি বলে নৌকোয় গঙ্গা পারাপার করতে হয়। ওপারে খেজুরিয়া ঘাট থেকে মালদহের উপর দিয়ে এই পথ শিলিগুড়ি গেছে। গ্যাংটক থেকে এই পথেই আমরা শিলিগুড়ি এসেছি। ইচ্ছা করলে এই পথের উপরে তিস্তানদীর পুল পার হয়ে আমরা আসামে যেতে পারতুম। ব্রহ্মপুত্র পার হতে হত গোয়ালপাড়ায়। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে দেশরক্ষার প্রয়োজনেই এদেশে পথ ঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

হেমন্তের হাওয়া বইছে নির্জন পথে। মিষ্টি বাতাস। সূর্য উঠেছে গাছপালার পিছনে, উত্তাপ নেই তার আলোয়। একটুখানি শীত যেন শিরশির করছে। পরিবেশটা স্বাতি একবার দেখে নিল, তারপরে বলল: আজকের এই সকালটা পুরনো সকালের মতো মনে হচ্ছে না।

আমি বললুম : একটুখানি নূতনত্ব আছে যে!

মুখ ফিরিয়ে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম : দুজনে এমন করে কি আগে বেরিয়েছি!

স্বাতি বলল : সত্যি তো! কিন্তু এ কথা আমার মনে হয় নি কেন!

সম্বন্ধ আমাদের সহজ হয়ে গেছে বলে। পরস্পরের সম্বন্ধ কৃত্রিম হলেই মানুষ সারাক্ষণ সচেতন থাকে। নিজেকে অন্যরকম দেখাবার জন্যে অভিনয়ও করে।

আমাদের বুঝি অভিনয় করবার ক্ষমতা নেই!

সার্থকতা কি আছে। পদে পদে ধরা পড়ে যাব যে! সে ভারি হাসির ব্যাপার হবে।

স্বাতি হাসল আমার দিকে তাকিয়ে, তারপরে বলল : তবে ইতিহাসের কথাই বল।

আমি বললুম : মিথ্যা বল নি। গৌড়ের পথে ইতিহাসের কথাই বেশি প্রাসঙ্গিক হবে।

কিন্তু বলবার কথা কিছু মনে পড়ল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি প্রশ্ন করল : গৌড় তো হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল?

আমি বললুম : এখন আমরা যে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখি তা শুনেছি মুসলমানের কীর্তি। হিন্দু রাজাদের কীর্তি বোধহয় তুর্কীরাই ধ্বংস করে গেছে।

স্বাতি বলল : দার্জিলিঙে তুমি আমাকে গৌড়ের পুরনো কথা কিছু বলেছিলে, কিন্তু আমি কিছুই মনে রাখতে পারি নি। গৌড় নাম কত দিনের পুরনো তা আর একবার বলবে কি?

হঠাৎ আমার কানিংহাম সাহেবের একটা কথা মনে পড়ল। তিনি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণে লিখেছেন যে গুড় থেকে গৌড় নাম

হয়েছে। তিনি মনে করেন যে পুরাকালে এই স্থান গুড়ের কারবারের জন্য বিখ্যাত ছিল।

স্বাতি এই কথা শুনে হেসে ফেলল, বলল : তুমি এই কথা মেনে নিয়েছ নাকি?

বললুম : তাহলে ঐতিহাসিকদের আর একটি কথা বলি। তাঁরা মনে করেন যে পুরাকালে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ছোট জেলা গৌড় বিষয় নামে পরিচিত ছিল, এই গৌড় বিষয়ের নামেই গৌড় দেশ হয়েছে। প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে গৌড় দেশ ষষ্ঠ শতাব্দীতেও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙলার রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর মানুষ, তাঁর সময়ে দেশের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে। তাঁর বিহার ও উড়িষ্যা জয়ের পরেই বোধহয় গৌড় নামের প্রচলন হয়েছে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : কেন?

ঐতিহাসিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন যে বাঙলার পাল ও সেন রাজারা নিজেদের গৌড়েশ্বর বলতেন। লক্ষ্মণসেনের শেষ বয়সে বক্তিয়ার খিলজী যখন বাঙলা আক্রমণ করেন, রাজা তখন নদীয়ায়। আর বাঙলা দেশ পরিচিত ছিল গৌড় ও বঙ্গ নামে। রাঢ়া ও বঙ্গ গৌড়েরই অন্তর্গত ছিল। মুসলমান আমলে সমস্ত বাঙলাদেশকেই বলত গৌড়। দেশের রাজধানী তখন লক্ষ্মণাবতীতে। সেকালের লক্ষ্মণাবতীই একালে গৌড় ও পাণ্ডুয়া নামে পরিচিত। গৌড় থেকে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। অনেকে দাবী করেন যে পাণ্ডুয়াতেই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগর।

স্বাতি বলল : এই মত তুমি মেনে নিয়েছ?

বললুম : ইতিহাসের কথা তো না মেনে উপায় নেই, যা মানবার উপায় নেই তা হল গৌড় নামের প্রাচীনত্ব। পাণিনি সূত্রে আছে গৌড়পুরের উল্লেখ, আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের কথাও আছে। গৌড় একটি সুপ্রাচীন দেশ বা জনপদ না হলে প্রাচীন গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ থাকত না, বাঙলার রাজারাও গৌড়েশ্বর বলে

সগৌরবে নিজেদের পরিচয় দিতেন না। আমাদের ঐতিহাসিকেরা এই বিস্মৃত সূত্রটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না।

স্বাতি আমার কথা মেনে নিল, বলল: সত্যি কথা। গৌড়ের আসল পরিচয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

আমি বললুম: হিন্দু রাজাদের কীর্তি যদি কিছু দেখতে না পাই তো মন আমার কিছুতেই ভরবে না। পাল ও সেন রাজাদের পরাক্রমের কথা পড়েছি, তাঁদের শিল্পানুরাগ সমাজ সংস্কার ও বিদ্যোৎসাহের কথাও। এই রাজাদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার বাসনা আমার অনেক দিনের।

স্বাতি বলল: আমি কিছুই জানি নে। তাই আমারও খুব ভাল লাগবে।

এক সময়ে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে একটি সংকীর্ণ পথে ঢুকে পড়লুম। স্বাতি বলে উঠল: একি!

ড্রাইভার এই কথা শুনতে পেয়েছিল, বলল: আমরা এবারে গৌড়ের পথ ধরলাম। আর একটু এগোলেই গৌড় দেখতে পাবেন।

অনাদৃত গৌড়ের পথও দেখছি অনাদৃত। দুধারের গাছপালায় একটি গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাতি সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: রাণী ভবানী কি গৌড়ের রাণী ছিলেন?

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

লজ্জা পেয়ে স্বাতি বলল: ভুল বলেছি বুঝি?

তারপরেই বলল: মনে পড়েছে। রাণী ভবানী ছিলেন নাটোরের রাণী। কিন্তু নাটোর এই অঞ্চলে নয়?

আমি বললুম: আমরা এখন মালদহ জেলায় আছি, আর নাটোর রাজসাহী জেলায়। প্রতিবেশী জেলা হলেও রাজসাহী পাকিস্তানে পড়েছে বলে আর তাকে প্রতিবেশী ভাবা চলে না। কিন্তু রাণী ভবানীর কথা অন্য। তিনি এখন আর নাটোরের রাণী বলে

পরিচিত নন, অহল্যাবাঈ-এর মতো তিনি এখন সারা ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী।

দুধারের দৃশ্য একবার দেখে নিয়ে স্বাতি বলল: তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

বললুম: সামান্য যা জানি তা বলতে পারি। ভবানী ছিলেন রাজসাহী জেলারই এক গ্রামের মেয়ে, তাঁর বিবাহ হয়েছিল নাটোরের জমিদার রামকান্তর সঙ্গে। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন একমাত্র কন্যা তারাকে নিয়ে। তারাও অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল।

দেড়কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক রাণী ভবানী বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ছিলেন। তখন নাকি নবাবী আমলের অত্যাচার উৎপীড়নে বাঙলার জনসাধারণের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। তার উপরে সিরাজউদ্দৌলার শ্যেন দৃষ্টি নাকি তাঁর সুন্দরী কন্যা তারার উপরে পড়েছিল।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: সিরাজউদ্দৌলা তারাকে দেখলেন কোথায়?

শুনেছি নৌকো থেকে। সিরাজ নৌকো বিহারে ছিলেন বড়নগরের নিকট গঙ্গায়, আর তারা তাঁর প্রাসাদের ছাদে চুল শুকোচ্ছিলেন। সিরাজ নাকি তারা হরণের জন্য বড়নগরে লোকজন পাঠিয়েছিলেন। আর বিধবা কন্যাকে রক্ষার জন্যে রাণী ভবানী অসংখ্য বৈষ্ণব এনেছিলেন পরপারের মন্তারাম বাবাজীর আখড়া থেকে। নবাবের লোকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

স্বাতি বলল: এই ঘটনা সত্য বলে কি তুমি বিশ্বাস কর?

সিরাজের নামে এ যে মিথ্যা অপবাদ, তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে শোনা যায় যে বাঙলার জনসাধারণকে রক্ষার জন্য রাণী ভবানী নাকি সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টায় সহায়তা করেছিলেন।

পলাশিতে ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যখন যুদ্ধ হয়েছিল, রাণীর বয়স তখন একচল্লিশ বছর।

কিন্তু এ সব ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য রাণী ভবানীকে কেউ স্মরণ করে না। সাতাত্তরের মন্বন্তরের সময় তিনি যে নিজের রাজকোষ দরিদ্র বাঙালীর জন্য নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, সে কথাও লোকে ভুলে গিয়েছে। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন ভারতের নানা তীর্থে তাঁর অকৃপণ দানের জন্য। দেশের নানা স্থানে তিনি মন্দির ও সত্র নির্মাণ করে দিয়েছেন। বারানসীতে তাঁর কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা দেখে এসেছি।

এখন আমরা গৌড়ের ঘরবাড়ির ভিতর দিয়ে চলেছি। ড্রাইভার থামল না, বলল: আমরা এক দিক থেকে দেখতে দেখতে ফিরব।

স্বাতি এ কথাব উত্তব দিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল: বাঙলাদেশে তাঁর কোনও কীতি নেই?

আমি বললুম: আছে শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে তা দেখি নি।

স্বাতি বলল: যা শুনেছ তাই বল।

এক সঙ্গে আমার দুটি তীর্থস্থানের কথা মনে পড়ল। একটির নাম ভবানীপুর, আর দ্বিতীয়টি বড়নগর নামে পরিচিত। প্রথমটি পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে, দ্বিতীয়টি অবণ্যে পরিণত হয়েছিল অনাদরে।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি বলল: চুপ করে রইলে যে?

আমি বললুম: ভবানীপুর নামে একটি পীঠস্থান নাকি রাণী ভবানীর নামেই পবিচিত। এক সময়ে সেখানে নাকি করতোয়া আত্রেয়ী ও যমুনার সঙ্গমস্থল ছিল। কেউ অঙ্গুলিপীঠ বলেন, আর ভবানীদেবীর পূজারীরা বলেন, সতীর বাম কর্ণ পড়েছিল এইখানে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে—

করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥

করতোয়া তট যে একটি পীঠস্থান তা সর্বজনস্বীকৃত।—

করতোয়া তটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোস্তবা॥

স্বাতি হাসল আমার সংস্কৃত শ্লোক শুনে। লজ্জিতভাবে আমি বললুম: এই পীঠস্থান সম্বন্ধে একটা শোনা গল্প তোমাকে সংক্ষেপে বলি।—

একবার রাণী ভবানী এসেছিলেন ভবানীপুরে। মন্দিরের নিকটে এক শাঁখারী তাঁর কাছে একজোড়া শাঁখার দাম চাইল। বলল, আপনার মেয়ে পরেছে। রাণী ভবানী আশ্চর্য হলেন। তাঁর বিধবা মেয়ে তো শাঁখা পরবে না, আর সে সঙ্গেও আসে নি। তাই তিনি বললেন, আমার মেয়েকে একবার দেখিয়ে দাও তো। শাঁখারী তাঁকে পুকুরের ঘাটে নিয়ে গেল। সেখানে কেউ নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! গভীর জলের ভিতর থেকে শাঁখা পরা হাত বেরিয়ে এল একটি। মা ভবানীর হাত। রাণী ভবানীর মেয়ে সেজে শাঁখা পরতে এসেছিলেন তিনি।

স্বাতি কোন অবিশ্বাসের কথা কইল না। কিন্তু এর পরের ঘটনাও বললুম: ছেলে ছিল না রাণী ভবানীর। তাই তিনি দত্তক পুত্র নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে। এরই হাতে বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়ে রাণী ভবানী গঙ্গাতীরে বড়নগরে বাস করতে এলেন। কিন্তু বিষয়ে মন ছিল না রামকৃষ্ণের। শ্মশানে তিনি তান্ত্রিক সাধনা করতেন। ভারতের রাজযোগী সাধক রামকৃষ্ণ সম্পত্তি হারিয়ে আনন্দ পেতেন বন্ধন কমল বলে। ভবানীপুরে তাঁর তপোবন ও যজ্ঞকুণ্ড আজও নাকি আছে।

অত্যন্ত অনাদৃত অসমতল পথে ড্রাইভার আমাদের সন্তর্পণে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে থামাচ্ছিল গাড়ি। এই অবসরে স্বাতি বলল: বড়নগরের কথাও বল।

বললুম: রাণী ভবানীর খুব প্রিয় স্থান ছিল বড়নগর। তিনি ভেবেছিলেন যে এই বড়নগরকে তিনি বাঙলার কাশীতে পরিণত

করবেন। চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন অনেক পরিমাণে। ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরী যেন কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা। তাঁর কন্যা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপাল বিন্দুমাধব ও অষ্টভুজ গণেশ। এই গণেশ যেন কাশীরই ঢুণ্ডিরাজ। আরও অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নানা দেবতার। এই সব মন্দিরে আজও অনেকে যায় পোড়ামাটির শিল্পনৈপুণ্য দেখতে।

স্বাতি বলল : এই বড়নগর কোথায় বল তো?

বললুম : গঙ্গার ধারে। শেয়ালদহ থেকে গেলে মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে জিয়াগঞ্জে নেমে নৌকোয় উঠতে হবে। আর হাওড়া থেকে গেলে আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটেই পৌঁছনো যাবে। এই অনাদৃত মন্দিরের গ্রামটি আজ বাঙলার গৌরবের বস্তু।

ড্রাইভারের কথায় আমাদের খেয়াল হল। আমরা এক জায়গাতেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। এইখানে আমাদের নামতে হবে। এখান থেকেই আমাদের গৌড়পরিক্রমা।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি বলল : জানবার কথার কি শেষ নেই!

২৬

দুধারের দরজা খুলে আমরা দুজনে নেমে পড়লুম। ড্রাইভারও নেমেছিল তার জায়গা থেকে। বলল: সামনের এই মসজিদটির নাম লোটন মসজিদ। গৌড়ের এক বাঈজী এই মসজিদটি তৈরি করেছিল।

মসজিদ দেখবার আগে আমি পরিবেশটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। গাড়ির ভিতরে গল্পে মশগুল ছিলুম বলে কোথায় এসে পৌঁছেছি ঠিক বুঝতে পারি নি। তাই আমি ড্রাইভারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম: মালদা থেকে আমরা কত দূর এসেছি?

ড্রাইভার বলল: নবাবগঞ্জ রোড ধরে আমরা প্রায় এগারো মাইলের পোস্ট পর্যন্ত এসেছি, তারপরে পুবমুখো এসেছি অল্প একটু পথ।

সোজা গেলে কী দেখতুম?

ড্রাইভার তৎপর ভাবে বলল: এর বেশি আমরা যাই নে।

আমি বললুম: আমরাও যেতে চাই নে, তবে গেলে কী দেখা যেত তাই জানতে চাইছি।

ড্রাইভার বলল: পাঁচখিলানের সাঁকোর উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই কোতোয়ালি গেট পাওয়া যেত। গৌড়দুর্গের দক্ষিণ দরজা সেটি। এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক। লোকে এই দরজাকে কোতল দরজাও বলে। নবাবী আমলে পুলিসের ফাঁড়ি ছিল এখানে। বিচারে প্রাণদণ্ড হলে এইখানেই কোতল করা হত। তাই একে কোতল দরজা বলে, কোতোয়ালি গেটও বলে।

তারপর?

নিয়ামৎউল্লার বারদুয়ারী, ফিরোজপুর দরজা, ফরশবাড়ির মাদ্রাসা ও মসজিদ, পিঠাওয়ালী মসজিদ, গুনমন্ত মসজিদ, রাজবিবি মসজিদ। বেগমহম্মদ মসজিদ—

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : কত মসজিদ এখানে ?

ড্রাইভার বলল : চিকা মসজিদ চামকাটি মসজিদ তাঁতিপাড়া মসজিদ ঝনঝনিয়া মসজিদ বড় ও ছোট সোনা মসজিদ—

স্বাতি বলল : রক্ষে কর, এত মসজিদ আমি দেখতে পারব না।

ড্রাইভার হেসে বলল : সব মসজিদ কেউ দেখতে চান না, দেখাবার মতো মসজিদগুলিই আমরা দেখাই। আর ছোট সোনা মসজিদ তো দেখবার উপায় নেই, সে এখন পাকিস্তানে পড়েছে।

পাকিস্তান ?

আমার বিস্ময় দেখে ড্রাইভার বলল : পাকিস্তান তো এখান থেকে তিন মাইলেরও কম। কোতোয়ালি দরজা থেকেই ফিরোজপুর গ্রাম, তারই প্রান্তে এই মসজিদ। এক সময় নাকি ফিরোজপুরে জমজমাট শহর ছিল। মসজিদের গম্বুজগুলি ছিল সোনার পাতে মোড়া। সাড়ে চার শো বছরের পুরনো মসজিদ।

সময় নষ্ট না করে আমি লোটন মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলুম। স্বাতিও আমার সঙ্গে এল, বলল : গৌড়ে এত মসজিদ কেন বলতে পার ?

বললুম : তাহলে তোমাকে ইসলাম ধর্মের কথা একটু জানতে হবে। মহম্মদ নাকি বলেছেন যে খোদার নামে যে একটি মসজিদ তৈরি করে, খোদাও তার জন্যে ঠিক তেমনি একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। গৌড়বাসীর মনে এই বিশ্বাস বোধহয় বদ্ধমূল ছিল, তাই এখানে পিঠেওয়ালীও মসজিদ তৈরি করেছে। বাঈজীও করেছে। যথাসর্বস্ব খরচ করেই বোধহয় করেছে।

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : আশ্চর্য।

আমি বললুম : আশ্চর্য হবে আর একটা কথা শুনলে। যে বাঈজী এই মসজিদ তৈরী করিয়েছে, তার নাম লোটন কিনা জানি নে। ইতিহাস বলে যে এটি সুলতান ইউসুফ শাহের তৈরী প্রায় পাঁচশো বছর আগে। একখানা শিলালিপি থেকে এই কথা জানা গিয়েছিল।

তবে বাঈজীর নাম হল কেন?

এ অঞ্চলের লোক বলে যে সেই বাঈজী ছিল সুলতানের প্রিয় পাত্রী। আর তাঁর কাছ থেকেই প্রচুর ধনরত্ন পেয়েছিল। তাই নিজের নাম গোপন করে সুলতানের নামেই মসজিদ তৈরী করিয়েছে। মসজিদের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র এক রকমের চকচকে টালি ব্যবহার করেছিল, সাদা হলদে সবুজ আর নীল রঙের টালি এমন নকসা করে বসানো ছিল যে সাহেবরাও তাকে অপরূপ সুন্দর বলত। সে সব কোথায় চলে গেল কে জানে।

স্বাতি বলল: এই মসজিদটিকে ঠিক মসজিদ বলে মনে হচ্ছে না। কারও সমাধি বললে বোধহয় বেশি মানাত।

কথাটা মিথ্যে নয়। সামনে থেকে শুধু একটি গম্বুজ দেখতে পাচ্ছি। বিরাট গম্বুজ চাঁচাছোলা কারুকার্যহীন। মনে হবে যেন একটি বিরাট বাটি উপুড় করে রাখা আছে। পিছনে হয়তো এমনি গম্বুজ আরও একটি আছে। কিন্তু সামনে থেকে তা দেখা যাচ্ছে না।

স্বাতি বলল: এই গম্বুজ দেখে দার্জিলিঙের রাজভবন ও বর্ধমান রাজার প্রাসাদের কথা মনে পড়ছে। ও দুটি বাড়ির মাথাতেও এমনি গম্বুজ আছে।

এ কথাও ঠিক।

ঘুরে ঘুরে মসজিদটি আমরা দেখলুম। পুরনো ইট দিয়ে স্থানে স্থানে মেরামতের চিহ্ন আছে। ভিতরের মেঝেতেও আছে মেরামতের চিহ্ন। লোকে নাকি মেঝে খুঁড়ে ধনরত্নের সন্ধান করেছে।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় স্বাতি বলল: এখানকার ইতিহাস তুমি কোথায় পড়লে?

আমি তার উত্তর না দিয়ে হাসলুম।

স্বাতি বলল: হাসলে যে।

চোখ মেলে চললে তুমিও বলতে পারতে।

স্বাতি এবারে চারিধারে চেয়ে দেখল, তারপরে একটি কালো

বোর্ডের উপরে অনেক কিছু লেখা দেখে বলল : বুঝেছি। কিন্তু তবু তোমাকে বাহাদুর বলব, কোন্ সময়ে পড়ে নিয়েছ জানতে দাও নি।

আমি হেসে বললুম : পণ্ডিতের সঙ্গে তফাত আমার ঐখানে, বিদ্যে আমার পথের সঞ্চয়।

স্বাতি বলল : বিদ্যার অভিমান যদি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন আর মনকে অভিভূত না করে তো সেই বিদ্যায় দশের কল্যাণ হয়।

গাড়িতে উঠবার সময় আমি বললুম : খুব সত্যি কথা। কিন্তু সবাই কি সচেতন থাকতে-পারে!

পথ চলতে চলতে ড্রাইভার বলল : সাগর দীঘি এখানে দুটো। ছোট সাগর দীঘি খুব কাছে, কিন্তু বড় সাগব দীঘি দূরে, ফুলবাড়ি গেটের কাছে, যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকেই। তাবই কাছে আখি সিবাজের সমাধি।

আখি সিরাজ কে?

একজন সাধু।

ড্রাইভার আমাদের কদম রসুলে এনে উপস্থিত করল। বলল : এও একটি মসজিদ।

তারপরে স্বাতির দিকে তাকিয়ে বলল : এ মসজিদ সকলের দেখা উচিত। এব ভিতরে মহম্মদের পায়েব চিহ্ন আছে।

আমি সবিস্ময়ে বললুম : মহম্মদ তো এ দেশে আসেন নি!

ড্রাইভার হকচকিয়ে গেল, উত্তর দিতে পারল না আমার কথার। কিন্তু আমরা উত্তর পেলুম এই মসজিদেরই এক বৃদ্ধের কাছে। একখানি পাথরের উপরে মহম্মদের পদচিহ্ন কবে কে এনেছিলেন এ দেশে তা তার জানা নেই। তবে প্রথমে এটি পাণ্ডুয়ার চিলাখানায় ছিল, সেখান থেকে হোসেন শাহ তা এনে এই মসজিদে একটি কালো কষ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সোনা ও

রূপোর কাজ করা যে কাঠের বাক্সে সেটি আনা হয়েছিল তা এখনও আছে। পরবর্তীকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেটি মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান, কিন্তু নবাব মির্জাফর আবার ফিরিয়ে দেন সেটি।

এই মসজিদটি কিন্তু হুসেন শাহর তৈরি নয়। হুসেন শাহর পুত্র সুলতান নসরৎ শাহ এটি নির্মাণ করেছেন। এর বয়স প্রায় সাড়ে চারশো বছর। লোটন মসজিদের মতো এই মসজিদের মাথাতেও একটি গম্বুজ আছে, আর নিকটে আছে একটি খোড়ো ঘরের মতো পাকা গৃহ। ফতে ইয়ার খাঁর সমাধি এটি। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলির খাঁব পুত্র ফতে ইয়ার খাঁর মৃত্যু হয়েছিল গৌড়ে এসে রক্তবমন কবে।

হোসেন শাহর কবরও ছিল এই মসজিদের নিকটে। আর খাজাঞ্চিখানা ও টাঁকশালের দীঘি। এই অঞ্চলেরই মহল সরায়ে সুলতানদেব জেনানা মহল ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

সেই বৃদ্ধ মুসলমানটি কিছু দক্ষিণার আশায় আমাদের গাড়ির কাছে এসেছিল। স্বাতি তার হাতে কিছু দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। আমিও উঠলুম। তারপরে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলুম: এবারে আমাদেব কোথায় নিয়ে যাবে?

সংক্ষেপে ড্রাইভার বলল: চিকা মসজিদ।

স্বাতি বলল: আবার মসজিদ!

কিন্তু আমি বললুম: কী দেখবার আছে সেই মসজিদে?

ড্রাইভার বলল: লোকে বলে যে হিন্দু মন্দির ভেঙে সেই পাথরে এই মসজিদ তৈরি হয়েছে। হিন্দু মূর্তি আছে দরজার পাথরে, ঘষে তা নষ্ট করা হয়েছে।

স্বাতি বলল: চিকা মসজিদ নাম হল কেন?

চামচিকের অত্যাচারে।

ভয় পেয়ে স্বাতি বলল: তবে চিকা মসজিদ থাক, এবারে অন্য কোথাও চল।

তবে লুকোচুরি গেটে চলুন।

বলে ড্রাইভার সেই দিকে অগ্রসর হল। পথে যেতে যেতে বলল: লোকে আরও একটা কথা বলে। হোসেন শাহ নাকি বন্দীদের রাখতেন ওই বাড়িতে। সনাতনকেও এইখানে বন্দী করে রেখেছিলেন।

সনাতন আবাব কে?

আশ্চর্য হয়ে ড্রাইভার বলল: রূপ সনাতনের নাম শোনেন নি!

আমি বললুম: চৈতন্যদেবের ভক্ত রূপ সনাতন হুসেন শাহর মন্ত্রী ছিলেন।

স্বাতি এই কথা মনে করতে পারল না। বলল: তাই বুঝি!

এবারে আমরা লুকোচুরি গেটের কাছে এসে নামলুম। দুর্গের পূর্ব দিকের দরজা এটি। তিনতলা দরজা। সুলতানেরা হাতির উপরে চেপে এই পথ দিয়েই দুর্গে প্রবেশ করতেন। দরজার দু ধারে আছে সান্ত্রীদের ঘর। ড্রাইভার বলল যে উপরের ছাদ থেকে নাকি দামামা বাজত।

মেঠো পথ নিচে নেমে এই গেট পেরিয়ে চলে গেছে। গ্রামেব লোকেবা গরু বাছুর নিয়ে যাতায়াত করছে এই পথে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা এই দরজা'টি দেখতে লাগলুম। এটি অনেক পরবর্তী কালের তৈরি বলে মনে হল। পাঠান যুগের স্থাপত্য যেন নয়। পরে শুনেছিলুম যে আমরা ঠিকই সন্দেহ করেছি। পরিত্যক্ত গৌড় নগরকে সংস্কার করবার সংকল্প নিয়ে শাহ সুজা এটি তৈরি করেছিলেন তিনশো বছর আগে। এটি মোগল শৈলীতে তৈরি।

গাড়িতে ফিরে আসতেই ড্রাইভার বলল: গেটও গৌড়ে কম নেই। দক্ষিণে কোতোয়ালি গেট, আর উত্তরে ফুলবাড়ি গেট। ফুলবাড়ির গেট আর নেই, শুধু নামটিই আছে। লুকোচুরি গেট

দেখলেন, এর উত্তরে গুমটি গেট। বাইশগজী দেওয়াল আর ফিরোজ মিনার দেখাবার পর আপনাদের দাখিল দরজা দেখাব। গৌড় দুর্গের প্রধান গেট হল সেটি।

বাইশগজী দেওয়ালটি আমরা দূর থেকেই দেখলুম। এটি গৌড় দুর্গের প্রাকার নয়, এই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল রাজপ্রাসাদ। লম্বায় সাতশো গজ আর চওড়ায় আড়াই তিনশো গজের বেশি হবে না। এখন প্রায় চৌদ্দ গজ উঁচু, কিন্তু এককালে বাইশ গজ উঁচু ছিল বলে অনুমান করা হয়। এইজন্যেই এই দেওয়ালের নাম হয়েছে বাইশ গজী। মাটির কাছে এই দেওয়াল পাঁচ গজ চওড়া, আর উপরের দিকে গজ তিনেক। পাঁচশো বছর আগে সুলতান বারবাক শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর প্রাসাদে তখন তিনটি মহল ছিল, উত্তরের মহলে তিনি দরবার করতেন, মাঝখানে তাঁর খাস মহল, বেগমরা থাকতেন দক্ষিণের মহলে। প্রত্যেকটি মহলে এক একটি পুকুর ছিল, আর ফুলের বাগান। এ সব কথা এখন লোকের মুখে শুনতে হয়।

ফিরোজ মিনার কিন্তু আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। একটি গাছের নিচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম, তারপর কাছে গিয়ে দেখলুম মিনারটি। একটি উঁচু ভিতের উপরে পাঁচতলা মিনার। নিচে থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে মিনারের দরজায় পৌঁছতে হয়। উপরে উঠবার ঘোবানো সিঁড়ি আছে তিয়াত্তরটি। চুরাশি ফুট উঁচু, আর বাষট্টি ফুট তার পরিধি। গত শতাব্দীতে এক বিদেশী এই মিনারের উপরে একটি গম্বুজ দেখেছিলেন।

উপরে উঠবে নাকি?

বলে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু স্বাতি আমার হাত টেনে ধরল। বলল: না না, ওপরে উঠো না।

আমি ফিরে দাঁড়াতেই সে আমার হাত ছেড়ে দিল। বলল: এ তো কুতুবমিনার নয় যে দিনরাত লোক উঠছে ওপরে।

আমি হেসে বললুম: ভয়!

স্বাতি বলল: ভয় পাওয়াই তো উচিত। ভেঙে না পড়লেও পোকামাকড় তো কামড়াতে পারে।

ভেঙে পড়াও বিচিত্র নয়। বাইশগজী দেওয়ালের চেয়ে তো এর বয়স বেশি।

তাই নাকি!

এই মিনারের বয়স আমরা হিসেব করে দেখলুম। ফিরোজশাহ এই মিনার তৈরি করেছিলেন বলে সকলের বিশ্বাস, তিনি বারবাক শাহর পরের রাজা। কিন্তু কানিংহাম সাহেব বলেন যে এটি ফিরোজশাহর অনেক আগে তৈরি। সেই হিসাবে এর বয়স সাড়ে পাঁচশো বছরের বেশি হয়েছে।

কেন এই মিনারটি তৈরি হয়েছিল তা নিয়েও মতান্তর আছে। ঐতিহাসিকেরা এটিকে সঙ্গত কারণেই বলেন ওয়াচ-টাওয়ার, এর উপর থেকে দুর্গ প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জনসাধারণ একে চেরাগদানি বলে, প্রদীপ জ্বালানো হত এর উপরে। অনেকে আবার এই মিনারকে পীর-আশা বলে, মোল্লারা আজান দিত এর উপর থেকে। এখন এই মিনারের এক ধারে একটুখানি শ্যামল ক্ষেত্র, অন্য দিকে একটি ছোট পুকুর, আর পিছন দিকটা ছেয়ে গেছে বড় গাছপালায়। আমি বললুম: এ দেশে এই সব মিনার তৈরি হয়েছে বিজয়স্তম্ভ রূপে। আমার মনে হয় যে হুসেন শাহ এই মিনারটি গড়েছেন আসাম জয়ের পরে।

স্বাতি বলল: একি তোমার নিজের মত?

বললুম: কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ছে।

বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ এখান থেকে এক মাইল উত্তরে। তার আগে আমরা দাখিল দরজার সামনে এসে একটুখানি দাঁড়ালাম।

অনেকে একে দখল দরজাও বলে। গৌড় দুর্গের সিংহদ্বার এটি। লোহার বা কাঠের কোন দরজা এখন আর নেই। দুর্গ প্রাকারে এখন এটি একটি সুবিশাল যাতায়াতের পথ। হাতির উপরে হাওদায় বসে সুলতানেরা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতেন। এত ভারি ও মজবুত যে কোনদিন ভেঙে পড়বে বলে কেউ ভাবে নি। তবু কিছু নষ্ট হয়েছে, পাশের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে অনেকটা। আর পরিখা দেখতে পেলুম না। এর বয়সও তো কম নয়, সাড়ে পাঁচশো বছরের কম হবে না। এটি নির্মিত হয়েছিল নসরৎ শাহর আমলে।

এবারে আমরা সোনা মসজিদ দেখতে এলুম। কেউ বারদুয়ারী বলে, কেউ বলে সোনা মসজিদ। ড্রাইভার বলল: দুয়ার এর এগারটি, তবু লোকে বারদুয়ারী বলে। কিন্তু এর সোনা মসজিদ নামটিই ঠিক ছিল। উপরের চুয়াল্লিশটা গম্বুজ ছিল সোনার পাতে মোড়া, আর এমন কারুকার্য ছিল যে রোদে বা চাঁদের আলোয় মসজিদটি সোনার বলে মনে হত।

এক সময় এটি যে গৌড়ের সবচেয়ে বড় মসজিদ ছিল তা একবার তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু প্রায় সবই এখন ভেঙে পড়েছে। চুয়াল্লিশটি গম্বুজের এগারটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এগারটি দরজা আর এগারটি গম্বুজ। নাম কিন্তু বারদুয়ারী।

মসজিদটি দেখবার জন্যে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। কিন্তু তার আগে জেনে নিয়েছিলুম যে এই মসজিদটিও নসরৎ শাহর আমলে তৈরি। কিন্তু এই মসজিদ নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর একার নয়। হোসেন শাহ এই মসজিদের পরিকল্পনা করেছিলেন দিল্লীর পাঠান স্থাপত্যের অনুরূপ, কিন্তু এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করে শেষ করে যেতে পারেন নি। নসরৎ শাহ তাঁর আঠারো পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, পিতার মৃত্যুর পরে সুলতান হয়ে তিনি সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করেছিলেন।

এই মসজিদের ভিতরে আমাদের ভাল লাগল একটি সুবিস্তৃত অলিন্দ। তার শেষ প্রান্তের একটি দরজা দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ

দেখা যাচ্ছিল, আর অন্ধকার অলিন্দে অল্প অল্প আলো আসছিল তার এগারটি দুয়ার দিয়ে। একটা নির্জন গম্ভীর পরিবেশ শান্ত স্তব্ধ। স্বাতি বলল : এরকম অলিন্দ আমরা কোথায় দেখেছি বলতো?

তার মৃদু কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল দুধারের দেওয়ালে।

আমি বললুম : রামেশ্বরের কথা বোধহয় তোমার মনে পড়ছে। কিন্তু রামেশ্বর মন্দিরের অলিন্দ আরও বড়, আরও সুন্দর কারুকার্য-মণ্ডিত। পৃথিবীতে তার তুলনা নেই।

স্বাতি বলল : গৌড়ে এই জায়গাটিই আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে।

কিন্তু আমি এ কথা মেনে নিলুম না। বললুম : আর একটি জায়গা এর চেয়েও ভাল লাগবে।

আরও কিছু কি দেখতে বাকি আছে?

আছে বৈকি। চৈতন্যদেব এসে যেখানে ছিলেন সেই তমালতলাটি এখানে আজও আছে শুনেছি। গৌড়ের এই ধ্বংসাবশেষের নিকটেই সেই জায়গা।

স্বাতি বলল : কিন্তু আমবা কি সেখানে যাব?

আমি বললুম : যেতেই হবে। সে জায়গা না দেখে তো ফিরে যাওয়া চলবে না।

স্বাতি খুশী হল আমার কথা শুনে। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল অলিন্দের বাহিরে।

মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখে আমরা গাড়িতে এসে উঠলুম। জিজ্ঞাসা করলুম : এখন আমরা কোথায় যাব?

ড্রাইভার বলল : রামকেলির তমালতলা। চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন দেখিয়ে পাণ্ডুয়ায় নিয়ে যাব।

খুশীতে উজ্জ্বল হল স্বাতির দু চোখ, বলল : সেখানে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করব।

আমি বললুম : বেলা তো বেশি হয় নি। বিশ্রামের সময় আছে।

২৭

রামকেলি যাবার পথে স্বাতি বলল : চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন জানি, কিন্তু গৌড়ে যে এসেছিলেন তা এই প্রথম শুনলাম।

আমি বললুম : ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থে তিনি গেছেন। তীর্থ পরিক্রমায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

স্বাতি বলল : গৌড় তো কোন তীর্থ নয়, তিনি গৌড়ে এসেছিলেন কেন ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : ভক্তের টানে।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : চৈতন্যদেবের দুই প্রধান ভক্ত রূপ আব সনাতন। তাঁরা ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহর প্রধান অমাত্য।

এঁরা বৃন্দাবনের লোক নন !

এঁরা কোথাকার লোক ছিলেন তা শুনলে আরও আশ্চর্য হবে। কর্ণাট রাজের এক বংশধর রাজ্যলাভে বঞ্চিত হয়ে এসেছিলেন নবহট্ট বা নৈহাটিতে। এই বংশের কুমার দেব ফরিদপুর জেলায় গিয়ে বসবাস করছিলেন। সনাতন রূপ ও বল্লভ তাঁর তিন পুত্র। বড় হয়ে এঁরাই এসেছিলেন গৌড়ে। এঁদেরই বাস ছিল রামকেলি গ্রামে।—

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

স্বাতি বলল : তোমার কথায় মনে হচ্ছে যে সনাতন বড় ও রূপ ছোট। তবে কেন সবাই বলে রূপ সনাতন ?

মতান্তরে রূপ বড়, সনাতন ও অনুপম ছোট। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো ছোট ভাই রূপ আগে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, আর বড় ভাইকে ডেকেছিলেন তিনি। বৈষ্ণব হিসাবে রূপের নাম

আগে। যেমন হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম। ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষ বরাহের হাতে আগে নিহত হয়েছিল। তাই তার নাম আমরা আগে বলি—

দুই ভাই সর্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥
নানা দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্বজনে॥

বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী রূপ ও সনাতন হুসেন শাহর দরবারে উজীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দু কর্মচারীর উপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল হুসেন শাহর,রূপ ও সনাতনকেও তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন। ক্রমে এঁরা প্রধান অমাত্য হলেন, সুলতান তাঁদের উপাধি দিলেন সাকরমল্লিক। শৈশব থেকেই রূপ কৃষ্ণভক্ত, যবনের দাস হয়েও তিনি কৃষ্ণসেবা করতেন। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে দুটি জলাশয় তিনি নিজেদের বাসভবনের কাছে খনন করেছিলেন। তার চারিপাশে লাগিয়েছিলেন কদম গাছ। এই কদম্ব বনে তাঁরা কৃষ্ণের উপাসনা করতেন।

এই সময়ে একদিন তাঁরা সংবাদ পেলেন যে নবদ্বীপে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্যদেব। তাঁর দর্শনের জন্য তাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন চৈতন্যদেবকে, নিজেদের দুঃখের কথাও জানাতেন। এই সব জেনে চৈতন্যদেব একবার সনাতনকে লিখলেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

স্বাতি বললেঃ দোহাই তোমার, যা বলবার বাঙলায় বল।

বললুমঃ বাঙলায় যে বড় অশোভন শোনাবে।

স্বাতি বললঃ চৈতন্যদেব নিশ্চয়ই কোন অশোভন কথা বলেন নি।

আমি এ কথার উত্তর না দিয়ে শ্লোকটির মানে বললুম স্বাতিকে ঃ পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যগ্র থেকেও মনে যেমন নবসঙ্গের রসাস্বাদন করে, তেমনি বিষয়ে ব্যস্ত থেকেও হৃদয়ে দেবতাকে সারাক্ষণ ধরে রাখ।

স্বাতি বলল ঃ আপত্তিকর কথা। পরপুরুষের বদলে প্রিয়পাত্র বল। সে যুগ তো আর নেই, মানুষেব নৈতিক চরিত্রেব অনেক উন্নতি হয়েছে। ঘরেব বউ এখন স্বামীর কথাই সাবাক্ষণ ভাবে।

আমি হেসে বললুম ঃ জানি নে, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

যেন আমার আছে!

বলে স্বাতিও হাসল, তারপবে বলল ঃ রূপ সনাতনের কী হল বল।

বললুম ঃ শান্তিপুব থেকে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাবেন, ভাবলেন যে গৌড়ে রূপ সনাতনকে একবাব দেখে যাবেন। সেই ব্যবস্থাই হল। চৈতন্যদেব এলেন রামকেলি গ্রামে। রাতের অন্ধকারে দুই ভাই এলেন দীনবেশে। বললেন—

নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমাব আগেতে প্রভু কহিতে করি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥

চৈতন্যদেব দু হাতে দুই ভাইকে তুলে ধবলেন।—

প্রভু বলে শুন রূপ দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥

অনেকে বলেন যে এই দুই ভাইএর নাম ছিল অমব ও সন্তোষ। রামকেলিতে এসে রূপ সনাতন নাম দিয়েছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। সুলতান হুসেন শাহও তাঁর আগমনেব সংবাদ পেয়েছিলেন। শোনা

যায় যে দেখা করতেও নাকি চেয়েছিলেন। সনাতন তাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—

ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রার তব সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥

চৈতন্যদেব আর কালক্ষয় করেন নি, যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাদের বিদায় দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন।

একটি ছায়াশীতল গ্রামে এসে আমাদের গাড়ি থামল। বুঝতে পারলুম যে এইখানে আমাদের নামতে হবে। দেরি না করে আমরা নেমে পড়লুম।

ড্রাইভার বলল: তমালতলায় চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন দেখুন, আর এগিয়ে গিয়ে মদনমোহনের মন্দির দেখে আসুন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এলে এখানে একটি বিরাট মেলা দেখতে পেতেন।

শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে আমরা এক মহাপুরুষের চরণচিহ্ন দেখলুম। শহর থেকে দূরে নির্জনে প্রকৃতির কোলে এসে বসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তখন ভাগীরথীর ধারা বইত এই গ্রামের পাশ দিয়ে। আর অদূরে ছিল ভারতের সমৃদ্ধতম নগরীর অন্যতম নগর গৌড়। সমগ্র গৌড় রাজ্যের প্রজাবৃন্দ এসে এই তমালতলায় জড়ো হয়েছিল। আর সুলতান হুসেন শাহও আসছেন শুনে সেই সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা করেন নি। ভয় নয়, বৈরাগ্য। সংসারকে যিনি ত্যাগ করেছেন, তিনি দূরে থাকতে চান সংসার থেকে।

এখান থেকে আমরা মদনমোহনের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। এ কোন প্রাচীন মন্দির নয়, আধুনিক প্রথায় নূতন নির্মিত হয়েছে। প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে একটি একতলা গৃহ, উপরের শিখর গম্বুজের মতো নয়, কোন পরিচিত মন্দিরের মতোও নয়, জ্যামিতির বইএ এই রকমের কোণ বা শঙ্কু দেখেছি, চারিধার থেকে অনেকগুলি ত্রিভুজ নিচে

থেকে উপরে একটি বিন্দুতে মিলেছে। কে বা কারা এই মন্দির নির্মাণ করেছেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা শুনলুম মন্দির প্রাঙ্গণে এক বৈষ্ণবের কাছে। মন্দিরের বিগ্রহ নূতন নয়, সাড়ে চারশো বছর আগে রূপ ও সনাতন এই বিগ্রহের সেবা করতেন। নূতন মন্দিরে এই পুরাতন বিগ্রহটিকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

যাত্রীব যাতায়াতে জীবন্ত নয় এই মন্দির, কীর্তনে কলরবেও মুখর নয়। মদনমোহনকে প্রণাম করে আমরা পথে বেরিয়ে এলুম। স্বাতি বলল ঃ এস, তমালতলায় আমরা খানিকক্ষণ বসি।

বললুম ঃ সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্য বোধহয় খানিকটা অনুভব করতে পারব।

গাড়িব দিকে মুখ কবে নয়, আমবা বসলুম পদচিহ্নের দিকে চেয়ে। স্বাতি বলল ঃ এই রকমেব জায়গা আমবা আর কোথাও দেখেছি কি ?

আমি বললুম ঃ কেন জানি না, আমাব দিল্লীব বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কবরের কথা মনে পড়ছে।

বিপুল বিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম ঃ মনে পড়ে, অজন্তা ইলোরা দেখতে গিয়ে দেখেছিলুম তাঁর সমাধি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে একটি শ্বেত পাথরের বেদী। মুসলমান ভক্তরা তার উপরে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর অতুল রাজকোষের একটি কপর্দকও ব্যয় হয় নি তাঁর সমাধি নির্মাণের জন্য, নিজের হাতের গড়া টুপি বেচে চার টাকা দু আনা জমিয়ে রেখেছিলেন এর জন্যে। হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সমাধি নির্মিত হয়েছে চার টাকা দু আনায়। আর নিজের হাতে কোরাণ নকল করে সেই বই বিক্রির তিনশো পাঁচ টাকা দুঃস্থ প্রজার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব সত্য, না এই ঔরঙ্গজেব!

স্বাতি বলল ঃ ঔরঙ্গজেবের কথা তোমার কেন মনে পড়ল ?

বললুম ঃ পীর মকতুম শাহর কথা মনে পড়েছে বলে। কিন্তু পীরের কথা এখন থাক, এখন রূপ সনাতনের কথাই ভাবতে ভাল লাগছে।

স্বাতি বলল ঃ পীরের কথা ভুলে যেও না যেন।

আমি বললুম ঃ ভুলব না। লক্ষ্মণসেনের কথায় পীরের কথাও এসে পড়বে।

তারপরে রূপ সনাতনের কথা বললুম। এক দিনের একটি ছোট ঘটনা তাঁদের জীবনটাই পালটে দিয়েছিল। সেদিন সকাল থেকে ঝড়জলের আর শেষ নেই। কিন্তু দুই ভাইকে পথে বেরতে হল। হুসেন শাহ তলব করেছেন, তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু পথের ধারে একটি কুঁড়েঘরের সামনে এসে তাঁদের থমকে দাঁড়াতে হল। এক ভিখিরীর ঘর। ভিতর থেকে দুজনের কথাবার্তা তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। ভিখিরীর স্ত্রী বলেছিল, ঘরে তো চাল বাড়ন্ত, এইবারে বেরিয়ে পড়, সকাল হয়ে গেছে। ভিখিরী বলল, পাগল হয়েছ! এই দুর্যোগে কেউ পথে বেরতে পারে! শেয়াল-কুকুরও এখন তাদের বিবর থেকে বেরবে না। ভিখিরীর স্ত্রী বলল, পথে যে মানুষের পায়ের শব্দ পাচ্ছি! ভিখিরী বলল, নিশ্চয়ই তারা ক্রীতদাস কিংবা পরের অন্নদাস। রূপ বললেন, সত্যি কথা। দাসত্ব করতে গিয়ে আমরা কুকুর শেয়ালের চেয়ে হেয় হয়েছি। মনে মনে স্থির করলেন যে রাজসম্মান আর নয়, আজই তাঁকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে হবে। সুলতানের কাছে তিনি ছুটি চাইলেন, বললেন, তীর্থে যাব। সুলতানের আপত্তি অনুরোধ উপরোধ কিছু মানলেন না রূপ। জোর করেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। প্রথমে নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে গেলেন, তারপরে তাঁরই আদেশে বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন।

অনেক বই লিখেছেন রূপ গোস্বামী, বাঙলায় একখানি গদ্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন, তার নাম কারিকা। চারশো বছর আগের এই

বাঙলা ভাষা পড়ে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যে সেই গদ্য যেন অল্পদিন আগে লেখা। পরে আমি স্বাতিকে এই গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য পড়ে শুনিয়েছিলুম।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথবস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ, এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধাতে বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে, রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্বরাগের উদয়।

আমার মতো স্বাতিও আশ্চর্য হয়েছিল। বলেছিল, বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হয়। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে অন্য কথা পড়েছি।

রূপের পরে সনাতনের কথা। রূপের মতো সনাতন পারেন নি এক কথায় সংসার ত্যাগ করতে। তাঁকে আরও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই দক্ষ ও বিচক্ষণ মন্ত্রীকে ছুটি দিতে হুসেন শাহ রাজী ছিলেন না। অবশেষে সনাতন একটা উপায় খুঁজে পেলেন।—

হেথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হায় করিল নিশ্চয়ই॥

সনাতন রাজদরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন, বলে পাঠালেন, তিনি অসুস্থ। হুসেন শাহ একদিন রাজবৈদ্যকে পাঠালেন, তারপরে নিজে এলেন তাঁকে দেখতে। সনাতনকে সুস্থ দেখে সুলতান সবই বুঝলেন, সনাতনও কিছু গোপন করলেন না। এই মন্ত্রীর মন্ত্রণায় রাজ্যের উন্নতি হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করেছেন সুলতান। এঁকে ছেড়ে দিতে সুলতান নারাজ। ক্রোধ প্রকাশ করলেন, তারপরে ভয় দেখাবার জন্য বন্দী করলেন সনাতনকে।

স্বাতি বলল : এই সময়ে বুঝি সনাতনকে চিকা মসজিদে রাখা হয়েছিল ?

কিন্তু পিয়াস বাড়ির জল খেতে দেওয়া হয় নি।

আবার নতুন কথা বলছ যে ?

বলতে ভুলে গিয়েছি সেই কথা। পিয়াস মানে তৃষ্ণা। আর বাড়ি, না বারি, তা বলতে পারব না। এটি একটি পুকুরের নাম। এর জল এমন বিষাক্ত ছিল যে বন্দীদের মৃত্যু হত এই জল খেয়ে।

স্বাতি বলল : সনাতনের কী হল ?

বললুম : রূপের পরামর্শে কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তখন কাশীতে। একবস্ত্রে তিনি কাশীর দিকে ছুটলেন।

চন্দ্রশেখর নামে এক বৈদ্যের গৃহে চৈতন্যদেব বাস করছিলেন। তিনি বললেন, দেখ তো, দ্বারে এক বৈষ্ণব এসেছে কিনা। চন্দ্রশেখর দেখে-এসে বললেন, বৈষ্ণব তো নয়, দরবেশ এসেছে একজন। চৈতন্যদেব বললেন, তাকেই এখানে নিয়ে এস। চৈতন্যদেবের সামনে এলেন সনাতন।—

ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥

সনাতনকে আলিঙ্গন করে চৈতন্যদেব বললেন, আমি পবিত্র হলাম।

একখানি নতুন কাপড় দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। সনাতন তা ফিরিয়ে দিলেন, চেয়ে নিলেন একখানি পুরনো কাপড়। সেই কাপড় ছিঁড়ে দুখানি কৌপীন ও একখানি বহির্বাস করে নিলেন। জীবন ধারণের জন্য মাধুকরী বৃত্তি নিলেন। কাশীর লোক আশ্চর্য হয়ে

দেখত যে প্রবলপ্রতাপ হুসেন শাহর প্রধান মন্ত্রী অর্ধনগ্ন অবস্থায় ভিক্ষা করছেন দ্বারে দ্বারে।

চৈতন্যদেবের আদেশে সনাতনও তাঁর শেষজীবন যাপন করেছেন বৃন্দাবনে। তিনিও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃন্দাবনের বিখ্যাত গোবিন্দজীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রূপ সনাতন। এঁদের চেষ্টাতেই বৃন্দাবন আজ বৈষ্ণবের পরম তীর্থ।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল : চল এইবারে।

আমি উঠে দাঁড়ালুম নিঃশব্দে। কিন্তু নীরবে থাকতে পারলুম না। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : রূপ সনাতনের আর একটি ভাই ছিল না ?

বললুম : ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর পুত্র।

তাঁর কথা কিছু বলবে না ?

তাঁর কথা আমরা অল্প জানি। শ্রীজীব গোস্বামীর লেখাতেই আমরা জানতে পারি যে রূপ সনাতনের ছোট ভাই বল্লভ রূপের সঙ্গে নীলাচলে যাবার সময় গৌড় দেশের গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন।

দেহত্যাগ!

আত্মহত্যা নিশ্চয়ই করেন নি, বোধহয় ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

আমরা এসে গাড়িতে উঠলুম। এখান থেকে আমরা পাণ্ডুয়ায় যাব। অনেকটা পথ, অনেক সময় লাগবে আমাদের। বেলা বেশি হয় নি বলেই কোন দুর্ভাবনা এল না।

গৌড় থেকে একই পথ ধরে আমাদের ফিরতে হচ্ছে। মালদহের উপর দিয়ে যেতে হবে পাণ্ডুয়ায়। এদিকে দশ মাইল, আর ওদিকে এগার মাইল পথ। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতি হয়তো আমাকে ইতিহাসের কথা বলতে বলবে। কিন্তু তা বলল না। বলল একান্ত ভাবে নিজেদের কথা। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল: তোমার কি কলকাতায় ফেরার ইচ্ছা ছিল না?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

স্বাতি বলল: মনে হচ্ছে যে কলকাতায় তোমার কোন কাজ নেই, শুধু আমার জন্যেই তুমি কলকাতায় যাচ্ছ।

সে তো সত্যি কথা।

সত্যি কথা! তবে তুমি যাচ্ছ কেন?

তুমিই তো টেনে নিয়ে যাচ্ছ।

স্বাতি ভাবল এক মুহূর্ত, তারপরে বলল: বেশ, তাহলে এক কাজ করা যাক। খেজুরিয়া ঘাটে তোমাকে আমি আসামের গাড়িতে তুলে দেব। বনগাঁইগাঁওএ গাড়ি বদল করে গৌহাটি ফিরে যেও।

আর তুমি!

আমি গঙ্গা পার হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরব।

গম্ভীরভাবে আমি বললুম: সেই ভাল।

তারপরে আর কিছু বললুম না।

স্বাতি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপরে জিজ্ঞাসা করল: ভাঙা হাত নিয়ে একা যাবে কী করে?

বললুম: যেতেই হবে। চিরকাল আর আমাকে কে সামলাবে বল

চিরকাল তো আর হাত ভাঙা থাকবে না।

কিন্তু পাও যে আমার খোঁড়া। আরও অনেক দিন হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে।

স্বাতি বলল: সে তোমার অভ্যাসের দোষে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে না বলেই পা খোঁড়া মনে হচ্ছে।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না, বললুম: কলকাতা থেকে কি তুমি দিল্লী ফিরবে?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল: না।

তবে?

বাবা-মার জন্যে অপেক্ষা করব।

তাঁরা কলকাতায় আসছেন নাকি?

আমার কানের কাছে মুখ এনে স্বাতি বলল: তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে আসছেন।

উৎফুল্ল হবার ভান করে আমি বললুম: কনে ঠিক আছে তো?

বোধহয় একটু জোরে বলেছিলুম এই কথাটি, স্বাতি তাই তার ঠোঁটের উপবে একটা আঙুল চেপে সতর্ক করে দিল। এখানে আমাদের সত্য পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হবে না, মিথ্যা সম্বন্ধের অভিনয় করে কুটিল সমাজকে ফাঁকি দিতে হবে। কিন্তু আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করছি দেখে বলল: গোপালদার জন্যে কী রকমের কনে চাই, আমি তা জানিয়ে দিয়েছি।

কীরকম?

সে শুধু একটি জিনিস চাইবে।

বললুম: কাপড় গয়না?

স্বাতি বলল: না।

তবে কি অর্থ প্রতিপত্তি?

উঁহু।

তবে নিশ্চয়ই এক গণ্ডা ছেলেমেয়ে।

ভর্ৎসনার সুরে স্বাতি বলল : ভালগার হোয়ো না।

ভয় পেয়ে আমি যেন সরে এলুম দূরে, বললুম : তাহলে তুমিই বল সে কী চাইবে ?

স্বাতি নীরবে রইল খানিকক্ষণ, আড়চোখে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে গভীর ভাবে কিছু ভাবছে, দৃষ্টি তার হারিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। তারপর অস্পষ্ট ভাবে বলল : এমন একটি মেয়ে চাই যে তার নিজের কথা ভাববে না, সকল অভাব আর কষ্ট লুকিয়ে হাসিমুখে বলবে, তুমি বড় হও, স্বনামধন্য হও তুমি।

আমার রোমাঞ্চ হল তার কথা শুনে, বললুম : এমন মেয়ে বোধহয় পৃথিবীতে দুটি নেই।

স্বাতি বলল : একটি থাকলেই হবে।

এইবারে আমি হেসে বললুম : সাধু, তোমার মত জেনে ধন্য হলাম। এ রকম একটি মেয়ের খোঁজ তুমি নিজেই দেবে, না আমাকে এ ভার নিতে হবে ?

গম্ভীর হয়ে স্বাতি বলল : তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছ ?

আমিও গম্ভীর হয়ে বললুম : তামাসার কি এখনও সময় আছে স্বাতি। একটা কিছু তোমাকে স্থির করতেই হবে।

আমাকে!

বলে স্বাতি হেসে উঠল। সে হাসি যেন আর থামতে চায় না।

অপ্রতিভ ভাবে আমি বললুম : অমন করে হাসছ কেন ?

তোমার ছেলেমানুষি দেখে। বুদ্ধিসুদ্ধি কি তোমার কোনদিন হবে না!

বোধহয় না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল : আগে তো একথা মানতে না।

বললুম : প্রতিবাদও বোধহয় কোনদিন করি নি।

আগেও কি তোমাকে বোকা বলেছি নাকি ?

গির্ণার পাহাড়ের কথা মনে নেই। সমাজে আমার দাম নেই বলে দুঃখ করেছিলে। বলেছিলে, কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না? আমি বলেছিলুম, এ যুগ যদি বদলায় তবেই পারব।

স্বাতি বলল: আমি কী বলেছিলাম?

বলেছিলে, সেদিন তুমি আর ঝগড়া করতে আসবে না।

আর তুমি বলেছিলে, স্বাতির মতো এ কথা হল না। এ কথা অন্য মেয়ে বলবে, দুর্বল মেয়ে।

এ কথা শুনেই তুমি আমাকে বোকা বলেছিলে।

তুমি যে সত্যিই বোকা।

বলে স্বাতি আবার হেসে উঠল।

তারপরে বলল: যাক এ সব কথা, তার চেয়ে তুমি যা জান তাই বল। এবারে পাণ্ডুয়ার কথা শুনব তোমার কাছে।

তার মতো সহজে আমি প্রসঙ্গ পালটাতে পারলুম না। তার জন্যে আমি সময় নিলুম কিছু। স্বাতি জানত যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাই খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল: পাণ্ডুয়া নাম তো গৌড়ের মতো প্রাচীন নয়!

আমি বললুম: লক্ষ্মণাবতী হল প্রাচীন নাম, মুসলমানরা বলত লখ্‌নৌতি।

লক্ষ্মণাবতী নাম বুঝি লক্ষ্মণ থেকে হয়েছে?

লক্ষ্মণসেন থেকে। লক্ষ্মণসেনই গৌড়ের শেষ হিন্দুরাজা।

কিন্তু গৌড়ে তো লক্ষ্মণসেনের কোন কীর্তি দেখলুম না।

বল্লালসেনেরই কি কোন কীর্তি দেখেছ।

স্বাতি বলল: না।

বললুম: রাজা বল্লালসেনের রাণীর নাম ছিল লক্ষ্মণা। লক্ষ্মণসেন তাঁরই পুত্র।

স্বাতি বলল: লক্ষ্মণাবতী রাণীর নামে নাম নয়তো!

হেসে বললুম : বিচিত্র নয়। কিন্তু রাজা তাঁর পুত্রের জন্মের পরে রাজধানীর এই নাম রেখেছেন।

তার আগে কী নাম ছিল ?

এইটিই খুব কঠিন প্রশ্ন। এ অঞ্চলের লোক বলে যে,রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, সেই প্রাচীন নগরের সংস্কার করে রাজা বল্লাল-সেন লক্ষ্মণাবতী নাম রেখেছিলেন। কিন্তু সবাই এ কথা তো স্বীকার করেন না, তাঁরা বলেন যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন আর বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় অভিন্ন। মহাস্থানগড়ে একটি শিলালিপি পেয়েই ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। আর এই স্থানের নাম গৌড় ছিল বলেই মনে হয়।

স্বাতি বলল : এবারে তাহলে লক্ষ্মণাবতীর কথা বল।

কিন্তু আমি বললুম : তার আগে রামাবতীর কথা জানা দরকার।

সেও কি গৌড়ের রাজধানী ?

গৌড়ের রাজা রামপাল তাঁর নিজের নামে এই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সেন রাজাদের আগে ছিলেন পাল রাজারা, তাঁদেরই শেষ রাজধানী রামাবতী।

সে কত দূরে ?

কোথায় তা জানি নে, তবে উত্তরবঙ্গেরই কোনখানে ছিল। করতোয়া তখন যমুনায় পড়ত না, পড়ত গঙ্গায়। আর গঙ্গাও তার পুরনো খাতে এখন বইছে না। শোনা যায় যে গঙ্গা ও করতোয়ার মাঝে ছিল রামাবতী। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই নগরের নাম রমতী, তার সমৃদ্ধির কথা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : সামনের দিকে না এগিয়ে তুমি যে ক্রমাগতই পেছনে হাঁটছ।

তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। বাঙলার প্রথম ঐতিহাসিক রাজা হলেন সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা। তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, আর তাঁর রাজধানী ছিল দামোদরের দক্ষিণ

তীরে পুষ্করণা নগরে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে এঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে।

স্বাতি বলল : ইতিহাসের শুকনো কথা কিছু সংক্ষেপে বল।

সংক্ষেপেই বা কেন, একেবারেই বাদ দিই।

বাদ দিলে যে গল্প তোমার অসম্পূর্ণ থাকবে।

বললুম : তাহলে গোপালের কথাতেই আসা যাক। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলার চরম দুর্দশা উপস্থিত হয়েছে। শত্রুর আক্রমণে দেশের প্রজা জর্জরিত, অথচ রাজার অন্তঃপুরে ব্যভিচার ও ষড়যন্ত্রে রাজশক্তি বিপর্যস্ত। দেশের প্রজারা তখন এক শক্তিমান সামন্ত গোপালকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাল। মনে হয় যে গৌড়ের রাজকন্যাকে গোপাল বিয়ে করেছিলেন। এঁর পুত্র ধর্মপাল পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, তিনি প্রাগজ্যোতিষ থেকে কান্যকুব্জ পর্যন্ত জয় করেছিছেন। কনৌজে তিনি যে মহাসভা আহ্বান করেছিলেন, তাতে যোগ দিয়ে মৎস্য মদ্র ভোজ যদু কুরু যবন অবন্তী গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজারা তাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার করেছিলেন। বাঙলার রাজা ধর্মপালের রাজসূয় যজ্ঞ এটি। মহীপাল ও রামপাল এই বংশের আরও দুজন পরাক্রান্ত রাজা। এই রামপালই স্থাপন করেছিলেন রামাবতী নগর।

স্বাতি বলল : তোমার কথামতো রামপাল পালবংশের শেষ রাজা মনে হচ্ছে।

রামপালের পরেই সেনবংশের বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেনের পিতামহ তিনি। বিজয়সেন কোথায় থেকে রাজ্যশাসন করেছিলেন জানি নে, কিন্তু তাঁর পুত্র বল্লালসেন রামাবতীতে বাস করেন নি, তিনি এই গৌড়ে বসবাস করে গেছেন। আবার লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণাবতীতে তিন রাজধানী স্থাপন করলেও শেষ বয়সে ছিলেন নবদ্বীপে। কেন ছিলেন, তা গল্পের মতো কথা। কিন্তু তাঁর পিতামহ বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা আরও অবিশ্বাস্য।

স্বাতি বলল : বল গল্প, ইতিহাসের চেয়ে সে বেশি ভাল লাগবে।

সেকশুভোদয়ায় এই গল্পটি আছে। ধর্মনিষ্ঠার জন্যে রামপাল তাঁর পুত্রদেব হারিয়েছিলেন। বড় ছেলে কোন নারীর উপরে অত্যাচার করেছিল বলে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, ছোট দুই ছেলে অযোগ্য ছিল বলে নিজেকে অপুত্রক ভাবতেন।

স্বাতি বলল : তিনি নিজেকে কি খুবই যোগ্য রাজা ভাবতেন?

আমি বললুম : ইতিহাস তাঁর যোগ্যতা মেনে নিয়েছে। তাঁর যৌবন কেটেছিল বড় ভাই মহীপালের কারাগারে। সেই কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন দুর্বল বাঙলায় তিনি আবাব নূতন শক্তি সঞ্চাব করেছিলেন।

এবাবে গল্পটা বল।

বাহান্ন বছর রাজত্ব করবার পব রামপাল অনশনে দেহত্যাগ কববেন। তাঁকে গঙ্গাতীবে আনা হয়েছে, সঙ্গে রানী এসেছেন, প্রজারা কাঁদছে। রাজা বললেন, তোমরাই আমার সন্তান, তোমরাই আমার শেষ কাজ কোবো। যে ব্রাহ্মণ ধার্মিক ও আতুরকে রক্ষা কববে, আব যে আমার কীর্তি নষ্ট করবে না, তোমাদের মধ্যে তেমনি একজন রাজা হও। বলে রাজা মৌন হয়ে অন্তর্জলি হলেন।

মন্ত্রী সহদেব ঘোষ পড়লেন বিপদে। রাজার মৃত্যুর পরে কে রাজা হবে, কাকে রাজসিংহাসনে বসানো যায়! রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, শিব এসে তাঁকে বলছেন যে আগামী কাল সাতটার পরে রামপাল মববেন। আর সেই সময় বিজয়সেন নামে একজন আসবে হাতে লাঠি নিয়ে, তাকেই রাজা কোরো।

সত্যি সত্যিই তাই হল। রাজার মৃত্যুর পরেই লাঠি হাতে এল বিজয়সেন। মন্ত্রী তাঁকেই স্নান করিয়ে চন্দন চর্চিত করে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়ে রাজ্যে অভিষেক করলেন। বিজয়সেন রাজা হলেন, রামপালের শ্রাদ্ধশান্তি করলেন তিনিই।

এক দিন অমাত্যরা রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, আমরা কী করব ?

রাজা বললেন, আমরা দাখানা এখনও পাই নি।

মন্ত্রী সহদেব ঘোষ শুনে ভয় পেলেন, সর্বনাশ! আর অমাত্যরা তাঁকে মারতে এল, বলল, এ কাকে এনে সিংহাসনে বসিয়েছ!

সহদেব ঘোষ খবর নিয়ে দেখলেন যে বিজয়সেন হল একজন দরিদ্র কাঠুরে। কাঠ কেটে রোজ সে সাতবুড়ি কড়ি পেত, তাই দিয়েই তার সংসার চলত কোন রকমে। কিন্তু বিজয়সেন প্রতিদিন লুকিয়ে পাঁচকড়া কড়ি নিয়ে শিবের পুজো করত। একদিন বৃষ্টির জন্যে তার কাঠ সংগ্রহ হয় নি, তাই নিজের দাখানা বাঁধা রেখে সাতবুড়ি কড়ি এনে দিয়েছিল বৌকে। বিপদ হল পরের দিন। কাঠ কাটতে বেরিয়ে দাখানা আর ফেরত পেল না, কাঠ কাটাও হল না। ঘরে ফিরবে কোন্ সাহসে, রাতে এক বেলগাছের তলাতেই শুয়ে পড়ল।

শিব দেখলেন যে তাঁর ভক্ত এবারে বাঘের পেটে যাবে। তাই তার সামনে এসে বললেন, অপঘাতে মরতে চাস কেন! ঘরে যা।

বিজয়সেন বলল, বেশ কথা তোমার। ঘরে গিয়ে নিজেও বৌয়ের গাল খাই, আর গাল খাক আমার শিব। তার চেয়ে বাঘের পেটই ভাল।

শিব তাকে একখানা দা দেখিয়ে বললেন, তবে তুই সকাল বেলায় গঙ্গার তীরে যাস, সেখানে রামপাল রাজা অন্তর্জলি হয়ে আছে। তোর দা তোকে ফেরত দেওয়া হবে।

রাজা বিজয়সেন তাই অমাত্যদের বললেন, আমার দাখানা এখনও পাই নি।

রাতে মন্ত্রীর চোখে ঘুম নেই। শিবের কথায় এ কাকে রাজা করলাম! শিব পাগল, আমিও পাগল, এখন দেখছি যাকে রাজা করা হল সেও পাগল।

শিব আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, ভয় নেই তোমাদের দারিদ্র্যের জ্বালা জুড়োতে বারো দিন সময় লাগে। আজ সময় পূর্ণ হচ্ছে। কাল থেকে কাঠুরে বিজয়সেন হবে রাজা বিজয়সেন।

আমি থামতেই স্বাতি বলল : এ কি ঐতিহাসিক ঘটনা বললে, না গল্প ?

আমি বললুম : গল্প।

ইতিহাস কী বলে ?

রাজা বিজয়সেনের একখানি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে আছে যে তাঁর পিতা হেমন্তসেন মহারাজাধিরাজ। কিন্তু হেমন্ত-সেনের সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছু নেই। আর অঙ্ক কষলে দেখা যাবে যে রামপালের শেষ সময়েই বিজয়সেন রাজা ছিলেন। এর থেকেই সন্দেহ হয় যে রামপালের রাজত্বকালে বোধহয় বিজয়সেন একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। তাহলে তাঁর শিলালিপিটি মিথ্যা হয় না, অতিরঞ্জিত হতে পারে।

তারপর ?

তারপরে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের কথা। বল্লালসেনই যে গৌড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে বাঙলার রাজধানী গৌড় নগরে স্থাপন করেন, সাধারণ ভাবে সেই কথাই মেনে নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মণাবতী কোন নূতন নগর নয়, গৌড়েরই নূতন নাম লক্ষ্মণাবতী। মুসলমান অধিকারের পরে এই নামই লখ্‌নৌতি হয়েছিল।

তবে পাণ্ডুয়া নাম কোথা থেকে এল ?

প্রবাদ যদি বিশ্বাস কর তাহলে বলব যে পাণ্ডব নগর থেকে পাণ্ডুয়া নাম হয়েছে। পাণ্ডবরা এই নগর স্থাপন করেছিলেন, আর পাণ্ডুয়ার সাতাইশ ঘড়া দীঘি খনন করেছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

স্বাতি বলল : অবিশ্বাস্য কথা। পাণ্ডবরা এদিকে আসেন নি।

আমি বললুম : অর্জুন এসেছিলেন পূর্বে মনিপুর পর্যন্ত, ভীমও এসেছিলেন নাগাল্যাণ্ডে।

স্বাতি বলল: প্রবাদ নয়, ইতিহাসের কথা বল।

বললুম: ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা প্রথম উল্লেখ দেখি পুণ্ড্রের, তারপরে পদ্মপুরাণে ও দেবীপুরাণেও দেখি। পুণ্ড্র নামে একটি জাতি এই অঞ্চলে বাস করত। তাদের জীবিকা ছিল রেশম-কীট পালন। তবু আমরা পাণ্ডুয়াকে পুণ্ড্রবর্ধন বলি না, তার কারণ মহাস্থানগড়ে পুণ্ড্রবর্ধনের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এই জায়গার নাম পাণ্ডুয়া না হলে এই স্থানকে পুণ্ড্রবর্ধন বলার আর কোন ঐতিহাসিক যুক্তি নেই।

স্বাতি বলল: তাহলে পাণ্ডুয়া নাম কেন হল, তারও কোন যুক্তি পাওয়া গেল না।

আমি বললুম: এই বাঙলা দেশে আরও একটি পাণ্ডুয়া আছে, সেটিও ঐতিহাসিক স্থান এবং শুনেছি যে তার ঐতিহাসিক নিদর্শন মালদহের পাণ্ডুয়ার চেয়ে কিছু গৌণ নয়।

স্বাতি এবারে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: আমিও সে জায়গা দেখি নি। তবে শুনেছি সেই জায়গার কথা। কলকাতা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে হুগলী জেলায় এই পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো-বসন্তপুর। এর নাম রেখেছিলেন পাণ্ডুদাস নামে কোন রাজা। তিনি নাকি বুদ্ধদেবের পিতৃব্য বংশে পাণ্ডুশাক্য রাজার বংশধর। পাঠান আমলে শাহ সুফি এই নগর অধিকার করে হিন্দু মন্দিরাদি ভেঙে মসজিদে পরিবর্তিত করেন।

স্বাতি বলল: একদিন ইচ্ছা করলেই তো এ জায়গা আমরা দেখে আসতে পারি।

আমি বললুম: খবরের কাগজে আমি খানকয়েক ছবি দেখেছিলুম। একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বজা আজকাল শাহ সুফীর বিজয়স্তম্ভ বলে পরিচিত, আর বাইশ দরজার ধ্বংসাবশেষও অনেকে মন্দির বলে মনে করেন। কালো পাথরের একটি বেদী আছে, কিন্তু কোন বিগ্রহ নেই। আর একটি দর্শনীয় স্থান হল পাণ্ডুরাজার দরবার।

স্বাতি বলল : কোন্ পাণ্ডুয়া প্রাচীন বেশি ?

এটি কঠিন প্রশ্ন।

কেন ?

পাঠান ইতিহাসে হুগলীর পাণ্ডুয়ার চেয়ে মালদহের পাণ্ডুয়া যে প্রাচীনতর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হিন্দুরাজাদের হিসাবে কোন্‌টি পুরনো বেশি তা আমার জানা নেই।

আমরা তখন মালদহ শহর পিছনে ফেলে পাণ্ডুয়ার দিকে অনেক এগিয়ে গেছি। পথে যানবাহন কম, তাই বেগে চলতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না।

২৯

স্বাতি বলল : বল্লালসেনের কোনও কীর্তি এখানে নেই ?

বললুম : গৌড়ে তো দেখলুম না, পাণ্ডুয়াতেও বোধহয় নেই। না থাকলেও এই রাজা তাঁর সামাজিক কীর্তির জন্য বাঙলায় অমর হয়ে থাকবেন। প্রথমত তাঁর লেখা দুখানি বই আজও অনেকে সযত্নে পড়ে থাকেন—অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর। অদ্ভুতসাগর একখানি কৌতূহলোদ্দীপক জ্যোতিষ গ্রন্থ। একজন পণ্ডিতের মতে এই অদ্ভুতসাগর বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার চেয়েও মূল্যবান গ্রন্থ। দানসাগর বইখানি শুধু তাঁর আত্মচরিত নয়, তাঁর দার্শনিক মতও এতে স্থান পেয়েছে। দান সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা সর্বকালের কথা। যে ধন নিজের ভোগে লাগে আর যে ধন দান করা যায় সৎপাত্রে, তাই হল নিজের ধন। সঞ্চয়ের জন্য বা পরের ভোগের জন্য ধন নিজের ধন নয়।

স্বাতি বলল : মন্দ কথা নয়। আকণ্ঠ ভোগ করবার পর যা বাঁচবে তা সৎপাত্রে দান করে যাও।

বল্লালসেন এ কথাও বলেছেন যে অপরকে কষ্ট না দিয়ে যে ধন অর্জন হয়েছে, সেই ধনই দানের যোগ্য।

স্বাতি বলল : সেইজন্যই বুঝি ঔরঙ্গজেব নিজের হাতের লেখা কোরাণ বিক্রির টাকা দানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন !

আমি বললুম : অসম্ভব নয়। সকল ধর্মের সার কথা তো একই। বলবার ধরনটি হয়তো অন্য রকম।

তারপরে বললুম কলকাতার কালীঘাটের কথা। বল্লালসেন তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন ও বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিকদের বিভেদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। শক্তি সাধনা প্রচারের জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এ কথাও শোনা যায় যে বাঙলা

দেশে তান্ত্রিকদের নির্বিঘ্নে ধর্মসাধনার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একটি বিস্তৃত এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন। কলকাতার কালীঘাট ছিল এর কেন্দ্রস্থান।

কিন্তু এর চেয়েও বড় কাজ বল্লালসেনের সমাজ-সংস্কার। তান্ত্রিকরা তাঁকে বলেছিলেন যে কুল হল সমাজের গোড়ার কথা, নিষ্কলুষ কুলোদ্ভবরাই সমাজকে শক্তিশালী করবে। বল্লালসেন নিজে কিছুদিন কুলদেবীর সাধনা করলেন, তার পরে প্রবর্তন করলেন কৌলিন্য প্রথা। সেই প্রথা আজও সম্মানের সঙ্গে চলে আসছে।

এই প্রসঙ্গেই আমার একটি হাসির কথা মনে পড়ল। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: হাসছ কেন?

যে জন্যে হাসি এসেছে তা এই প্রসঙ্গে বললে অন্যায় হবে।

কিন্তু স্বাতি মানল না, বলল: অপ্রাসঙ্গিক হলে তোমার মনে আসত না। নির্ভয়ে বল।

আমি বললুম: এ আমার নিজের কথা নয়, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে কৃষ্ণ মিশ্র সেকালের একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। ভদ্রলোকের নাম অহঙ্কার। দম্ভ নামে একজন কাশীবাসী তাঁর আসার ধরণ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে দক্ষিণরাঢ়ের কোন কুলীন আসছেন। তাই বোধহয় অভ্যর্থনায় ত্রুটি করেছিলেন। অহংকার অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যকে বললেন, একি কোন ম্লেচ্ছের দেশে এলাম নাকি! তারপরে নিজের কুলের গর্ব করতে গিয়ে বলছেন, জান, আমার শালার ভাগনের মেয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটেছিল বলে আমি আমার প্রিয় পত্নীকে পরিত্যাগ করেছি!

স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে, বলল: খুব বীরত্বের কাজ করেছে।

ঠিক এই সময়ে আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার পথের ধারে থেমে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম পথের ধারে। না, সামনে কোন লোকজন পড়ে নি যে

থেমে পড়বার দরকার হয়েছে। তবে কি স্বাতির হাসি শুনেই থামল!

কিন্তু ড্রাইভার তার দরজা খুলে নেমে পড়ল, বলল: এইখান থেকেই পাণ্ডুয়ার আরম্ভ। সেলামী দরজা দেখে নিন। তারপরে বাইশহাজারী নিয়ে যাব।

আমরাও নেমে পড়লুম। আর পথের ডান হাতে দেখলুম একটি সাধারণ গেট। ড্রাইভার বলল: মখদুম পীর এ দেশে এসে এইখানে প্রথম বসেছিলেন, আর প্রার্থনা করতেন এখানে বসে।

স্বাতি আমাব দিকে চেয়ে বলল: এঁর কথাই কি তুমি আমাকে পবে বলবে বলেছিলে?

বললুম: মনে নেই। তবে এঁর সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ জেগেছে কোন লেখা পড়ে। সে সন্দেহের কথা বলতে আমি ভয় পাই।

সেলামি দরজা দেখে আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। বড় রাস্তা ছেড়ে চললুম পূবমুখো। স্বাতি বলল: ভয়েব কথা কেন ভাবছ!

ভাবছি এইজন্যেই যে কোন পীরের সম্বন্ধে অসম্মানজনক কিছু ভাবা উচিত নয়।

স্বাতি বলল: ঠিক কথা। নিজে কোন মন্তব্য না করলেই হল।

তারপরে আমি তাকে জালালুদ্দীন মখদুম শাহ তাব্রেজীর কথা বললুম। ইরানের তাব্রিজ শহরে জন্ম বলে তাঁর নামের পিছনে তাব্রেজী। তেমনি পারস্যের চিস্ত্ শহরে জন্ম বলে শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তি নামে পরিচিত। এঁরা দুজনেই নিজামিয়া মাদ্রাসার কবি শেখ সাদীর সহপাঠী ছিলেন। আর পাঠানদের ভারত আক্রমণের কিছু পূর্বে আসেন ভারতবর্ষে। দুজনেই প্রথমে দিল্লীতে এসেছিলেন, সেখান থেকে চিস্তি গেলেন পৃথ্বিরাজেব রাজধানী আজমীরে, আর মখদুম শাহ লক্ষ্মণাবতী এলেন লক্ষ্মণসেনেব রাজধানীতে। হিন্দুস্থানে এই দুজন হিন্দু রাজাই তখন বলশালী।

চিস্তি নাকি মদিনায় দৈববাণী শুনেছিলেন, হিন্দুস্থানে গিয়ে তাঁকে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিতে হবে। তাই তিনি আজমীরে এসেই শত শত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে ফেললেন। পৃথ্বিরাজকেও মুসলমান হতে বলেছিলেন, আর তিনি রাজী হন নি বলে শাপ দিয়েছিলেন, ধ্বংস হোক পৃথ্বিরাজ, তারপর হিন্দুস্থানের আকাশ ও বাতাস মুখর হবে আজানের ধ্বনিতে।

শোনা যায় যে পৃথ্বিরাজ সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন চিস্তিকে, কিন্তু তাঁকে দমন করেন নি বলে শাস্তি পেয়েছিলেন। বছর কয়েক পরে শিহাবুদ্দিন ঘোরী যখন তাঁকে আক্রমণ করলেন তরাইনে, প্রথমবার তিনি তাদের ঠেকিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পারলেন না, নিজের সেনাদলে বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি হেরে গেলেন। মুসলমানেরাই কৌশলে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল, পৃথ্বিরাজ নিহত হয়েছিলেন।

বাঙলায় এ রকম কিছু হয় নি। মুখদুম শাহ লক্ষ্মণসেনের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলেন। তাঁর অমাত্যদেরও তিনি নানা ভাবে হাত করেছিলেন। শত্রুরা বলে যে এ দেশে তিনি অনেক টাকা এনেছিলেন, জমিদারী কিনেছিলেন বর্ধমানে। আর লক্ষ্মণ-সেনের কাছে জমি পেয়ে পাণ্ডুয়ায় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। গৌড়বাসীকে তিনি নানারকমের উপহার দিতেন। একবার নাকি তিনি মাটির নিচে থেকে একটি কলসী পান—নানা অলঙ্কারে ভরা কলসী। সবচেয়ে ভাল রত্নটি তিনি রাজাকে দিলেন। হলায়ুধ মিশ্র গোবর্ধন আচার্য কবি জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী মধুকর বণিকের স্ত্রী মাধবী এমন কি রাজনর্তকী শশীকলা ও বিদ্যুৎকলাকেও দু-একগাছা করে সোনার কঙ্কন দিলেন। রাণী বসুদেবী এই পীরের কাছে ধর্মকথা শুনতেন, ক্ষমতাশালী অমাত্যরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, ঘনিষ্ঠতা ছিল কবি ও কবিপত্নীর সঙ্গে, রাজদরবারের সকল প্রিয় পাত্রকে

তিনি ভালবাসতেন। যারা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত হেরে গেল।

তারপরে সেই দুর্দিন এল। লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপে বাস করছেন। আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী অতর্কিতে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না। মুসলমানরা গৌড়রাজ্য জয় করল। আর ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে লক্ষ্মণাবতীর সমস্ত মঠ ও মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এই ব্যাপারে পীরের ভূমিকা কি আমরা অনুধাবন করে দেখেছি!

স্বাতি মেনে নিল আমার কথা। বলল: নিশ্চয়ই দেখি নি। যাদের শ্রদ্ধা করি আমরা তাদের সন্দেহ করি না। কিন্তু সন্দেহ করেও যাঁদের উপর শ্রদ্ধা হারাই নে, তাঁরাই মহাপুরুষ।

আমাদের গাড়ি এসে মখদুম শাহর বড় দরগার কাছে দাঁড়াল। পথ বেশি নয়, সিকি মাইলের মতো হবে। দরগা বললে ধারণা ঠিক হবে না, এটি একটি মসজিদ, বাইশহাজারী নামেই বেশি পরিচিত।

স্বাতি বলল: গাড়ি থেকে নামতে হবে নাকি?

আমি বললুম: এস না, দেখি কোন হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন দেখা যায় কিনা।

স্বাতি আর দেরি করল না, টপ করে নেমে পড়ল। আমিও নামলুম। তারপরে ঘুরে ঘুরে দেখলুম চারি ধার। পুরনো মসজিদটি বোধহয় ভেঙে পড়েছিল। এখন আবার সংস্কার হয়েছে তার। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পেলুম। মনে হল যে কোন বৌদ্ধ মঠ বা হিন্দু মন্দিরের উপরেই এই দরগাটি নির্মিত হয়েছিল।

এখানেই একটি পুকুরের ধারে একটা দালানের নাম লক্ষ্মণসেনী দালান। রাজা লক্ষ্মণসেন নয়, অন্য কোন লক্ষ্মণসেন এটি তৈরি করেছিলেন। এর ব্যবহার হত বৈঠকখানা রূপে।

গাড়িতে যখন ফিরে এলুম তখন স্বাতি একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপরে তাকাল হাতের ঘড়ির দিকে। বলল : এমনি করে দেখতে হলে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলে যেতে হবে।

বেলা যে বেড়েছে তা উত্তাপেই বুঝতে পারছি। কাজেই গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললুম : দেখবার জায়গা এখানে আর কী আছে?

ড্রাইভার বলল : বড় দরগা দেখলেন, এবারে ভাণ্ডারখানা ছোট দরগা দেখাব। তারপরে পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ আর কুতবশাহী মসজিদ দেখিয়ে আদিনায় নিয়ে যাব।

তারপর?

তারপর সাতাশ ঘড়া জামি মসজিদ নিমাসরাই স্তম্ভ।

স্বাতি বলল : সবই এই পাণ্ডুয়ায়?

ড্রাইভার বলল : জামি মসজিদ পুরনো মালদহের দক্ষিণে মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমের কাছে। আর নিমাইসরাই স্তম্ভও তার কাছে নিমাসরাই গ্রামে। ফজল বিবির নাম শুনেছেন?

আমি উত্তর দিলুম : শুনি নি।

ফজল বিবির নামেই তো ফজলি আম। তিনি ঐ নিমাসরাই গ্রামে বাস করতেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : একটা নতুন কথা জানা গেল।

ড্রাইভার বলল : নিমাসরাই স্তম্ভ আপনাদের ফেরার পথে দেখাব। ফিরোজমিনারের মতো উঁচু নয়, উপরের দিকটা ভেঙে পড়েছে। কেউ বলে মোল্লারা আজান দিত ওর উপর থেকে, কেউ বলে না, শত্রু আক্রমণ করতে এলে ওর উপরে মশাল জ্বেলে রাজধানীর লোক সতর্ক করা হত, আর শান্তির দিনে প্রদীপ জ্বালানো হত।

স্বাতি বলল : ভাণ্ডারখানা কী?

ড্রাইভার বলল : দালান একটা।

দেখবার কিছু আছে?

কোন উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার মাথা নাড়ল।

স্বাতি বলল: তবে থাক ও জায়গা।

এই প্রস্তাব শুনে ড্রাইভার খুশী হল, বলল: নিজের ইচ্ছেয় কিছু বাদ দিলে আপনারা রাগ করেন কিনা, তাই সব জায়গাতেই নিয়ে যাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ছোট দরগা আর সোনা মসজিদ?

সেও এই রকম। দেখে দেখে আমাদের ঘেন্না ধরে গেছে।

ততক্ষণে আমরা বড় রাস্তায় ফিরে এসে উত্তর দিকের পথ ধরেছিলুম। ড্রাইভার থামল না, বলল: আমাদের আর দেখাতে আপত্তি কী! রাস্তার এধারে আর ওধারে, গাড়ি থেকে আপনাদের নামিয়ে দেওয়া আর তুলে নেওয়া।

একই দৃশ্য দেখে দেখে আমাদেরও ক্লান্তি এসেছিল। তাই বললুম: ছোট দরগায় কী দেখবার আছে?

একটা পুরনো বাড়ির অনেকটা ভেঙে পড়েছে, আর মসজিদটি একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একটি থামের উপরে পাথরের তৈরি মকরের মুখ আছে একটি, জল নিকাশের ব্যবস্থা। এটি দেখে অনেকে বলেন যে এও এক সময় বৌদ্ধ বা হিন্দুর কীর্তি ছিল, নাম ভাসেশ্বরী। একটুখানি উত্তরে গেলে কুতবশাহী মসজিদ, লোকে পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদও বলে। উপরের গম্বুজগুলো নীল রঙের ইটে তৈরি বলে সোনার মত দেখাত। মখদুম পীর এই মসজিদ তৈরি করে নাম রেখেছিলেন কুতবশাহী।

এই সব মসজিদের কাছাকাছি আমরা এসে গিয়েছিলুম। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম: ফেরার পথে এ সব দেখব।

ড্রাইভার বলল: তাহলে একলাখী মসজিদ দেখে চলুন আদিনায়। সেখানে আপনাদের অনেক সময় লাগবে।

খানিকটা এগিয়েই বাঁ দিকের পথ ধরে আমরা একলাখী মসজিদের সামনে পৌঁছে গেলুম।

এটি একটি সমাধি স্থান। উপরে একটি গম্বুজ ও ভিতরে তিনটি কবর। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ঘুরে দেখলুম সবকিছু। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল যদু জালালুদ্দিন। কানিংহাম সাহেব মনে করেন যে এই কবর তিনটি যদু ও তাঁর স্ত্রী পুত্রের। রাজা গণেশ এখানে যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যদু তাই ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

মসজিদের গায়ে এখনও অনেক কারুকার্য আছে। এটি তৈরি করতে যে একলাখ টাকা খরচ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি বললুম: কালাপাহাড়ের কথা তোমার মনে পড়ে?

স্বাতি বলল: নামটিই শুধু জানি।

বললুম: কালাপাহাড় এই গৌড়েই সেনাপতি ছিল সুলেমান খান বর্ণানি ও দাউদ শার। যদুর মতো কালাপাহাড়ও হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিল। নাম ছিল রাজু। কোন নবাব-নন্দিনীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিল, আর সারা জীবন ধরে ধ্বংস করেছিল হিন্দুর মন্দির আর দেবদেবী। তার মতো হিন্দু দেবদ্বেষী ইতিহাসে আর একটি নেই।

আমাদের গাড়ি তখন আদিনার দিকে ছুটেছে। একলাখী মসজিদ থেকে মাইল দুই দূরে এই মসজিদ। বাঙলা দেশে এত বড় মসজিদ নাকি আর নেই। কিন্তু স্বাতি তখনও কালাপাহাড়ের কথা ভাবছিল। বলল: আসাম বাঙলা উড়িষ্যা, এমন কি কাশীতে পর্যন্ত কালা-পাহাড়ের অত্যাচারের কথা শুনেছি।

বললুম: কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছে কেমন করে জান?

না।

আকবরনামায় আছে যে মোগলের তোপে কালাপাহাড় উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জীতে আছে অন্য কথা। জগন্নাথ-দেবকে আগুনে পুড়িয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল বলে তার হাত-পা খসে যায়। তার মৃত্যু হয় এই পাপে।

আদিনার মসজিদে যখন পৌঁছলুম সূর্য তখন মাথার উপরে উঠেছে। একটি বিরাট এলাকা জুড়ে এই মসজিদ। আমাদের গাড়ি পূর্ব দিকের একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম।

সামনে প্রশস্ত অঙ্গন অনাদৃত পরিত্যক্ত। চারিদিকের অনেক কিছু ভেঙে পড়েছে, দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দিকের ঘরগুলি। উঠোন পেরিয়ে আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করলুম। শোনা যায় যে এই মসজিদে দশ হাজার মুসলমান এক সঙ্গে নামাজ পড়ত। প্রায় ছশো বছর আগে সিকান্দার শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সাতাশ ঘরের প্রাসাদ ছিল এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। এখন নাকি সেখানে একটি স্নানাগার শুধু আছে।

আদিনা মসজিদের এক অংশের নাম বাদশাহ কি তখ্‌ৎ। একুশটি থামের উপর এই বসবাব জায়গা। গৌড়েব বাদশাহ সেখানে বসতেন। মেয়েদেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

আর এক ধারে আমবা একটি সিংহাসন দেখতে পেলুম। নিচে থেকে কয়েকটি পাথরের ধাপ উপরে উঠে গেছে। তার উপরে সুন্দর কারুকার্য, শুধু জ্যামিতির নক্সা নয়, দেবদেবীর মুখও আছে। পশ্চিম দিকের একটি দরজা দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে দরজার চৌকাঠের কারুকার্যও দেখলুম এমনি সুন্দর। এগুলি যে বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কাউকে এ কথা বলে দিতে হয় না, একবার তাকালে এই কথাই প্রথমে মনে আসে।

স্বাতি বলল : হিন্দু রাজাদের কোন কীর্তি এখানে নেই কেন তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

আমি বললুম : সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করাই হিন্দুর ধর্ম। কিন্তু হিন্দুর ধর্মকে সবাই শ্রদ্ধা করে না। আমাদের দুর্ভাগ্য হল এইটে।

স্বাতি কোন উত্তর দিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম।

১০

ফেরার পথে স্বাতি বলল: কেন জানি না, আজ বারে বারে বাবা মার কথা মনে পড়ছে।

আমি বললুম: তাই তো স্বাভাবিক।

কেন বল তো?

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

আমি বললুম: ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ওঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এমন করে শুধু দুজনে তো কোথাও বেরই নি।

তাই কি!

বলে স্বাতি ভাবতে লাগল।

মনে মনে আমিও আমাদের সমস্ত অতীতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিলুম। গত পূজার সময় আমাদের পরিচয়ের দুটি বছর পূর্ণ হয়েছে। অথচ কত দীর্ঘ দিনের মনে হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধ। কটা দিনই বা আমরা একত্রে কাটিয়েছি। গোটা দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেছি এক সঙ্গে। তারপরে দিল্লীতে কাটিয়েছি কয়েকটা দিন। পরের বছর রাজস্থান সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ভ্রমণ করেছি এক সঙ্গে। আর এ বছর হিমাচল ও কাশ্মীরে আমরা একত্রে ছিলুম। এই ভেবে আশ্চর্য হলুম যে এত অল্প সময়ে মানুষ এমন অন্তরঙ্গ হয় কী করে!

আমি জানি যে কলকাতা বা দিল্লীতে মামার ড্রয়িংরুমে এসে দিনের পর দিন বসে থাকলেও এই ঘনিষ্ঠতা আমাদের হত না। এই ঘনিষ্ঠতার জন্ম একত্র ভ্রমণের আনন্দ থেকে। ঘরের বাহিরে মানুষ আত্মীয় হয় এক নিমেষে। রাজস্থানে গেলে দক্ষিণ-ভারতীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, আর পাঞ্জাবীর সঙ্গে আত্মীয়তা হয় আসামে। ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে ভারতীয় ছেলে ইতালীর মেয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে।

পালামৌ ভ্রমণের সময় সঞ্জীবচন্দ্র বোধহয় এই রকম কোন কথা

বলেছিলেন। দেশে বাঙালী প্রতিবেশীর সঙ্গে লড়ে, আর বিদেশে দেখা হলে সেই প্রতিবেশী হয় নিতান্ত আপন জন। আমরা তো আত্মীয়র মতো ছিলুম, দেখাশুনো ছিল না বলেই পরস্পরকে চিনতুম না। নতুন করে যখন পরিচয় হল তখন জানলুম যে আমার মা মানুষ হয়েছিলেন মামার বাড়িতে। কিন্তু এই মামা যে মায়ের ভাই নন, তা জেনেছিলুম অনেক দিন পরে। প্রথম দেখা হতেই মামী আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্বাতি আমার বোন, আর তার কিছু দিন পরে মামা স্বীকার করেছিলেন যে আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা পাতানো। সেদিন থেকে মামীর দুশ্চিন্তা বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল, আর চোখে চোখে রেখেছিলেন মেয়েকে, ভাল ছেলে দেখলেই সম্বন্ধ করেছেন তার সঙ্গে। আমার সামনেই তো রানার সঙ্গে সম্বন্ধ করলেন, তারপরে জো রায়ের সঙ্গে। তার আগেও একটা সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু কোন সম্বন্ধই পাকা হয় নি। মামীর আন্তরিক চেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

স্বাতি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলল : কী ভাবছ বল তো ?

বললুম : তোমার মায়ের কথা।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি খুবই আশ্চর্য হল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

আমি নিজে থেকেই বললুম : একদিন তোমার সম্বন্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, আমার সঙ্গে দশ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দিতেও কত দ্বিধা করতেন।

স্বাতি তার ঠোঁটের কাছে তর্জনী আনল। বুঝতে পারলুম তার ইঙ্গিত, তাই অত্যন্ত সাবধানে বললুম : আজ এমন করে তোমায় ছেড়ে দিলেন কোন্ সাহসে তাই ভাবছি।

আনন্দে উজ্জ্বল হল স্বাতির দু চোখ, বলল : মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন কেন ভাবছ !

তবে কি তুমি জোর করে চলে এসেছ ?

হাসতে হাসতে স্বাতি বলল : আমার বয়ে গেছে।

তবে ?

এসেই তো তোমাকে বলেছি, মিস্টার চাওলা আমাকে প্লেনে চড়িয়ে ছাড়লেন।

তার কথা শুনে আমিও হাসলুম, বললুম : সত্যি, ভারি দুষ্টু ঐ লোকটা।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ তখন আমরা ছাড়িয়ে এসেছি। পথ চলেছে সোজা দক্ষিণমুখো। পুরনো মালদহ শহর ছাড়িয়ে আমরা ইংলিশ বাজারের একটা হোটেলে যাব, সেখানে দুপুরের আহার সেরে স্টেশনে যাব বিশ্রামের জন্য। বিকেলবেলায় আমাদের ট্রেন। সেই ট্রেন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে পৌঁছবে। স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে উঠব কলকাতার ট্রেনে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পরে স্বাতি বলল : গৌড়ে শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় কিছু পাওয়া গেল না।

আমি বললুম : তার জন্যে ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে।

স্বাতি বলল : ইতিহাসের অনেক কথাই তো শুনলাম, শুষ্ক ইতিহাস আমার ভাল লাগে না।

তোমার কেন, কারও ভাল লাগে না।

কারও বোলো না, বল অনেকের। ইতিহাস নিয়ে ডুবে থাকতে পারে এমন লোক আমি দেখেছি। আবার ইতিহাসের নামে জ্বর আসে, এমন লোকেরও অভাব নেই।

আমি বললুম : মুশকিল হয়েছে এই যে গৌড় আমাদের বাঙলার ইতিহাস। শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ হিউয়েন চাঙের কথায় বেঁচে আছে, পুণ্ড্রবর্ধন চাপা পড়েছে মাটির নিচে, শুধু গৌড় আছে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে। ধর্মপালের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখি, কিন্তু বল্লাল-

সেনের সমাজ-সংস্কার আর লক্ষ্মণসেনের শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগ বাঙালী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : লক্ষ্মণসেনের কোন কীর্তির কথা তো বল নি।

বললুম : বলি নি এইজন্যে যে লক্ষ্মণসেনকে চিনবার জন্যে বাঙালী কোন চেষ্টা করে নি। লক্ষ্মণসেন যখন তাঁর পিতামহসহ বিজয়সেনের স্থাপিত রাজধানী বিজয়পুরে বাস করছেন, তখন সতেরজন তুর্কী সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজী অধিকার করেছিলেন বিজয়পুর। লক্ষ্মণসেন নাকি পালিয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই কাপুরুষ ছিলেন তিনি। এই ঘটনাকে সত্য ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

স্বাতি বলল : এ কথা কি সত্য নয়?

আমি বললুম : সেই কথাই তো আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবকৎ ই নাসিরী নামে একখানা ইতিহাস লিখলেন মীনূহাজুদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক। দুজন সৈনিকের কাছে খবর সংগ্রহ করে তিনি মগধ জয়ের কথা লিখেছেন, আর বিজয়পুর জয়ের কথা নাকি শুনেছিলেন কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে।

স্বাতি বলল : বিজয়পুর আবার কোথায়?

বললুম : নবদ্বীপের পুরনো নাম, লক্ষ্মণসেনের পিতামহ রাজা হয়ে এই বিজয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আর আশী বছর বয়সে বৈষ্ণব লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণাবতী ছেড়ে এসে নবদ্বীপে বাস করছিলেন। মীন্হাজুদ্দিনের কথা সত্য হলেও বৃদ্ধ রাজাকে আমরা দায়ী করতে পারি নে। তাঁকে আমরা দোষী করতে পারি অন্য কারণে, তুর্কী আক্রমণের জন্য তিনি হয়তো তৈরি ছিলেন না। এই আক্রমণ অনিবার্য ভেবে অনেক আগেই তাঁর এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

লক্ষ্মণসেন যে দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কুমার লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতা ও পিতামহের সময় নানা দেশে অভিযান করেছেন। পিতামহের আমলেই বোধহয় তিনি কলিঙ্গ ও কামরূপ

জয় করেছিলেন। শুধু পুরীতে নয় কাশী ও প্রয়াগেও তিনি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। মগধে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল সুদৃঢ়ভাবে। শুনে আশ্চর্য হবে যে লক্ষ্মণসেন রাজা হয়েছিলেন ষাট বছর বয়সে আর মাত্র কুড়ি বছর রাজ্যসুখ ভোগ করেন।

সহাস্যে স্বাতি বলল : বুড়ো বয়সে রাজ্যসুখ!

আমিও হেসে বললুম : যা সম্ভব তাই করেছিলেন। পঞ্চরত্ন সভা ছিল তাঁর। ধোয়ী শরণ গোবর্ধন উমাপতিধর ও জয়দেব ছিলেন তাঁর সভাকবি। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। মখদুম পীর এই হলায়ুধ মিশ্রকেও হাত করেছিলেন।

পুরাতন মালদহের কাছাকাছি যে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম তা বুঝতে পারলুম ড্রাইভারের প্রশ্নে। সে জিজ্ঞাসা করল : আমি মসজিদ দেখবেন তো?

স্বাতি তৎপর ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল : না।

নিমাসরায়ের স্তম্ভ?

তাও দেখব না।

আমি বললুম : এখন আমাদের একটা ভাল হোটেলে যাবার ইচ্ছা।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে বলল : আচ্ছা।

আবার আমরা গল্পে মন দিলুম, বললুম : আমি একটা কথা শুনেছি। বল্লালসেনের বিজ্ঞান গ্রন্থ অদ্ভুতসাগর শেষ করেছিলেন লক্ষ্মণসেন। তিনি নিজে যে সুকবি ছিলেন তার প্রমাণ রেখে গেছেন কয়েকটি শ্লোকে। বৈষ্ণব কবি জয়দেবের নাম আজ কে না জানে। তাঁর গীতগোবিন্দ একখানি চিরকালের সম্পদ। এই জয়দেব তাঁর রাজার সম্বন্ধে কী বলেছেন জান?

স্বাতি মাথা নাড়ল।

আমি বললুম : বলেছেন, দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্। তোমাকে দেখেই আমরা খুশী। হলায়ুধ ও শ্রীধরদাসও তাঁকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলে মনে করতেন।

এর পরে আমি সঙ্গীতের কথা বললুম ঃ তুমি তো গান ভালবাস, রাগরাগিণীও জান।

স্বাতি বলল ঃ তুমি কি গম্ভীরার কথা বলবে।

আমি বললুম ঃ না। আমি বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর কথাই বলছি। গৌড় মল্লার গৌড় কৌশিক কর্ণাট গৌড় এ সব রাগিণীর নাম নিশ্চয়ই জান।

স্বাতি বলল ঃ নামই শুধু জানি।

তাহলেই হবে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভা একদিন সঙ্গীতের জন্যও বিখ্যাত ছিল। নামকরা সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁব সভায় আসতেন নানা দেশ থেকে। একটা গল্প শুনবে?

গল্পের নামে স্বাতি খুশী হল, বলল ঃ বেশ তো।

আমি বললুম ঃ এ গল্প কিন্তু ইতিহাসের গল্প নয়, এ গল্প আছে সেকশুভোদয়ায়।

স্বাতি বলল ঃ তাহলে আরও ভাল লাগবে।

জিজ্ঞাসা কবলুম ঃ কবি জয়দেবের জীবনী বোধহয় জান?

স্বাতি বলল ঃ না।

জয়দেব আমাদের বীরভূম জেলার মানুষ, অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্বে তাঁর জন্ম। পিতাব নাম ভোজদেব, আর মা বামাদেবী। ব্রাহ্মণ তাঁরা। ছোট থেকেই রাধাকৃষ্ণের কথা জয়দেবের ভাল লাগে, গান বাঁধে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে। কিন্তু বাঙলা দেশে তখন বল্লালসেনের বাজত্ব। ঘোর তান্ত্রিক তিনি। জয়দেব তাই নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁর গীতগোবিন্দ গেয়ে শোনালেন দেশবাসীকে। সেইখানেই তাঁর বিবাহ হল দক্ষিণদেশী কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে। তিনি দেবদাসী ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে জয়দেব তাঁর গ্রামে ফিরলেন। বৈষ্ণব লক্ষ্মণসেন শুনলেন তাঁর কথা। আদর করে ডেকে আনলেন তাঁর

সভায়, সভাকবির আসন দিলেন তাঁকে। এর পরে আমাদের গল্প শুরু হল।—

দিগ্বিজয়ী গায়ক বুঢ়ন মিশ্র এসেছেন উড়িষ্যা থেকে। গান গাইবেন লক্ষ্মণসেনের সভায়। প্রথমে গাইলেন গাঙ্গোনটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা। রাজবাড়ির বাহিরে এক বণিকের বউ জল তুলতে এসেছিল। তন্ময় হয়ে সে-গান শুনছিল। তারপর কলসীতে দড়ি না পরিয়ে নিজের ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে কুয়োয় নামিয়ে দিল। সভাসদরা বলল, অদ্ভুত গান গেয়েছেন বিদ্যুৎপ্রভা।

তারপর বুঢ়ন মিশ্র আলাপ করলেন পঠমঞ্জরী রাগে। গান শেষ হলে দেখা গেল যে একটা পিপুল গাছের সমস্ত পাতা ঝরে গেছে। সভসদরা বলল, এ আরও ভাল গান হল, জয়পত্র এঁরই পাওয়া উচিত।

কিন্তু রাজা তাঁকে জয়পত্র দিতে পারলেন না। জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী আসছিলেন গঙ্গাস্নান করে, রাজসভায় গান হচ্ছে শুনে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, একি, বিদেশ থেকে গায়ক এসে আমাদের রাজার জয়পত্র নিয়ে যাবে। আমি গাইব গান।

সবাই বলল, বেশ, এবারে তোমার গুণ দেখি।

পদ্মাবতী গান্ধার রাগে আলাপ করলেন। আর কী আশ্চর্য! মাঝগঙ্গার সব নৌকো গানের টানে পারের কাছে চলে এল। বাহবা দিয়ে উঠল সভাসদরা, বলল, গাছের তো প্রাণ আছে, নৌকো হল নিষ্প্রাণ। নৌকো যে টেনে আনতে পারে সেই হল বড় গুণী।

কিন্তু বুঢ়ন মিশ্র হারবার পাত্র নন, বললেন, এ দেশের পুরুষ কি গাইতে জানে না যে আমার সঙ্গে বিচার হবে স্ত্রীলোকের।

এর উত্তরে পদ্মাবতী তাঁর স্বামীকে ডেকে আনলেন। সব শুনে জয়দেব বললেন, পিপুল গাছের পাতা ঝরেছে, সে তো প্রতিবছরই ঝরে। গান গেয়ে ঐ নিষ্পত্র গাছটি সপত্র করুন দেখি, তবে বুঝি গায়ক!

বুঢ়ন মিশ্র বললেন, অসম্ভব এই কাজ।

জয়দেব বললেন, তবে দেখুন।

বলে তিনি বসন্ত রাগের আলাপ শুরু করলেন। সভাসদেরা সব গাছের দিকে চেয়ে রইল অপলক চোখে। গাছের পাতা গজাচ্ছে। কচি কচি সবুজ পাতায় ছেয়ে যাচ্ছে শুকনো ডালপালা। গান যখন থামল, নতুন পাতায় সেই গাছ তখন অপরূপ দেখাচ্ছে। জয়দেবের নামে জয়ধ্বনি উঠল লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়।

আমাদের গাড়ি তখন একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নেমে পড়লুম। কিন্তু স্বাতির নামতে একটু দেরি হল। গানের কথায় সে বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।

হোটেলে খেয়ে আমরা স্টেশনে চলে গেলুম, বিশ্রাম নিলুম স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। খেজুরিয়া ঘাটের ট্রেন এল পাঁচটার পরে। ভিড় নেই, স্বচ্ছন্দে আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। মালপত্র আমাদের অল্পই ছিল, সময়মতো ক্লোকরুম থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলুম।

স্বাতি বলল : যাত্রীর নমুনা দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে।

আমি বললুম : কী রকম ?

স্বাতি বলল : ওপারের গাড়িতেও জায়গা পাওয়া যাবে।

তা যাবে। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

সন্ধ্যা সাতটায় আমরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছব, আটটায় স্টিমার। ওপারে পৌঁছতে নিশ্চয়ই ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপরে যদি এমনি একটি ফাঁকা গাড়ি পাওয়া যায়—

স্বাতি বলল : বুঝেছি।

তার মুখে কোন দুর্ভাবনা দেখলুম না, দেখলুম কৌতুকে ভরা প্রসন্ন হাসি। তার মনের কথা বুঝতে পারলুম না। তাই বললুম : একা কলকাতায় যেতে তোমার ভয় করবে না তো ?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : খুব ভয় করবে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়েছিল। গার্ডের বাঁশি বাজল। তারপরে ইঞ্জিনের কর্কশ বাঁশিও শুনতে পেলুম। গাড়ি যখন এক পা দু পা করে চলতে শুরু করেছে, তখন এক ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়লেন। তাঁর হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ, আর মুখে প্রচুর উদ্বেগ। স্বাতি বোধহয় ভয় পেয়েছিল তাঁকে দেখে, ওধারের বেঞ্চ থেকে উঠে আমার পাশে এসে বসল। আস্তে আস্তে আমি বললুম : ভয় নেই, মুখের উদ্বেগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে

ভদ্রলোক আমাদেরই মতো যাত্রী, কোন কারণে দেরি হয়ে গেছে আসতে।

ভদ্রলোক ততক্ষণে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। স্থির হয়ে বসে বললেন: আপনাদের ডিস্টার্ব করার জন্যে খুবই দুঃখিত। পরের স্টেশনে আমি নেমে যাব।

আমি বললুম: কলকাতা যাবেন তো?

ভদ্রলোক বললেন: না। আমি খেজুরিয়া ঘাটে থাকি. সকালের ট্রেনে একটা কাজে এসেছিলুম মালদয়।

তবে পরের স্টেশনে নামবেন কেন?

সরলভাবে ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের অসুবিধা হবে বলে।

আমি বললুম: কিছু অসুবিধে নেই, বরং গল্প করে সময় কাটানো যাবে।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বোধহয় নিশ্চিন্ত হলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকবার পরে আমি আবার কথা কইলুম, বললুম: আমরাও আজ একটি দিন মালদয় কাটালুম। দার্জিলিঙ থেকে ফেরার পথে এখানে নেমেছিলুম, এবারে কলকাতায় যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন: গৌড় পাণ্ডুয়া দেখলেন বুঝি?

আমি বললুম: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন: আমার ওসব ভাল লাগে না। শুধু দরগা আর মসজিদ, আর সব একই রকম ব্যাপার। দু-একটা দেখবার পরেই শখ মিটে যায়।

স্বাতি বলল: তবে মালদয় আপনার কী ভাল লাগে?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: মালদর আম সিল্ক আর গম্ভীরা গান।

স্বাতি উজ্জ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি জানি যে সে গম্ভীরা গানের কথা শুনতে চায়। তাই বললুম: মালদর

আমের খ্যাতি তো জানি, আজকাল শুনছি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু এখন তো আমের মরসুম নয়।

ভদ্রলোক বললেন: তাতে কী হয়েছে! এখন আমসত্ত্ব আমের চাটনি ম্যাংগো ক্রাশ টিনে ভর্তি আমের অনেক কিছু পাবেন। কেনেন নি কিছু?

স্বাতি বলল: না।

সিল্কের বাজার দেখেছেন?

আমি বললুম: তাও দেখি নি।

ভদ্রলোক তাঁর ব্যাগ খুলে এক টুকরো সিল্ক আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন: জামার জন্যে কিনেছি। বেশ মজবুত সিল্ক। জানেন তো, এখানকার সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রি খুব পুরনো। এক ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম যে আকবর বাদশাহ নাকি তাঁর পরিবারের ব্যবহারের জন্যে ঢাকার মসলিন আর মালদর সিল্ক নিতেন। গৌড় জয় করে রাজস্ব হিসাবে এই জিনিস নিতেন।

স্বাতিকে আমি বললুম: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই কী বলেছেন জান? পণ্ডিতদের মতে রেশমের জন্মস্থান হল চীন, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। ভারতে রেশমের চাষ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে আছে যে বাঙলা দেশে খ্রীষ্টের জন্মের তিন চারশো বছর আগে থেকেই রেশমের চাষ আছে।

আশ্চর্য হয়ে ভদ্রলোক বললেন: সত্যি নাকি!

আমি হেসে বললুম: সত্যি মিথ্যে পণ্ডিতরা জানেন।

স্বাতি সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সিল্কের টুকরোটা ভদ্রলোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়েই প্রশ্ন করল: গম্ভীরা গান আপনি শুনেছেন?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন: শুনেছি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: গঙ্গার উপরে বাঁধ তৈরির কাজে এসে অনেক দিন এখানে আছি তো, একবার শুনেছি

এই গান। গান নয়, একে উৎসব বলা উচিত। শঙ্করাচার্যের প্রভাবে নাকি কোন বৌদ্ধ উৎসব গম্ভীরায় পরিণত হয়েছে। তিন চারদিন ধরে নাচ গান হয়। গানের বিষয়বস্তু শুধু পৌরাণিক নয়। দেশের কথা সমাজ ও রাজনীতির কথা কিছুই বাদ পড়ে না। বেশ ইণ্টারেস্টিং মনে হয়েছিল।

এর বেশি ভদ্রলোক কিছু বলতে পারলেন না, তাই আমি তাঁকে ফরাক্কার বাঁধের কথা জিজ্ঞাসা করলুম: গঙ্গার উপরে পুল হতে আর কত দিন লাগবে?

ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে বললেন: সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। বছর কয়েক তো কেটে গেল, কাজের নমুনা দেখে শেষ হবার ভরসা আর রাখি না।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার এল নেমে, আমাদের উত্তমও যেন ফুরিয়ে গেল। দিনের আলোর সঙ্গে আমাদের একটা নাড়ির সম্বন্ধ আছে। যতক্ষণ আলো আছে আকাশে, ততক্ষণই আমাদের সাহস ও উত্তম। অন্ধকার অবসাদ আনে। সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহটাকে তখন এই অবসন্ন মন আর সক্রিয় রাখতে পারে না। নিঃশব্দে আমরা বসে রইলুম।

সন্ধ্যা সাতটার পরে ট্রেন এল খেজুরিয়া ঘাট স্টেশনে। বিচিত্র এই ঘাট পারাপারের অভিজ্ঞতা। পাকা স্টেশন এখানে হয় না, উঁচু পারের উপরে একসারি বাঁশের ঘর। তারই মধ্যে সব অফিস, রিফ্রেশমেণ্টরুম। ট্রেন স্টেশনে ঢুকবার আগেই সারি দিয়ে কুলিরা সব দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন থামতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ির উপরে। যাত্রীদের বাক্স পেঁটরা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দেয়। পূজার সময় যখন যাত্রীর ভিড় বাড়ে, তখন দরাদরি করে আগে থেকেই। পাঁচ টাকার কম কেউ মালপত্র ছোঁবে না। আগে রফা করতে গেলেই বিপদ, না করলেও বিপদ। আইনে এর প্রতিবিধান আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেই। এক মণ বা সাঁইত্রিশ কেজি মালের জন্য ছ আনা

বা চল্লিশ পয়সা দিতে হবে। কিন্তু এ মজুরিতে রাজী কেউই নয়। কাজেই অতিরিক্ত কিছু দিতেই হবে।

ট্রেন থেকে নেমে আমরা স্টিমারের দিকে অগ্রসর হলুম। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোক বিদায় নিলেন স্টেশনেই। তাঁর অন্য পথ, তিনি সেই দিকে পা বাড়ালেন।

কুলিরা আমাদের মালপত্র নিয়ে ছুটছিল। স্বাতি বলল: আমাদেরও ছুটতে হবে নাকি!

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি কুলিদের ডাকলুম। বললুম: ধীরে চল।

কিন্তু ধীরে চলবে কে! যাদের মাথায় ভারি বোঝা আছে তারা তো ছুটছেই, যাদের হাল্কা বোঝা তারাও ছুটছে অভ্যাসের দোষে। বাধ্য হয়ে আমরাও তাড়াতাড়ি এগোলুম।

মাটির পথ খানিক দূর এগিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। মাটি এখন শক্ত, ধুলোবালিও কম। শীতের শেষে ধুলো উড়তে শুরু করবে, বালির উপর দিয়ে চলতে কষ্ট হবে। তারপর বর্ষা নামলে কষ্টের আর সীমা থাকবে না। নদীর ঘাট তখন আর দূরে থাকবে না, স্টেশনের কাছে আসবে এগিয়ে।

এইবারে আমরা স্টিমার দেখতে পেলুম। অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হুড়মুড় করে যাত্রীরা গিয়ে উঠছে, দুপদাপ করে তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে। সোরগোলেরও অভাব নেই।

স্টিমারের উপরতলায় আমাদের উঠতে হল। নিচে থার্ড ক্লাস, সেকেণ্ড ও ফার্স্ট ক্লাস উপরে। এক ধারে ফার্স্ট ক্লাস, অন্য ধারে সেকেণ্ড, মাঝখানে রেস্তোরাঁ। কুলিরা আমাদের মালপত্র ফার্স্ট ক্লাসে নামিয়ে রেখেছিল। আমরা এসে পৌঁছতেই মাল বুঝিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল। প্রাপ্যের চেয়ে বেশি পেয়েও সন্তুষ্ট হয় নি, বকশিশ চেয়েছে। এখানকার রীতিই এই।

স্বাতি বলল: পিছনে নয়, আমরা সামনে বসব।

গদি-আঁটা বড় বড় চেয়ার সামনে, পিছনে লম্বা বেঞ্চ, তাও গদি আঁটা। দু-একজন মাত্র যাত্রী এই দিকে। তাঁরা ডেকের রেলিঙের ধারে বসেছেন।

স্বাতির পাশে পাশে আমি এগিয়ে গেলুম, বসলুম তার পাশে।

ঘন অন্ধকারে পৃথিবী এখন আবৃত। দিগন্তের সীমানা দেখা যাচ্ছে না। জলে আর আকাশে কোন পার্থক্য নেই। আকাশের তারার ছায়া জলের উপরে প্রতিফলিত হয়ে জলকেও এখন আকাশ বলে মনে হচ্ছে। স্বাতি সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: আজ এমন অন্ধকার কেন বল তো?

আমি সংক্ষেপে বললুম: কৃষ্ণপক্ষ বলে।

কৃষ্ণপক্ষে কি চাঁদ ওঠে না?

ওঠে দেরিতে।

আর কত দেরিতে উঠবে?

তিথিটা জানতে পারলে অনুমান করতে পারব।

সামনের দিক থেকে বাতাস আসছিল জোরে জোরে। শীতল বাতাস। স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল: তোমার শীত করছে না তো!

বললুম: না।

স্বাতি বলল: না না, ভাল নয় ঠাণ্ডা লাগানো। স্টিমার ছাড়লে বোধহয় আরও বেশি ঠাণ্ডা লাগবে।

বলে সে পিছনের দিকে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরেই আবার ফিরে এল একখানা গরম চাদর হাতে। বলল: এখানা গায়ে জড়িয়ে নাও।

বলে নিজেই জড়িয়ে দিল গায়ে।

আমি বললুম: তুমি কিছু গায়ে দিলে না?

স্বাতি তার শাড়ির আঁচল দেখিয়ে বলল: আমার দরকার নেই।

আমি বললুম : আমার কি দরকার ছিল !

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : অসুখ করলে কে দেখবে তোমাকে !

তার উত্তর শুনে আমি হাসলুম। স্বাতি বলল : এ হাসির কথা নয়। ভারি অসাবধানী তোমরা। চোখে চোখে না রাখলেই বিপদ বাধাও।

আমি বললুম : আঁচল দিয়ে তাহলে ঢেকে রাখ।

স্বাতি লজ্জা পেয়েও হার স্বীকার করল না, বলল : তাই রাখতে হবে।

তারপরেই আমরা সেই সুন্দর দৃশ্যটি দেখতে পেলুম। চাঁদ উঠছে, চতুর্থীর চাঁদ। আমাদের ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

স্বাতি এগিয়ে গেল রেলিঙের কাছে। আমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। গঙ্গার জল স্টিমারের গায়ে লেগে কলকল করছে, তারার আলোয় ছলছল হয়েছে জলের ধারা। কোন কথা নেই, কোন গান নেই, নেই কোন গভীর গম্ভীর ভাবনা। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম স্বাতির চোখের দিকে। মুখে কোন কথা এল না।

কয়েকটা মুহূর্ত আমাদের কেটে গেল।

অস্পষ্টভাবে স্বাতি বলল : কী ভাবছ ?

তোমার ব্রাউনিঙের কথা এখন মনে পড়ছে।—

Let us be unashamed of soul,

As earth lies bare to heaven above.

উপরের আকাশের কাছে পৃথিবী যেমন নগ্ন, তেমনি মনের জন্যে আমাদের লজ্জা কেন।

স্বাতি বলল : লজ্জার কথা নয়, আমি ভাবছি অন্য কথা। যে মুহূর্তটি জীবনে চিরন্তন করতে চাই, তাকে তো ধরে রাখতে পারি নে।—

Just when I seemed about to learn !

Where is the thread now ? Off again !

The old trick !

স্বাতির এই উত্তর আমার ভাল লাগল। নিজের বাসনার কথা বুঝি এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা যায় না। আমি আকাশের চাঁদ একবার দেখলুম, তারপর তাকালুম স্বাতির দিকে। বললুম: খুব সত্যি কথা।—

Only I discern—

Infinite passion, and the pain

of finite hearts that yearn.

বাসনা অসীম, আর তার জন্যে বুকের যন্ত্রণারও যেন শেষ নেই।

॥ গৌড় পর্ব সমাপ্ত ॥

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নতুন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের কাছে তো অপরিহার্য; যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমাব চক্রবর্তীর রম্যাণি বীক্ষ্যব পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। ভ্রমণের শখ তাঁদেব অনেকাংশে মিটবে।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এব অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই কথা। আর বাস্তবিক রম্য-দর্শনই হল বম্যাণি বীক্ষ্যর মূল সুর, তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনাব। ভাবতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোবম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকাব এক ধাবাবাহিক ভারত দর্শনেব কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয স্থানগুলির সবিস্তাব বর্ণনার সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোকিত কুঠরীতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদেব বর্তমান পরিচয দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হযে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয। রম্যাণি বীক্ষ্যর একটিমাত্র খণ্ডও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এ বইযে ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্যকাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। এতে শুধু যে কাহিনীই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই নয, ভ্রমণের রসের ভিতর উপন্যাসের রসেরও

অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভ্রমণে যাঁরা ততটা উৎসাহী নন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণরসের সন্ধানী, একমাত্র উপন্যাসের রসের আকর্ষণেই তাঁরাও যে রম্যাণি বীক্ষ্যর প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন তা অসংশয়ে বলা যায়। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী, মামী ও তাঁদের অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। তাঁরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু পদ-মর্যাদা বা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সঙ্গী হিসাবে তার মতো রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও জ্ঞানান্বেষী যুবককে সঙ্গে পাওয়া আনন্দের কথা। মামা তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল দক্ষিণ ভারতের যাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **দক্ষিণ ভারত পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মত সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। মাদ্রাজে, মহাবল্লীপুর ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি ও রামেশ্বরে আমরা দুজনকে পাশাপাশি দেখি। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে এক অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **দ্রাবিড় পর্ব**। তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিদ বেলুর ও শ্রাবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই দ্রাবিড় পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে কালিন্দী

পর্বে। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা অঘোর গোস্বামী গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু মামীর তাতে গভীর আপত্তি। গোপালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজেদের ধনী মানী সমাজে মুখ দেখাতে তিনি ভয় পান।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি চতুর্থ গ্রন্থ **রাজস্থান পর্বে।** দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থস্থান দ্বারকা সোমনাথ ও জুনাগডের কথা **সৌরাষ্ট্র পর্বে** বিবৃত হয়েছে। একদা এই রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি, ষষ্ঠ গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা, মাণ্ডু, বিদিশা ও উজ্জয়িনী, ঝাঁসি সাঁচী খাজুরাহো, নাগপুর ও জব্বলপুর।

সপ্তম অষ্টম ও নবম গ্রন্থ **উৎকল মগধ ও কোশল পর্বে** সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল কল্পতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। মগধ পর্বে শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে একসঙ্গে। তারপরে আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। কোশল পর্বে বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে

তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। কুমায়ুনের শৈলাবাস ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও বাদ পড়ে নি।

দশম গ্রন্থ **হিমাচল পর্বে** গোপাল আবার মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ! শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তাব সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীবের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীবভবানী ও অমরনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তবে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রম্যাণি বীক্ষ্যর একাদশ গ্রন্থ **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

দ্বাদশ গ্রন্থ **কামরূপ পর্বে** সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগারাজ্য ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প-পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

গৌড় পর্বের যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখছে দার্জিলিঙ কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের নিজ প্রসঙ্গ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

বাকী রইল পশ্চিম বাঙলার কথা।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক